ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান

দাখিল অষ্টম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

● ১০ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী নিরীহ, নিরস্ত্র বাঙালিদের উপর হামলা করে এবং নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালায়। ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়ার পর পাকিস্তান সেনাবাহিনী তাঁকে গ্রেপ্তার করে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি রাখে। দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধ শেষে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে আমাদের বিজয় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

● ১৭ই মে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের অন্যান্য সদস্যকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এ সময়ে বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা জার্মানিতে অবস্থান করায় প্রাণে রক্ষা পান। কিন্তু তাঁদের দেশে ফেরার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী। বিদেশে অবস্থানকালেই শেখ হাসিনা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন এবং জনতার আহ্বানে সাড়া দিয়ে ৬ বছরের নির্বাসিত, দুঃসহ প্রবাস জীবনের সমাপ্তি টেনে পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়নের দৃঢ় সংকল্প নিয়ে ১৯৮১ সালের ১৭ই মে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন ।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২২ অনুযায়ী প্রণীত
এবং ২০২৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে অষ্টম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান

দাখিল

অষ্টম শ্রেণি

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

রচনা

আবুল মোমেন
অধ্যাপক ড. আকসাদুল আলম
অধ্যাপক ড. স্বপন চন্দ্র মজুমদার
অধ্যাপক ড. মোঃ আতিকুর রহমান
অধ্যাপক ড. শারমিন আখতার
ড. মোঃ মাসুদ-আল-কামাল
জেরিন আক্তার
ড. মীর আবু সালেহ শামসুদ্দীন
মুহম্মদ নিজাম
সিদ্দিক বেলাল
উমা ভট্টাচার্য্য
শেখ নূর কুতুবুল আলম

সম্পাদনা

আবুল মোমেন
অধ্যাপক ড. আকসাদুল আলম

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশকাল : ডিসেম্বর ২০২৩

শিল্পনির্দেশনা

মঞ্জুর আহমদ

প্রচ্ছদ

রাসেল রানা

চিত্রণ

তামান্না তাসনিম সুপ্তি

রেহনুমা প্রসূন

গ্রাফিক্স

নূর-ই-ইলাহী

কে. এম. ইউছুফ আলী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গকথা

পরিবর্তনশীল এই বিশ্বে প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে জীবন ও জীবিকা। প্রযুক্তির উৎকর্ষের কারণে পরিবর্তনের গতিও হয়েছে অনেক দ্রুত। দ্রুত পরিবর্তনশীল এই বিশ্বের সঙ্গে আমাদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। কারণ প্রযুক্তির উন্নয়ন ইতিহাসের যেকোনো সময়ের চেয়ে এগিয়ে চলেছে অভাবনীয় গতিতে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব পর্যায়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশ আমাদের কর্মসংস্থান এবং জীবনযাপন প্রণালিতে যে পরিবর্তন নিয়ে আসছে, তার মধ্য দিয়ে মানুষে মানুষে সম্পর্ক আরও নিবিড় হবে। অদূর ভবিষ্যতে অনেক নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হবে যা এখনো আমরা জানি না। অনাগত সেই ভবিষ্যতের সঙ্গে আমরা যেন নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারি, তার জন্য এখনই প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

পৃথিবীজুড়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটলেও জলবায়ু পরিবর্তন, বায়ুদূষণ, অভিবাসন এবং জাতিগত সহিংসতার মতো সমস্যা আজ অনেক বেশি প্রকট। দেখা দিচ্ছে কোভিড ১৯-এর মতো মহামারি, যা সারা বিশ্বের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এবং অর্থনীতিকে থমকে দিয়েছে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় সংযোজিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা।

এসব চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তার টেকসই ও কার্যকর সমাধান এবং আমাদের জনমিতিক সুফলকে সম্পদে রূপান্তর করতে হবে। আর এজন্য প্রয়োজন জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন দূরদর্শী, সংবেদনশীল, অভিযোজন-সক্ষম, মানবিক, বৈশ্বিক এবং দেশপ্রেমীক নাগরিক। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পদার্পণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। শিক্ষা হচ্ছে এই লক্ষ্য অর্জনের একটি শক্তিশালী মাধ্যম। এজন্য শিক্ষার আধুনিকায়ন ছাড়া উপায় নেই। আর এই আধুনিকায়নের উদ্দেশ্যে একটি কার্যকর যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের একটি নিয়মিত কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হলো শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন। সর্বশেষ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয় ২০১২ সালে। ইতোমধ্যে অনেক সময় পার হয়ে গিয়েছে। প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়নের। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং শিখন চাহিদা নিরূপণের জন্য ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালব্যাপী এনসিটিবির আওতায় বিভিন্ন গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলন পরিচালিত হয়। এসব গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলনের ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে নতুন বিশ্ব পরিস্থিতিতে টিকে থাকার মতো যোগ্য প্রজন্ম গড়ে তুলতে প্রাক্-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণির অবিচ্ছিন্ন যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়েছে।

যোগ্যতাভিত্তিক এ শিক্ষাক্রমের আলোকে সকল ধারার (সাধারণ, মাদ্রাসা ও কারিগরি) অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য এই পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হলো। বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু এমনভাবে রচনা করা হয়েছে যেন তা অনেক বেশি সহজবোধ্য এবং আনন্দময় হয়। এর মাধ্যমে চারপাশে প্রতিনিয়ত ঘটে চলা বিভিন্ন প্রপঞ্চ ও ঘটনার সাঙ্গে পাঠ্যপুস্তকের একটি মেলবন্ধন তৈরি হবে। আশা করা যায় এর মাধ্যমে শিখন হবে অনেক গভীর এবং জীবনব্যাপী।

পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নে সুবিধাবঞ্চিত ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে ধর্ম, বর্ণনির্বিশেষে সকলকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, পরিমার্জন, চিত্রাঙ্কন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা মেধা ও শ্রম দিয়েছেন, তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরীক্ষামূলক এই সংস্করণে কোনো ভুল বা অসংগতি কারো চোখে পড়লে এবং এর মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কোনো পরামর্শ থাকলে তা জানানোর জন্য সকলের প্রতি বিনীত অনুরোধ রইল।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

ভূমিকা

নতুন বছরে নতুন শ্রেণিতে তোমাদের অভিনন্দন, স্বাগতম।

এই বছর অষ্টম শ্রেণিতে উঠেছ তোমরা নতুন শিক্ষা পদ্ধতির অভিজ্ঞতা নিয়ে। আশা করি ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণিতে তোমরা এ পদ্ধতির পাঠ উপভোগ করেছ। তোমরা নিশ্চয়ই নতুন ও পুরোনো পদ্ধতির পার্থক্যগুলো খেয়াল করেছ। এ নিয়ে অনেক কথা হলেও বাস্তব অভিজ্ঞতার ফলে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ যে, এখন আর জ্ঞানার্জন কেবল পাঠ্যবই পড়া এবং নির্দিষ্ট কিছু প্রশ্নের উত্তর ও কিছু তথ্য মুখস্থ করার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এখন পড়াশোনাও জ্ঞানার্জনের অনেক কাজ তোমরাই সরাসরি করছ। শিক্ষকদের সহযোগিতা তো পাচ্ছই, অনেক সময় মা-বাবা এবং পরিবারের বড়োরাও সাহায্য করছেন। কিন্তু পাঠের অনেক পরিকল্পনা ও আনুষঙ্গিক সব কাজ তোমরাই করছ। অনেক কাজ দলে মিলে করছ, আবার কিছু কাজ একাও করছ। এভাবে সরাসরি অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে যা জানছ, শিখছ সেসব জ্ঞান ও দক্ষতা তো তোমারই অর্জন। তোমরা এখন প্রশ্ন করতে পারছ, উত্তরগুলো নিজেরাই খুঁজে নিচ্ছ। ফলে একদিকে যেমন অন্যের তৈরি প্রশ্নের ও অন্যের তৈরি উত্তর মুখস্থ করার মত একঘেঁয়ে ক্লান্তিকর কাজ করতে হচ্ছে না। আবার অন্যদিকে নিজেরাই বুদ্ধি খাটিয়ে, অনুসন্ধান করে, বই-পুস্তক ঘেঁটে এবং শিক্ষকদের সাহায্য নিয়ে নিজেদের পড়া নিজেরাই তৈরি করতে পারছ। এভাবে যে অভিজ্ঞতা হয়, যে সাফল্য আসে তার সবটা মিলে পড়ালেখাটা এক আনন্দময় কাজ হয়ে ওঠে।

নতুন শ্রেণির নানান ধরনের নতুন পাঠ নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য চ্যালেঞ্জ নিয়েই হাজির হয়। তবে আমরা বিশ্বাস করি চ্যালেঞ্জ মোকবিলার জন্য তোমাদের যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস রয়েছে। পাশাপাশি তোমাদের আছে কৌতুহল, বিস্ময়বোধ, প্রাণশক্তি এবং আনন্দিত হওয়ার ক্ষমতা। ইন্দ্রিয়গুলো এতে সহায়ক ভূমিকা নেয়। আর মজা হলো এগুলো টাকা পয়সার মতো নয়, ব্যবহারে খরচ হয় না বরং বাড়ে। কারণ এসবই তোমার মনের সম্পদ, তুমি যত চর্চা করবে ততই এগুলো ঝকঝকে থাকবে, কাজে হবে দক্ষ। এদের প্রেরণায় তোমাদের নতুন নতুন ক্ষমতার প্রকাশ ঘটবে। প্রথম ডাক পড়বে বুদ্ধির। নিজেদের বুদ্ধি খাটাতে হবে, ভাবতে হবে, আবার ভাবতে গেলে যুক্তির প্রয়োজন। সেটাও ব্যবহারে না ফুরিয়ে উল্টো ধারালো হয়। এ হলো চর্চার বিষয়। এর জন্য চাই বুদ্ধিকে কাজে লাগানো, যুক্তিতে শান দেওয়া। আর ইন্দ্রিয়গুলোকে সজাগ রাখতে হবে, তাতে এদের দক্ষতাও বাড়বে।

কেউ কেউ বলছেন নতুন ব্যবস্থায় পরীক্ষা নেই। কথাটা একদম ভুল। এখন বরং সারা বছর ধরেই যেমন পড়াশোনা ও শেখার কাজ চলবে তেমনি মূল্যায়নও হতে থাকবে বছরব্যাপী। নতুন পদ্ধতিতে প্রতিটি বিষয়ে তোমাদের নির্দিষ্ট কতগুলো যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। সেখানে কিন্তু কোনো ছাড় নেই, তাতে উত্তীর্ণ হতেই হবে। অনেক কিছুই নতুন বলে হঠাৎ করে এসে আগের অভিজ্ঞতার সঙ্গে তোমাদের এখনকার পাঠপদ্ধতি বোঝা কঠিন মনে হতে পারে। আগের ছকে নতুন পদ্ধতির সঠিক মূল্যায়ন করাও যাবে না। বাইরের নানা কথায় তোমাদের আনন্দ মাটি করার দরকার নেই। চলো এভাবে অজানাকে জয় করবে, অন্ধকারে আলো জ্বালিয়ে চলতে চলতে বিস্ময়ে-আনন্দে মজে কখন যে অনেক কিছু জানা হয়ে যাবে টেরও পাবে না।

সূচিপত্র

বিজ্ঞানের দর্পণে সমাজ	১ - ১২
অনন্যতায় একাত্মতা	১৩ - ৩১
মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বঙ্গবন্ধু	৩২ - ৪৭
সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস জানার উপায়	৪৮ - ৬২
বাংলা অঞ্চলে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বৈচিত্র্যময় গতিপথ	৬৩ - ৮৬
সামাজিকীকরণ, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও সমাজ পরিবর্তন	৮৭ - ১০১
প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন ও ব্যক্তির ভূমিকা	১০২ - ১০৮
বিশ্ব প্রেক্ষাপটে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বৈচিত্র্যময় গতিপথ	১০৯ - ১২৪
সুরক্ষিত রাখি প্রকৃতি ও মানুষের বন্ধন	১২৫ - ১৫৯
সম্পদের উৎপাদন ও সমতার নীতি	১৬০ - ১৭৯

বিজ্ঞানের দর্পণে সমাজ

এই শিখন অভিজ্ঞতায় আমরা নিজ এলাকার প্রাকৃতিক ও সামাজিক উপাদানগুলো নির্ণয় করব। প্রাকৃতিক ও সামাজিক উপাদানগুলোর সময়ের সঙ্গে পরিবর্তন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুসন্ধান করব। এই উপাদানগুলোর পরিবর্তন কীভাবে ভৌগোলিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট তৈরি করে তা খুঁজে বের করব।

চলো তাহলে আমরা কিছু ছবি দেখে নিই। ছবিগুলো আমাদের পরিচিত লাগছে? এগুলোর কোনটি সামাজিক এবং কোনটি প্রাকৃতিক উপাদান তা আমরা খুঁজে বের করি।

জলাশয়

রাস্তা

নদী

গাছপালা

ঘর

দোকান

খেলার মাঠ

পোশাক

এখন আমরা নিজ এলাকার প্রাকৃতিক ও সামাজিক উপাদানের একটি তালিকা তৈরি করি।

আমার এলাকার প্রাকৃতিক উপাদান	আমার এলাকার সামাজিক উপাদান

আচ্ছা, আমরা কী কখনো ভেবেছি, এই উপাদানের মধ্যে কোনগুলোর সময়ের সঙ্গে পরিবর্তন হয়েছে? আমরা হয়তো কখনো এলাকার বয়স্ক বা পরিবারের অভিভাবকদের কাছে শুনেছি আমাদের এলাকার কিছু কিছু প্রাকৃতিক ও সামাজিক উপাদানের পরিবর্তন হয়েছে। আবার আমরা হয়তো অনুমান করেও বলতে পারি। কিন্তু অনুমান বা শোনা কথা থেকে আমরা যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিতে পারি না। তাই চলো আমরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি।

অনুসন্ধানের এই কাজটি করার জন্য আমরা এলাকার মানুষের কাছে প্রাকৃতিক ও সামাজিক উপাদানের পরিবর্তন সম্পর্কে মতামত গ্রহণ করব। আমরা এ কাজটি করার জন্য সপ্তম শ্রেণির অনুসন্ধানী ধাপগুলো অনুসরণ করব। এবার আমরা পরিবর্তন সম্পর্কে উত্তরদাতার কাছ থেকে হ্যাঁ বা না প্রশ্নের মাধ্যমে উত্তর নিবো। তাই তথ্যগুলো আমরা একটা নতুন পদ্ধতিতে সংগ্রহ ও উপস্থাপন করব । মনে রাখব উত্তরদাতা যেহেতু তথ্য দিচ্ছেন তাই তাঁদেরকে আমরা তথ্যদাতাও বলতে পারি। চলো আমরা অনুসন্ধানের ধাপগুলো বুঝে নিই।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

ধাপ	ধাপটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	উদাহরণ
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুসন্ধানের জন্য বিষয়বস্তু (Topic) নির্ধারণ করা	বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুসন্ধানের জন্য বিষয়বস্তু নির্ধারণ করব।	আমাদের এলাকার প্রাকৃতিক ও সামাজিক উপাদানের পরিবর্তন 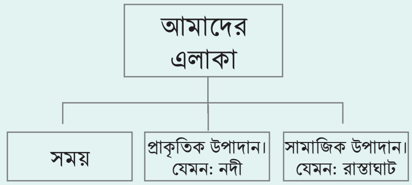
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুসন্ধানের জন্য সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য (Objectives) নির্ধারণ করা	বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুসন্ধানের এই ধাপটির জন্য এক বা একাধিক উদ্দেশ্য নির্ণয় করব।	১. আমাদের এলাকার ২০ বছর আগের প্রাকৃতিক উপাদানের পরিবর্তন নির্ণয়। ২. আমাদের এলাকার ২০ বছর আগের সামাজিক উপাদানের পরিবর্তন নির্ণয়।
অনুমান/ হাইপোথিসিস (Hypothesis)	বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুসন্ধানের কাজটি করার আগে আমরা অনুমান বা হাইপোথিসিস করব। হাইপোথিসিস সব সময় করতে হয় না।	আমাদের অনুমান হচ্ছে এলাকার সামাজিক ও প্রাকৃতিক উভয় উপদানের পরিবর্তন হয়েছে।
তথ্যের উৎস (Data Source) নির্বাচন করা	বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুসন্ধানের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য কোথা থেকে সংগ্রহ করতে পারি তা নির্বাচন করতে হবে। সেটি হতে পারে ব্যক্তি, বই, জার্নাল, ম্যাগাজিন, মিউজিয়াম ইত্যাদি।	যেহেতু ২০ বছর আগের এলাকার পরিবর্তন জানতে চাচ্ছি তাই এরকম প্রাপ্তবয়স্ক লোক নির্ধারণ করতে হবে যাঁরা ২০ বছর আগের এলাকা কেমন ছিল তা বলতে পারবেন। সেক্ষেত্রে আমরা কমপক্ষে ৩০ বছর বয়সের পুরুষ ও নারী উত্তরদাতা হিসাবে নির্বাচন করতে পরি। সেই সঙ্গে বই, ইন্টারনেট বা প্রত্রিকা থেকেও আমরা তথ্য সংগ্রহ করতে পারি।
তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি (Methods) নির্ধারণ	তথ্য সংগ্রহের জন্য আমরা দলগত আলোচনা/প্রশ্নপত্র/সাক্ষাৎকার/ পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারি।	প্রাকৃতিক ও সামাজিক উপাদানের পরিবর্তন হয়েছে কী না, তা যাচাইয়ের জন্য আমরা কিছু প্রশ্নমালা তৈরি করব। যেগুলো উত্তরদাতারা হ্যাঁ বা না তে উত্তর দেবে।
সময় ও বাজেট (Time and Budget) নির্ধারণ	অনুসন্ধানের এই কাজটি করার জন্য কত সময় এবং অর্থের প্রয়োজন হবে তা নির্ধারণ করব।	অনুসন্ধানের তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, ফলাফল নির্ধারণ, আলোচনা, সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং প্রতিবেদন লেখার কাজটি করার জন্য আমাদের ৭-৮ দিন সময় লাগবে। যেহেতু উত্তর দাতা আমাদের এলাকায় অবস্থান করছেন তাই যাতায়াত বাবদ বা অন্যান্য কোনো কারণে অর্থের প্রয়োজন হবে না।

তথ্য সংগ্রহ করা (Data Collection)	এই ধাপে নির্বাচিত তথ্যের উৎস ও তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি অবলম্বন করে তথ্য সংগ্রহ করব।	আমরা ২০ থেকে ৩০ জন তথ্যদাতা বা উত্তর দাতার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করব। হ্যাঁ বা না তে যে প্রশ্নগুলো হয়, সেগুলোর উত্তর কিন্তু কম সময়ে বেশি মানুষের কাছ থেকে নিতে পারি।
তথ্য বিশ্লেষণ করা (Data Analysis)	সংগৃহীত তথ্য পড়তে হয়, প্রয়োজনীয় তথ্যের মধ্যে যেগুলো অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যের সঙ্গে মিল আছে, সেগুলো নির্বাচন করতে হয় এবং সাজাতে হয়, অথবা হিসাব-নিকাশ করে গ্রাফ বা চার্ট আকারে প্রকাশ করতে হয়।	আমরা আমাদের সংগৃহীত তথ্য সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করতে পারবা যেমন ২০ বছর আগের রাস্তাঘাট একই রকম ছিল এই বিষয়ে ২০ জন হ্যাঁ বলেছেন ১০ জন না বলেছেন। তাই এই তথ্য আমরা গ্রাফ বা চার্ট আকারে উপস্থাপন করতে পারি।
ফলাফল ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ (Findings/ Results, Discussion and Decision)	তথ্য বিশ্লেষণ করে যে উত্তর খুঁজে পাওয়া যায়, সেটাই অনুসন্ধানী পদ্ধতির ফলাফল। এই ফলাফল আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।	আমরা আমাদের প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে যে ফলাফল পেয়েছি তা আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি। আমরা আমাদের প্রাপ্ত ফলাফল অনুমান বা হাইপোথিসিসের সঙ্গে মিল আছে কীনা তাও যাচাই করে নিতে পারি।
ফলাফল অন্যদের সঙ্গে উপস্থাপন ও শেয়ার করা (Sharing Findings)	আমরা আমাদের ফলাফল গ্রাফ পেপার, পোস্টার, নাটিকা, ছবি, চার্ট ইত্যাদি উপায় উপস্থাপন করতে পারি ও ম্যাগাজিনে বা ক্লাসে প্রতিবেদন আকারে জমা দিতে পারি।	আমরা ফলাফল প্রতিবেদন আকারে জমা দিতে পারি। আবার পোস্টার পেপারে গ্রাফ চার্ট বা ছবি এঁকে ক্লাসে উপস্থাপন করতে পারি।

তথ্য নেওয়ার সময় কিছু বিষয় অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে:

তথ্য গ্রহণের সময় করণীয়:

১. অবশ্যই উত্তরদাতার কাছ থেকে সম্মতি নিতে হবে।

২. শিক্ষার্থীরা তথ্যদাতাকে জানিয়ে রাখবে সংগৃহীত উত্তর শুধুমাত্র তাঁদের এই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান পদ্ধতিতে ব্যবহার করবে। অন্য কোনো উদ্দেশ্যে নয়।

৩. কতটুকু সময় লাগতে পারে তা উত্তরদাতাকে জানানো।

৪. তিনি সময় দিতে পারবেন কী না, তা জেনে নেওয়া।

৫. উত্তরদাতা যদি উত্তর দেওয়ার কোনো এক সময় উত্তর প্রদান করতে অনিচ্ছা প্রদর্শন করেন, সে মুহূর্তেই প্রশ্ন করা বন্ধ করে দেওয়া।

৬. উত্তরদাতার উত্তর ঠিক না ভুল হয়েছে, এ ধরনের কোনো কথা না বলা, যেন উত্তরদাতা সম্পূর্ণ নিজের মতামত ব্যক্ত করতে পারেন।

আমাদের এলাকার প্রাকৃতিক ও সামাজিক উপাদানের পরিবর্তন হয়েছে কীনা, সে বিষয়ে তথ্য নেওয়ার জন্য আমাদের কী কী প্রাকৃতিক উপাদান ও সামাজিক উপাদান পরিবর্তন হতে পারে, সেগুলো শনাক্ত করতে হবে। প্রাকৃতিক উপাদান হিসাবে আমরা নিতে পারি গাছপালা, নদ-নদী, পাহাড় ইত্যাদি। সামাজিক উপাদান হিসাবে নিতে পারি পোশাক, ভাষা, বাড়িঘর ইত্যাদি। মতামত নেওয়ার জন্য একটি নমুনা প্রশ্নমালা দেওয়া হলো। আমরা এরকমভাবে যে যে উপাদানের পরিবর্তন সম্পর্কে এলাকাবাসীর মতামত নিতে চাই, সেভাবে প্রশ্ন তৈরি করতে পারি।

একটি নমুনা প্রশ্নমালা দেওয়া হল।

তথ্যদাতার নাম:	বয়স:
শিক্ষাগত যোগ্যতা:	পেশা:

ক্রম	আপনার মতামতের উপরের টিক চিহ্ন দিন
১.	এই এলাকার গাছপালার সংখ্যা কী ২০ বছরের মধ্যে পরিবর্তন হয়েছে? ☐ হ্যাঁ ☐ না
২.	এই এলাকার পশুপাখির সংখ্যা কী ২০ বছরের মধ্যে পরিবর্তন হয়েছে? ☐ হ্যাঁ ☐ না
৩.	এই এলাকার রাস্তা ঘাট কী ২০ বছরের মধ্যে পরিবর্তন হয়েছে? ☐ হ্যাঁ ☐ না
৪.	এই এলাকার বাড়িঘরের ধরন কী ২০ বছরের মধ্যে পরিবর্তন হয়েছে? ☐ হ্যাঁ ☐ না
৫.	এই এলাকার যানবাহন কী ২০ বছরের মধ্যে পরিবর্তন হয়েছে? ☐ হ্যাঁ ☐ না
৬	এই এলাকার মানুষের ব্যবহৃত পোশাক-পরিচ্ছদ কী ২০ বছরের মধ্যে পরিবর্তন হয়েছে? ☐ হ্যাঁ ☐ না
৭.	এই এলাকার মানুষের ব্যবহৃত তৈজসপত্র কী ২০ বছরের মধ্যে পরিবর্তন হয়েছে? ☐ হ্যাঁ ☐ না

আমাদের পাওয়া তথ্যকে আমরা সহজে প্রকাশ করার জন্য বিভিন্ন সংখ্যা বা অক্ষর দিয়ে প্রকাশ করতে পারি। একে আমরা কোডিং বলতে পারি। যেমন: গাছপালাকে ১, পশু-পাখি ২, এভাবে প্রতিটি উপাদানকে আমরা কোড করতে পারি। নিচে নমুনা কোডিং দেওয়া হলো। ৩০ জন তথ্যদাতা থেকে প্রাপ্ত তথ্যকে আমরা নিচের ছকের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারি।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

যে যে উপাদানের পরিবর্তন হয়েছে	কোডিং	হ্যাঁ বলেছেন	না বলেছেন
গাছপালা	১	২ জন	২৮ জন
পশুপাখি	২	১৫ জন	১৫ জন
রাস্তাঘাট	৩	২০ জন	১০ জন
বাড়িঘর	৪	২২ জন	৮ জন
যানবাহন	৫	২৮ জন	২ জন
পোশাক	৬	১৫ জন	১৫ জন
তৈজসপত্র	৭	২০ জন	১০ জন

আবার, এই তথ্যকে আমরা স্তম্ভচিত্র বা Bar Chart আকারেও উপস্থাপন করতে পারি। কীভাবে স্তম্ভচিত্রটি আঁকব তা একটু দেখে নিই।

হাইপোথিসিস: এলাকার সামাজিক ও প্রাকৃতিক উভয় উপদানের পরিবর্তন হয়েছে।

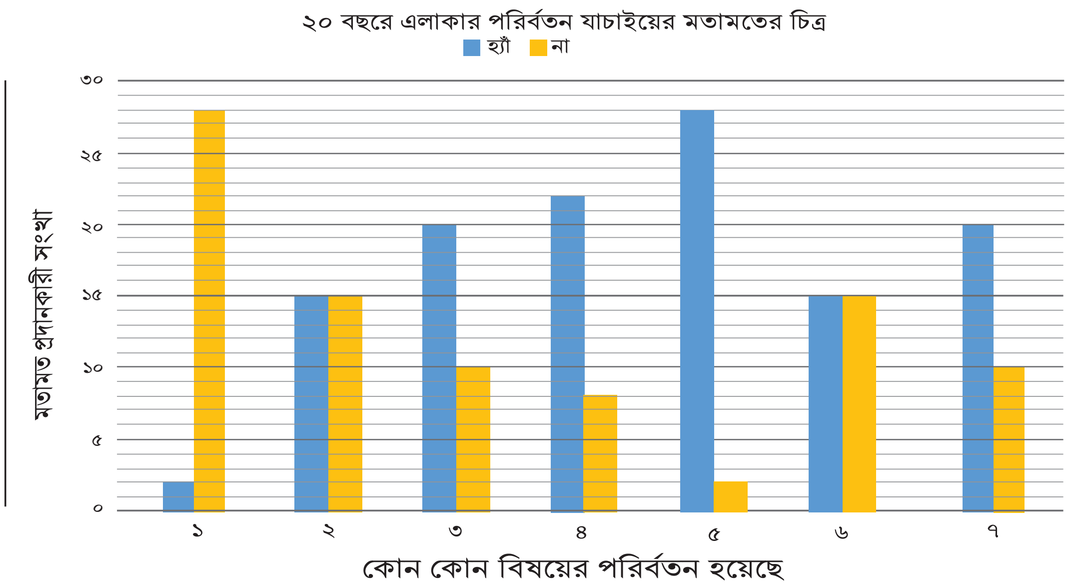

আচ্ছা উপরের তথ্যকে আমরা যেভাবে ‘হ্যাঁ’ বা ‘না’দ্বারা প্রকাশ করলাম। আমরা কী এই তথ্য দিয়ে আমাদের এলাকার প্রাকৃতিক ও সামাজিক উপাদানগুলো কেনো বা কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে তা জানতে পারব? না, কারণ জানতে হলে আমাদের এমন প্রশ্ন করতে হবে যেগুলো হ্যাঁ বা নাতে উত্তর দিলে হবে না। তাই এক্ষেত্রে আমরা সপ্তম শ্রেণির অনুসন্ধান পদ্ধতি অনুসরণ করে কারণ খুঁজতে পারি। আচ্ছা আমরা কী আগের শেখা অনুসন্ধান পদ্ধতি এবং এখন শেখা অনুসন্ধান পদ্ধতির মধ্যে কোনো পার্থক্য খুঁজে পেয়েছি।

এর আগে আমরা যে অনুসন্ধান পদ্ধতি অনুসরণ করেছি সেখানে সংখ্যা দিয়ে তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। এবার আমরা সংখ্যা দিয়ে আমাদের ফলাফল উপস্থাপন করেছি। সংখ্যা থাকায় আমরা টেবিল ও চার্টের মাধ্যমে তথ্য উপস্থাপন করতে পেরেছি। এটি হচ্ছে পরিমানগত পদ্ধতি। আর সপ্তম শ্রেণিতে শিখেছি গুণগত পদ্ধতি। তাছাড়াও আমরা একসঙ্গে চারটি মূল বিষয় নিয়ে এবার অনুসন্ধান করেছি। এলাকা, সময়, সামাজিক উপাদান, প্রাকৃতিক উপাদান।

অনুসন্ধানের বিষয়:

আমার এলাকার প্রাকৃতিক ও সামাজিক উপাদানের পরিবর্তন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুসন্ধান।

অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য:

- আমার এলাকার ২০ বছরের মধ্যে প্রাকৃতিক উপাদানের পরিবর্তন নির্ণয়।
- আমার এলাকার ২০ বছরের মধ্যে সামাজিক উপাদানের পরিবর্তন নির্ণয়

হাইপোথিসিস: এলাকার সামাজিক ও প্রাকৃতিক উভয় উপাদানের পরিবর্তন হয়েছে।

তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি : এই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান প্রক্রিয়ায় ২০ বছর আগের আমার এলাকার প্রাকৃতিক ও সামাজিক উপাদানগুলোর পরিবর্তন হয়েছে কী না, তা যাচাই করা হয়েছে। এজন্য ৩০ জন লোকের কাছ থেকে মতামত নেওয়া হয়েছে। যাদের বয়স কমপক্ষে ৩০ বছর। কারণ, ২০ বছর আগের এলাকার অবস্থা মনে করে পরিবর্তন বলতে হলে উত্তরদাতার বয়স বর্তমানে কমপক্ষে ৩০ বছর হওয়া প্রয়োজন। উত্তরদাতার কাছ থেকে উত্তর নেওয়ার জন্য একটি প্রশ্নমালা তৈরি করা হয়েছে, যেখানে তথ্যদাতা হ্যাঁ ও না তে উত্তর দেবে।

তথ্যদাতার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহের আগে তার সম্মতি নেওয়া হয়েছে।

প্রাপ্ত তথ্য উপস্থাপন: ৩০ জন উত্তরদাতার প্রাপ্ত তথ্য নিচে স্তম্ভচিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা হলো:

২০ বছরে এলাকার পরিবর্তন যাচাইয়ের মতামতের চিত্র

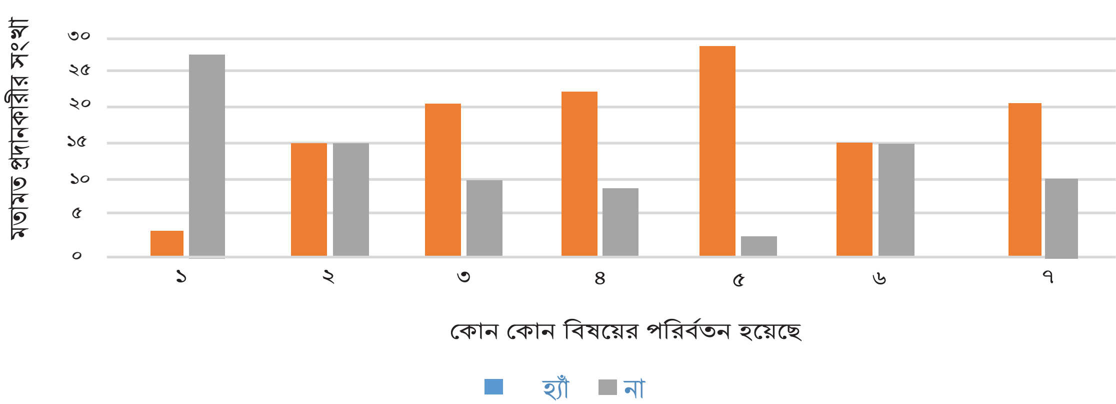

প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ:

প্রাকৃতিক উপাদান হিসাবে আমি আমার এলাকার গাছপালা ও পশু-পাখি বেছে নিয়েছি। বেশিরভাগ উত্তরদাতার অভিমত এলাকার গাছপালার সংখ্যা একই রকম আছে। মাত্র ২ জনের অভিমত গাছপালার সংখ্যা বেড়েছে বা কমেছে। অপরদিকে, সামাজিক উপাদান হিসাবে আমি রাস্তা-ঘাট, বাড়িঘর, যানবাহন, পোশাক ও তৈজসপত্রকে বেছে নিয়েছি। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উত্তরদাতার অভিমত এলাকার রাস্তাঘাট, যানবাহন ও মানুষের ব্যবহৃত তৈজসপত্রের পরিবর্তন হয়েছে। অর্ধেক সংখ্যক তথ্যদাতা মনে করেন এলাকার মানুষের ব্যবহৃত পোশাক পরিচ্ছদ পরিবর্তন হয়েছে।

ফলাফল ও যৌক্তিক সিদ্ধান্ত:

এলাকার প্রাকৃতিক ও সামাজিক উপাদানগুলো গত ২০ বছরে পরিবর্তিত হয়েছে কীনা তা যাচাই করতে গিয়ে দেখা গেল বেশি সংখ্যক ব্যক্তি মনে করেন, এলাকার প্রাকৃতিক ও সামাজিক উপাদানের পরিবর্তন হয়েছে। অনুসন্ধানে প্রাপ্ত ফলাফল হাইপোথিসিস বা অনুমানের সঙ্গে মিলে গেছে। সেই সঙ্গে, বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা যেহেতু শিক্ষিত ও সচেতন তাই এটা বলা যেতে পারে যে তারা পরিবর্তনগুলো সহজে শনাক্ত করতে পেরেছেন।

দলগত কাজ ১:

আমরা ৫-৬ জনের দল গঠন করব। প্রতিটি দল পাঠ্যপুস্তকে দেওয়া অনুসন্ধানের ধাপ অনুসরণ করে নিজের এলাকার কোন কোন প্রাকৃতিক ও সামাজিক উপাদানের পরিবর্তন হয়েছে তার ছক তৈরি করব। এরপর এলাকার মানুষের কাছ থেকে এই পরিবর্তন সম্পর্কে মতামত সংগ্রহ করব। এরপর প্রাপ্ত তথ্যকে দলগতভাবে বিশ্লেষণ করে গ্রাফ পেপারে উপস্থাপন করব। এরপর প্রতিটি দল একটি প্রতিবেদন লিখে জমা দেব।

প্রতিফলন ডায়েরি: আমরা অষ্টম শ্রেণির জন্য একটি প্রতিফলন ডায়েরি তৈরি করব। যেখানে আমরা আমাদের অনুসন্ধানের কাজের সময় যা যা অভিজ্ঞতা হয়েছে তা লিখে রাখব। সেখানে আমরা দলগতভাবে কাজটি কীভাবে করেছি? কী কী করলে অনুসন্ধানী কাজটি আরও ভালো হতে পারত। দলের বন্ধুরা কে কোন কাজ করেছে? ইত্যাদি বিভিন্ন অভিজ্ঞতা সম্পর্কে আমরা প্রতিফলন ডায়েরিতে লিখব।

প্রতিফলন ডায়েরি

আমরা এখন আমাদের অনুসন্ধানের কাজটিকে মৌখিকভাবে উপস্থাপন করব। আমাদের মধ্য থেকে ১-২ জন নির্বাচন করব যাঁরা এই কাজটি উপস্থাপন করব। প্রয়োজনে ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষকের সহায়তা নিব।

দলগত উপস্থাপনের পর আমরা আমাদের দলের বন্ধুদের কাজের মূল্যায়ন করব।

সতীর্থ মূল্যায়ন

ক্রম	বন্ধুর নাম	দলের সদস্যদের মতামত প্রদানের সুযোগ দিয়েছে	দলে বন্ধু অনুসন্ধানী কাজে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেছে	বন্ধু কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছে	দলের সদস্যদের কাজে উদ্বুদ্ধ করেছে
১.					
২.					
৩.					
৪.					
৫.					
৬.					

এখন আমরা একটি পত্রিকার রিপোর্ট পড়ি।

আমাদের পত্রিকা

জলবায়ুর পরিবর্তন ও বাংলাদেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক

বিশ্বব্যাপী জলবায়ুর নিয়ামক সমূহে নানা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিশ্বের গড় তাপমাত্রা আগের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই দক্ষিণমেরু অঞ্চলের বরফ গলে যাচ্ছে এবং সমুদ্রের পানির উচ্চতাও বাড়ছে। এই অবস্থায় বিশ্বের অনেক দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবার ঝুঁকিতে রয়েছে। মালদ্বীপ সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে দেশগুলোর একটি। ইতোমধ্যে এর কিছু কিছু অংশ পানির নিচে ডুবে গেছে। পরিবেশ বিশেষজ্ঞরা ধারণা করছেন আগামী কয়েক বছরের মধ্যে সমূদ্র তীরবর্তী আরো অনেক এলাকা ডুবে যেতে পারে। বাংলাদেশও এধরনের হুমকির মধ্যে রয়েছে। বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ কার্বন নিঃসরণ। এই কার্বন নিসৃত হয় কলকারখানর কালো ধোঁয়া ও যানবাহনের কালো ধোঁয়া থেকে। শিল্পোন্নত দেশগুলোতে এই কার্বন নিঃসরণের হার অনেক বেশি। সেখানে কলকারখানা থেকে নিঃসৃত বিভিন্ন ধরনের দূষক ও রাসায়নিক পদার্থ জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ দূষণে ভূমিকা রাখছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের দায় খুব বেশি না হলেও নগরায়ন ও বনভূমি উজাড় করার মাধ্যমে এখানে পরিবেশ দূষণ হচ্ছে। যা অল্প পরিসরে হলেও জলবায়ু পরিবর্তনেও ভূমিকা রাখছে।

এই জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে আন্তর্জাতিক পরিসরে ১৯৯৭ সালে কিউটো সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত, ২০১৫ সালের প্যারিস চুক্তিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত ও কোপ সম্মেলনসমূহ উল্লেখযোগ্য। সেখানে বিশ্ব উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার বিষয়ে রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বিভিন্ন সমঝোতা ও চুক্তি সাক্ষরিত হয়েছে। বাংলাদেশেও পরিবেশ ও বনভূমি রক্ষায় সরকারের বিভিন্ন প্রচেষ্টা চলমান রয়েছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পরিবেশ আইন প্রণয়ন, সংরক্ষিত বনভূমি ঘোষণা করা, সামাজিক বনায়ন, ও অংশীদারিত্বমূলক বনায়ন ইত্যাদি।

এছাড়া, আদিবাসী বা বন নির্ভর সম্প্রদায় যাদের জীবন-জীবিকা ও সংস্কৃতি বনভূমির সাথে সরাসরি জড়িত তাদেরকে বনরক্ষায় কার্যকর ভাবে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে বিদ্যমান নীতিমালা সংস্কার করা প্রয়োজন।

পত্রিকার রিপোর্টটি খেয়াল করলে দেখব, মানুষের নানাবিধ কর্মকারণ্ডের ফলেই জলবায়ু তথা প্রকৃতির পরিবর্তন হচ্ছে। এই জলবায়ু পরিবর্তন নানা ঐতিহাসিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট তৈরি করছে। প্রেক্ষাপট গুলো নিম্নোক্তভাবে শনাক্ত করতে পারি।

প্রেক্ষাপট	উদাহরণ
ঐতিহাসিক	কিউটো সম্মেলন, প্যারিস ও কোপ সম্মেলন
সামাজিক ও সাংস্কৃতিক	জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, নগরায়ন, যানবাহন, কলকারখানা
রাজনৈতিক	জাতীয় নীতিমালা, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা

দলগত কাজ ১:

এখন আমরা দলগতভাবে আমাদের এলাকারযেকোনো একটি সামাজিক বা প্রাকৃতিক উপাদানের পরিবর্তন কীভাবে বিভিন্ন প্রেক্ষাপট: ঐতিহাসিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট তৈরি করেছে সেটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিব। যেমন, একটি সামাজিক উপাদানের পরিবর্তন হতে পারে এলাকার রাস্তাঘাট উন্নয়ন। রাস্তাঘাট উন্নয়নে এলাকার ঐতিহাসিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট নির্ণয় করতে হবে। এ বিষয়ে আমরা আমাদের এলাকার মানুষের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করব। লক্ষ্য রাখবযেকোনো একটি উপাদান হয়তো সবগুলো প্রেক্ষাপট তৈরি করবে না। আমরা সর্বোচ্চ সংখ্যক প্রেক্ষাপটগুলো অনুসন্ধান করে বের করার চেষ্টা করব এবং উপস্থাপন করব।

অনন্যতায় একাত্মতা

এই শিখন অভিজ্ঞতায় আমরা নিজ ও সহপাঠীর আত্মপরিচয় নির্ণয় করব। পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ভৌগোলিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আত্মপরিচয় কীভাবে গড়ে ওঠে তা দেখব। আমাদের এই আত্মপরিচয় গড়ে ওঠার মধ্য দিয়ে নিজেদের অনন্যতা ও বৈচিত্র্য খুঁজব।

আমার আত্মপরিচয়

চলো, এখন আমাদের মতো একটি বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির কয়েকজন শিক্ষার্থীর ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান ক্লাসের একটি ঘটনা সম্পর্কে জানি।

অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মধ্যে নানা বিষয় নিয়ে তর্ক-বিতর্ক লেগেই থাকে। সেদিন তর্ক শুরু হলো, পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষের বাস, তারা কেউ কারো মতো নয়। কেউ একজন বলছিল যে, একটি অঞ্চলের মানুষ একেক রকম, কিন্তু একটি অঞ্চলের মানুষের মধ্যে বেশ মিল থাকে, তাঁদের মধ্যে কিছু মানুষ তো একই রকম হতেই পারে। ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞানের পরবর্তী ক্লাসে শিক্ষক ক্লাসে প্রবেশ করতেই ওই দিনের তর্কের সূত্র ধরে আবেদ জানতে চাইল যে, পৃথিবীতে যত মানুষ বাস করে তাঁদের মধ্যে কিছু মানুষ একরকমের হতে পারে কিনা। ওর প্রশ্ন শুনে শিক্ষক একটুখানি ভাবলেন। তিনি সকলকে উদ্দেশ্য করে এই বিষয়ে মতামত জানতে চাইলেন। দেখা গেল ওরা দুই রকমের কথাই বলছে। একদল বলছে যে মিল থাকলেও কখনো পুরোপুরি একরকমের হয় না। অন্য দল বলছে মাঝে মাঝে হুবহু একইরকমের হতেও পারে। ওদের প্রশ্নের সরাসরি উত্তর না দিয়ে শিক্ষক সকলকে একটি কাজ করতে বললেন। তিনি আরও বললেন যে, এই কাজের মাধ্যমে ওদের প্রশ্নের উত্তর ওরাই খুঁজে বের করতে পারবে।

শিক্ষক প্রথমে আত্মপরিচয় কী তা নিয়ে ভাবতে বললেন। তারপর তাঁদের আত্মপরিচয়ের মিল ও অমিল খুঁজতে বললেন। এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাইলেন, আত্মপরিচয়ের কোন কোন বিষয়ে তোমাদের মিল আছে আর কোন কোন বিষয়ে রয়েছে অমিল। ক্লাসের সবাই ভীষণ উৎসাহ নিয়ে মিল ও অমিল বলল। এই মিল ও অমিল থেকে তারা নিজেদের অনন্যতা ও বৈচিত্র্য খুঁজে পেলো।

আচ্ছা আমাদের কী এরকম একটি কাজ করতে ইচ্ছে করছে না? আমরাও তো পারি নিজেদের অনন্যতা ও বৈচিত্র্য খুঁজে বের করতে। তাহলে আমরাও আমাদের আত্মপরিচয় নির্ণয় করি। এজন্য আমরা নিচের চিত্রটির মতো করে একটি চিত্র খাতায় এঁকে নিজের আত্মপরিচয় সম্পর্কে লিখি।

অনুশীলনী ১: আমার আত্মপরিচয় লিখি

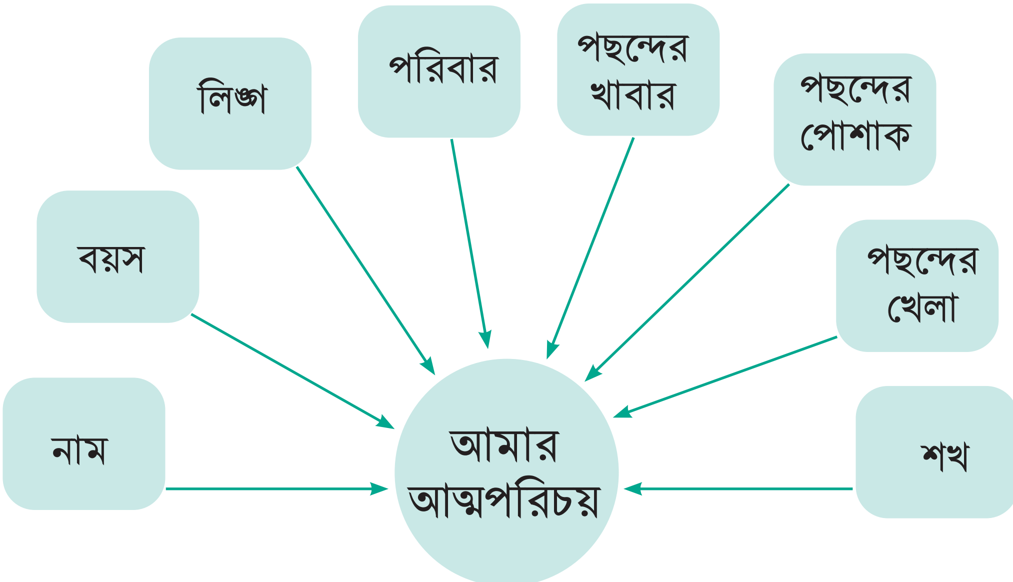

দলগত কাজ ১:

এখন আমরা নিজেদের আত্মপরিচয়ের সঙ্গে সহপাঠীর আত্মপরিচয়ের মিল ও অমিল খুঁজব। এই কাজটি আমরা দলগতভাবে করব। আমরা দলে বসে নিজের ও সহপাঠীর আত্মপরিচয় নিয়ে আলোচনা করে মিল ও অমিলের একটি তালিকা করব। আমরা নিচের ছকটির মতো একটি ছক খাতায় লিখে এই তালিকা করব।

অনুশীলনী ২: **আমার ও সহপাঠীর আত্মপরিচয়ের মিল ও অমিল খুঁজি**

সহপাঠীর নাম	আমার আত্মপরিচয়ের সঙ্গে যা যা মিলে যায়	আমার আত্মপরিচয়ের সঙ্গে যা যা মিলে যায়নি

আমরা সহপাঠীর সঙ্গে নিজের আত্মপরিচয়ের বেশ কিছু মিল ও অমিল খুঁজে পেয়েছি, তাই না? আমরা এখন প্রতিটি দল থেকে ১ বা ২ দুজনের কাছ থেকে তালিকা শুনে নিই। আমরা খেয়াল করে শুনলে বুঝতে পারব

আমাদের ক্লাসের সব বন্ধুদের আত্মপরিচয়ের কিছু মিল ও অমিল আছে। এভাবে আমাদের সমাজের প্রতিটি মানুষের আত্মপরিচয়ে মিল ও অমিল আছে। এভাবেই আমরা হয়ে উঠি বৈচিত্র্যময় ও অনন্য।

পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে গড়ে উঠা আমার আত্মপরিচয়

এখন আমরা পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে তথ্য নিয়ে আমাদের পরিবার, সমাজ, সংস্কৃতি ও ভৌগোলিক পরিচয় সম্পর্কে জানব। তথ্য সংগ্রহের জন্য এখন আমাদের কী করতে হবে? ঠিক ভেবেছ, আমাদের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুসন্ধান করতে হবে। অনুসন্ধানী কাজের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের আগে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি। উত্তরগুলো লিখে ফেললে অনুসন্ধানী কাজটি করা অনেক সহজ হয়ে যাবে।

ছক: অনুসন্ধানী কাজে তথ্য সংগ্রহের আগে করণীয়

প্রশ্ন	উত্তর
আমার অনুসন্ধানের বিষয়বস্তু কী?	
আমার অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য কী?	
আমার অনুসন্ধানের হাইপোথিসিস (যদি থাকে)?	
আমার অনুসন্ধানের তথ্যের উৎস কারা?	
আমার অনুসন্ধানের তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি কোনটি?	
আমার অনুসন্ধানের জন্য কত সময় ও বাজেট প্রয়োজন?	
আমার অনুসন্ধানের জন্য তথ্য সংগ্রহের সময় অনুমতি নিয়েছি কি?	

আমরা পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য নিতে পারি। এজন্য আমাদের একটি প্রশ্নমালা তৈরি করতে হবে। প্রশ্নমালাটি আমাদের পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক পরিচয় বিষয়ক প্রশ্ন দিয়ে সাজাব। নিচে তথ্য সংগ্রহের জন্য কিছু বিষয় দেওয়া হল। এই বিষয় অনুসারে আমরা কয়েকটি প্রশ্ন তৈরি করব।

আমার পরিবার

- পূর্বপুরুষের নাম
- পূর্বপুরুষের আবাসস্থল
- বর্তমান ঠিকানা
- বংশ/গোত্র/সম্প্রদায়
- ভাষা
- ধর্ম
- প্রথা
- রীতি-নীতি
- উৎসব উদযাপন
- ভৌগোলিক অবস্থান

তথ্য সংগ্রহের বিষয়

প্রশ্ন তৈরির কাজ হয়ে গেলে আমরা পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করব। তথ্য সংগ্রহের পর আমরা এখন কী করব? একদম ঠিক ভাবছ, আমরা তথ্য বিশ্লেষণ করে ফলাফল নির্ণয় করব। প্রাপ্ত ফলাফল থেকে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিব।

সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে আমরা যে তথ্য পেলাম তা বিশ্লেষণ করে প্রাপ্ত ফলাফল থেকে আমরা নিচের ছকটি পূরণ করব।

অনুশীলনী ৩: আমার পারিবারিক পরিচয়

অভিভাবক:	
পূর্বপুরুষের নাম	
পূর্বপুরুষের আবাসস্থল	
বর্তমান ঠিকানা	
বংশ/গোত্র/সম্প্রদায়	

ভাষা	
ধর্ম	
প্রথা	
রীতি-নীতি	

ছক পূরণ হয়ে গেলে আমরা দলে বসে আমাদের তৈরি করা ছকটি নিয়ে আলোচনা করি। আমরা আগের মতো পরস্পরের মিল ও অমিল খুঁজি। ছকটি আমরা যত্ন করে রেখে দিব। এই শিখন অভিজ্ঞতার পরবর্তী কাজের জন্য ছকটি প্রয়োজন হবে। এরপর আমরা আত্মপরিচয় সম্পর্কে বিস্তারিত জানব।

একজন মানুষের আত্মপরিচয় গড়ে ওঠে তার পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে।

- ভৌগোলিক পরিচয়: সমভূমি, পাহাড়, হাওর অঞ্চল বা ব্যস্ত জনপদে বসবাসের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা
- রাজনৈতিক পরিচয়: জাতীয় বা নাগরিক/রাষ্ট্রীয় পরিচয়
- সাংস্কৃতিক পরিচয়: নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, পোশাক, ভাষা ইত্যাদি
- পারিবারিক পরিচয়: পারিবারিক কাঠামো (যৌথ বা একক), পরিবারে অবস্থানগত পরিচয়
- সামাজিক পরিচয়: পেশা বা জীবিকাধর্মী, সামাজিক অবস্থানভিত্তিক

এখন আমরা কয়েকজন মনীষীর আত্মপরিচয় সম্পর্কে জেনে নিই। তাঁদের পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক পরিচয় খুঁজে বের করি।

পরিচয়: বাঙালি মনীষী

নোবেল বিজয়ী বাঙালি অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের কথা তোমরা জানো। তিনি বহুদিন যুক্তরাজ্যের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। ওই দেশের বিশ্ববিদ্যালয় হলো অনেকগুলো কলেজের সমাহার। একসময় তিনি কেমব্রিজের সবচেয়ে খ্যাতিমান কলেজ ট্রিনিটির সর্বোচ্চ পদ 'মাস্টার অব ট্রিনিটি' ছিলেন। সেই সময়ে একবার বিদেশ থেকে ফিরে লন্ডনের হিথরো বিমানবন্দরের অভিবাসন বিভাগের কর্মকর্তার কাছে পাসপোর্টটা দিয়ে যখন দাঁড়ালেন, তখন সেই ভদ্রলোক তাঁর ঠিকানায় মাস্টার্স লজ (অর্থাৎ মাস্টারের বাড়ি), ট্রিনিটি দেখে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, ট্রিনিটির মাস্টার কী তোমার বন্ধু?

একজন ভারতীয় তাঁদের দেশের সর্বোচ্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষ পদের অধিকারী হবেন এটা তিনি স্বপ্নেও চিন্তা করেননি।

অমর্ত্য সেন

ঢাকার সেন্ট গ্রেগরি স্কুল

শান্তি নিকেতনের পাঠ ভবন

ট্রিনিটি কলেজের আলোকচিত্র

তিনি একটি বইতে বিস্তর আলোচনার পর দেখিয়েছেন যে প্রতিটি মানুষের অনেক পরিচয় থাকে। যেমন : নিজের পরিচয় দাঁড় করাতে গিয়ে তিনি লিখেছেন একই সময়ে আমি একজন এশীয়, একজন ভারতীয় এবং একজন বাঙালি। একজন অর্থনীতিবিদ, যার দর্শনে আগ্রহ রয়েছে, একজন লেখক, সংস্কৃতজ্ঞ, ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্রের একজন একনিষ্ঠ অনুসারী, একজন পুরুষ যার সহানুভূতি রয়েছে নারীবাদের প্রতি, হিন্দু পারিবারিক ঐতিহ্যে বড়ো হলেও ব্যক্তিগত জীবনে আচার-অনুষ্ঠান নিয়ে ভাবিত নন ইত্যাদি। হয়ত এই তালিকা আরও দীর্ঘ করা যায়।

অধ্যাপক অমর্ত্য সেনের সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা জেনে নাও।

অমর্ত্য সেনের জন্ম ১৯৩৩ সালে শান্তিনিকেতনে। বাবা আশুতোষ সেন ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের শিক্ষক। মা ছিলেন রবীন্দ্রনাথের অতি ঘনিষ্ঠজন শান্তিনিকেতনের প্রধান ব্যক্তিদের একজন, পন্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রীর কন্যা অমিতা সেন। ক্ষিতিমোহন ছিলেন সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক। প্রাচীন বৈদিক হিন্দু শাস্ত্র সম্পর্কে সুশিক্ষিত এবং মধ্যযুগের উত্তর ও পূর্ব ভারতে হিন্দি ও নানা দেহাতি ভাষায় যে মানবতাবাদী লোকধর্মের চর্চা হয়েছিল, তাঁর একজন অনুরাগী পাঠক ও গবেষক। তাঁর কথা একটু বেশি বললাম, কারণ ,অমর্ত্য সেনের মানস গঠনে তাঁর যথেষ্ট অবদান ছিল। পিতার সূত্রে তাঁর মা অমিতা সেন ছিলেন রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্যা এবং রবীন্দ্রনৃত্যের প্রথম যুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের একজন। সেই সুবাদে তাঁর সন্তানের নামকরণ করেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অমর্ত্য সেনের পড়াশোনাশুরু হয়েছিল ঢাকায় সেন্ট গ্রেগরি স্কুলে। তারা থাকতেন তখনকার ঢাকার অভিজাত আবাসিক এলাকা ওয়ারীতে। পরে অমর্ত্য বাবা-মায়ের সঙ্গে শান্তিনিকেতনে চলে আসেন এবং সেখানকার স্কুল পাঠভবনে ভর্তি হন। পরে সেখানকার কলেজ থেকে আইএসসি (এখনকার এইচএসসি) পাস করেন। এখানে তিনি অনেক বিশিষ্ট শিক্ষক, অধ্যাপক, সাহিত্যিক, শিল্পীর সান্নিধ্যে আসেন। আর সেখানে ছিল অবারিত প্রকৃতি, সংগীত ও সংস্কৃতির এক প্রাণবন্ত পরিবেশ। এই পরিবেশ তাঁর মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি আগ্রহ তৈরি করেছে। আর তা মানুষটির বহুমাত্রিক পরিচয় তৈরির সহায়ক হয়েছে।

তারপর কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়েছেন অর্থনীতি নিয়ে। সেখানেও সহপাঠী এবং শিক্ষক উভয় দিক থেকেই তিনি ছিলেন সৌভাগ্যবান। নিজের কৃতিত্বে ও বাবার সহযোগিতায় পরে পড়তে যান ইংল্যান্ডে। সেখানে ক্যামব্রিজ থেকে গ্র্যাজুয়েশন ও পিএইচডি করেন। তারপরে দেশে ফিরে দিল্লি ও কলকাতায় বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পড়িয়েছেন। একসময় ফিরে আসেন ইংল্যান্ডে। পরবর্তী দীর্ঘকাল ইংল্যান্ড, বিশেষত ক্যামব্রিজ ছিল তাঁর আবাস। প্রায় ১০ বছর তিনি আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি ও দর্শন বিষয়ে অধ্যপনা করেন। তিনি দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ, ক্ষমতা এবং সর্বোপরি কল্যাণ অর্থনীতি বিষয়ে গবেষণা করে যুগান্তকারী বই লিখেছেন। অর্থনীতিতে অবদানের জন্য তিনি ১৯৯৮ সালে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। অর্থনীতির পাশাপাশি তিনি দর্শনও পড়িয়েছেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার নোবেলজয়ী সাহিত্যিক নাদিন গার্ডিমার অধ্যাপক অমর্ত্য সেনকে আখ্যা দিয়েছেন ‘বিশ্ব বুদ্ধিজীবী’। তাঁকে বিশ্ব বিবেকও আখ্যা দেওয়া যায়। তিনি যেমন আমাদের মুক্তিযুদ্ধে সমর্থন দিয়েছেন, তেমনি স্বৈরতন্ত্র হটিয়ে গণতান্ত্রিক অভিযাত্রায়ও পাশে থেকেছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আমন্ত্রণে অমর্ত্য সেন একাধিকবার বাংলাদেশে এসেছেন। বর্তমানে প্রায় ৯০ উর্ধ্ব বয়সেও পৃথিবী ও মানবতার যেকোনো সংকটে তাঁর বিবেকী কন্ঠস্বর শুনে আমরা আশ্বস্ত হই।

অমর্ত্য সেন তাঁর বইতে বলেছেন, মানুষ যখন তার বহু পরিচয় ভুলে কোনো একটি পরিচয়কে প্রকট করে তোলে, তা নিয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ে, তখন তার মধ্যে বিবেচনা কমে গিয়ে আবেগের প্রাবল্য দেখা দেয়, যুক্তির পরিবর্তে অন্ধ বিশ্বাস জন্মায়। আমরা জানি, অন্ধ রাগ থেকে আরও অনেক নেতিবাচক বোধের জন্ম হতে পারে। এতে সহানুভূতির পরিবর্তে ঘৃণার জন্ম হয়। এর ফলে শান্তি নষ্ট নয়। অনেক সময় দেখা যায়, ফুটবল খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বী ক্লাবের অন্ধ সমর্থকদের মধ্যে মারামারি লেগে যায়। সেই সময় মানুষগুলোর মনে কেবলমাত্র ক্লাবের প্রতি আনুগত্যই প্রাধান্য পায়। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি বাহিনীর বাঙালি নিধনের উন্মত্ততায় আমরা হতবাক হয়ে যাই। তেমনি আবার ভরসা ফিরে পাই যখন দেখি, পৃথিবীর ভিন্ন ভাষী ভিন্ন ধর্মের মানুষ মুক্তিযুদ্ধে আমাদের ন্যায্য লড়াইয়ের সমর্থনে এগিয়ে আসে। ব্রিটিশ গায়ক জর্জ হ্যারিসন ও সেতারবাদক পণ্ডিত রবিশংকর ১৯৭১ সালের আগস্টে নিউইয়র্কে আয়োজন করেছিলেন 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ'। ফ্রান্সের লেখক ও পরে মন্ত্রী আঁদ্রে মালরো সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছিলন। আর আমাদের মুক্তিযুদ্ধে হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান যেমন পাশাপাশি লড়াই করেছে, তেমনি জীবনও দিয়েছে একসঙ্গে। বোঝা যায় ,সব মানুষ কখনো একসঙ্গে তাঁদের বোধ বিবেচনা হারায় না।

অনুশীলনী ৪:

বিভিন্ন প্রেক্ষাপট বিবেচনায় অর্মত্য সেনের আত্মপরিচয় লিখি

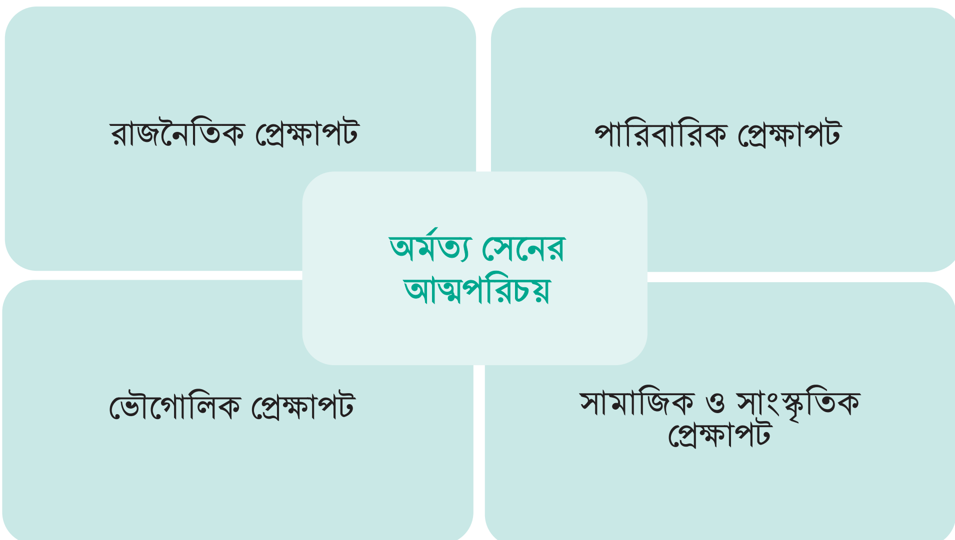

এতক্ষণ আমরা মোটামুটি সরলভাবেই আলোচনা করেছি। কিন্তু মানুষের জীবনে বহুরকম সম্পর্ক তৈরি হয় যা কিছু দলীয় বা সংঘবদ্ধ পরিচয় তৈরি করে। দেখবে অনেক সময় দেশ, জেলা বা শহরের নামে সমিতি হয়।

ভিন্ন দেশ, জেলা বা শহরে বসবাসকারী একই দেশ, জেলা বা শহরের মানুষজন নিজেদের আঞ্চলিক পরিচয়ে কোনো ভালো লক্ষ্য থেকেই সমিতি গড়ে তোলেন। আমরা তো জানি, মানুষ সামাজিক প্রাণী, সমাজ অর্থাৎ পরিচিত, সমমনা মানুষ ছাড়া তার ভালো লাগে না। মানুষ আজকাল বেশি গড়ে পেশাভিত্তিক সংগঠন। এভাবে পেশাভিত্তিক সমিতি যেমন আইনজীবী, প্রকৌশলী, চিকীৎসক, সাংবাদিক সবারই এরকম একক পেশাগত পরিচয়ে সংগঠন থাকে। এগুলো পেশাগত কাজে যেমন ভূমিকা রাখে, তেমনি মানবিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক দায়িত্ব পালন করে। অনেকে ক্লাব গঠন করে খেলাধুলা, নাটক চর্চা ও অন্যান্য বিনোদনমূলক কাজও করেন। আবার দেখা যায় চাকরিতে অবসরপ্রাপ্ত মানুষও সংঘবদ্ধ হন, মূল উদ্দেশ্য অবসর জীবনে নিরাপদ, ভালো ও আনন্দে থাকা। সমিতি সে লক্ষ্যে আয়োজন করে থাকে। ইদানীং বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন ছাত্ররাও নানা সংগঠন তৈরি করে পুনর্মিলনীর আয়োজন করে। এর মধ্যেও মানুষের সামাজিকতার প্রমাণ মেলে।

কমরেড মণি সিংহ (১৯০১-১৯৯০)

ইলা মিত্র (১৯২৫- ২০০২)

পরিস্থিতি এবং নিজের বিবেক-বুদ্ধির মাধ্যমে আমরা অনেক সময় নিজেদের কোনো একটি পরিচয়কেই গুরুত্ব দিয়ে থাকি বা নতুন একটি পরিচয় গ্রহণ করি, যেমন মণি সিংহ ও ইলা মিত্র নিয়েছেন। একইভাবে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় একদিকে বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ যেমন বাঙালি পরিচয় থেকে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছে, অন্যদিকে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীও আমাদের বাঙালি পরিচয়কে গুরুত্ব দিয়ে নির্মম হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় বাঙালিদের মধ্যে গায়ক শহিদ আলতাফ মাহমুদ, চিত্রকর- যেমন, শিল্পী মুক্তিযোদ্ধা শাহাবুদ্দীন আহমেদ, চলচ্চিত্র নির্মাতা জহির রায়হান, আমলা তৌফিক-ই-এলাহী চৌধুরী বীর বিক্রম প্রমুখ বিভিন্ন অঙ্গনের মানুষ তাঁদের বিচিত্র আগ্রহ ও পরিচয়কে বাদ দিয়ে কেবল বাঙালি পরিচয়কেই একমাত্র বড়ো করে দেখেছিলেন। তাঁরা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন, কেউ কেউ শহিদ হয়েছেন। আর পাকিস্তানিরাও আমাদের বৈচিত্র্যময় পরিচয়গুলো ভুলে কেবলমাত্র বাঙালি হিসাবে গণ্য করে হত্যার লক্ষ্যে আক্রমণ চালিয়েছিল। সেদিন বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাঙালির এমন এমন জাগরণ ঘটেছিল, এমন ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে, বহু মানুষ তাঁদের এতদিনের রাজনৈতিক আনুগত্য বা পছন্দের দলের অবস্থান কী তা ভাবনা থেকে বাদ দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে শামিল হয়েছিলেন। বলা যায়, এ ছিল জাতি হিসাবে এদেশের বাঙালির কাছে ইতিহাসের বিশেষ সন্ধিক্ষণের চাহিদা।

শহিদ আলতাফ মাহমুদ (১৯৩৩-১৯৭১)

চলচ্চিত্র নির্মাতা জহির রায়হান (১৯৩৫-১৯৭২)

চিত্রকর শিল্পী মুক্তিযোদ্ধা শাহাবুদ্দিন (১৯৫০-)

সেদিন এ চাহিদার ন্যায্যতা এত স্পষ্ট ছিল যে এদেশে বসবাসকারী অন্যান্য ক্ষুদ্রনৃগোষ্ঠীর মানুষও মুক্তিযুদ্ধে যুক্ত হতে অনুপ্রাণিত হয়েছিল। তেমনি বিভিন্ন সময়ে হিন্দু-মুসলমানে স্বার্থের সংঘাত হলেও সেদিন মানুষ ধর্মীয় পরিচয়ের দূরত্ব ভুলে গিয়ে ভাষা-জাতি পরিচয়ে এক হয়েছিল। আর এ অভাবিত ঘটনা ঘটেছিল মূলত বঙ্গবন্ধুর জাদুকরি নেতৃত্বের গুণে। এবং এ কারণেই তিনি ইতিহাসের মহানায়ক।

তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, আমাদের একেকজনের অনেক পরিচয় থাকে কেবল এটুকু বললে বিষয়টা পরিষ্কার বোঝা যায় না। পরিস্থিতি ও বাস্তবতার আলোকে অনেক রকম বিকল্প পরিচয়, এমনকী কখনো একক পরিচয়ও প্রাধান্য পায়। তখন অন্য পরিচয়গুলো সাময়িকভাবে স্থগিত রাখতে হয়। অমর্ত্য সেন তাই পরিচয় পছন্দের ক্ষেত্রে যুক্তি ও বিবেচনার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। অর্থাৎ আমরা যেন যুক্তি ও বিবেচনা প্রয়োগ করেই নিজেদের বৈচিত্র্য ও একত্বের বিষয়গুলো নির্বাচন করি।

আমরা হয়তো অনেকেই জানি যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক একজন ভারতীয়। বাংলাদেশের মেয়ে টিউলিপ সিদ্দিকী যুক্তরাজ্যের বিরোধী দলীয় এমপি। তিনি বঙ্গবন্ধুর নাতনি, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাগনি, তাঁর ছোটোবোন শেখ রেহানার কন্যা।

আমাদের মধ্যেও ভবিষ্যতে কেউ কেউ এভাবে অন্য দেশের বিশিষ্ট মানুষ হবে।

আসলে খোঁজ নিলে দেখব, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এরকম ভিন্ন দেশের মানুষজন অনেক বড়ো বড়ো পদে থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। ধরো, বিশ্বের একসময়ের সর্বোচ্চ ভবন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের সিয়ার্স টাওয়ারের নকশা করেছেন বাংলাদেশি প্রকৌশলী ফজলুর রহমান খান। তাঁকে বলা হয় আকাশচুম্বি বহুতল ভবনের প্রকৌশলের জনক। ফজলুর রহমান খানের জন্ম বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার একটি ছোট শহরে। তিনি বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা শেষ করে উচ্চতর পর্যায়ের অধ্যয়নের জন্য আমেরিকায় চলে গিয়েছিলেন। পরে সেখানে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ নির্মাণ সংস্থায় কাজ করার সূত্রে আকাশচুম্বি ভবনের নির্মাণকৌশল আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কারের বিশেষত্ব হলো, এর মাধ্যমে অতিরিক্ত উঁচু ভবন নির্মাণে বাতাসের গতি ও ভূকম্পনের সম্ভাব্য ক্ষতি প্রতিরোধ। প্রকৌশলী খানের উদ্ভাবিত টিউবপদ্ধতি পরবর্তীকালে সুউচ্চ ভবন নির্মাণে সবাই ব্যবহার করছেন। স্থাপত্য ও কাঠামো-প্রকৌশলে সারা বিশ্বে বাংলাদেশের এই মানুষটি একজন কীংবদন্তি বিশেষ। পরপর ছয় বছর তিনি আমেরিকার সেরা স্থপতির রাষ্ট্রীয় সম্মান পেয়েছেন। সর্বশেষ এই সম্মানের সাল ১৯৭১ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বছর। ফজলুর রহমান খান তাঁর কতিপয় আমেরিকান বন্ধু এবং আমেরিকায় বসবাসকারী বাঙালিদের সহায়তায় মুক্তযুদ্ধে সহায়তার জন্য ওয়েলফেয়ার আপিল ফান্ড এবং বাংলাদেশ ডিফেন্স লীগ গঠন করেন। প্রবাসে থেকে এবং একজন আমেরিকান হয়েও তিনি প্রকৃত বাঙালি ছিলেন, নানাভাবে মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখেন।

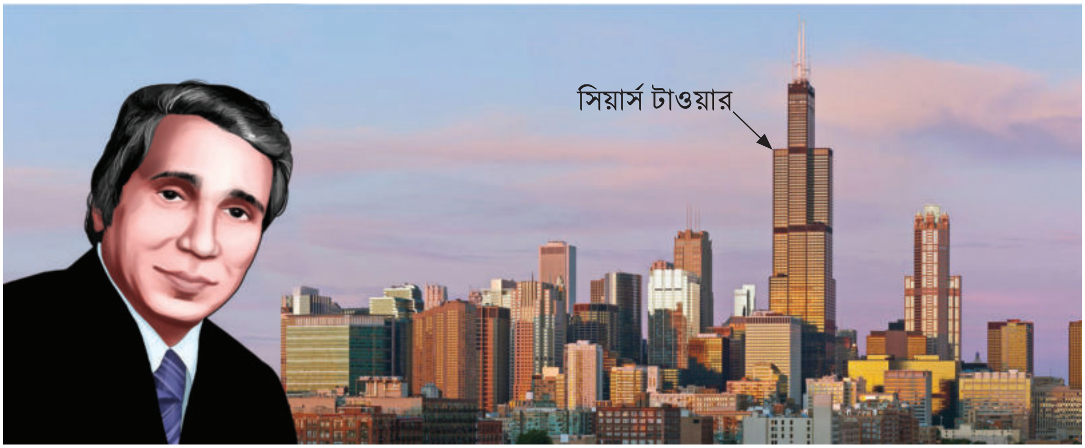

সিয়ার্স টাওয়ার ও প্রকৌশলী ড. ফজলুর রহমান খান (১৯২৯-১৯৮২)

তখনকার অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার থেকে সারা বিশ্বের পাকিস্তানি দূতাবাসে কর্মরত বাঙালিদের চাকরি ছেড়ে দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছিল। তিনি ওইসব বাঙালিদের চাকরি ছাড়তে উদ্বুদ্ধ করেন এবং অর্থনৈতিক সহায়তার ব্যবস্থা করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধুর আমন্ত্রণে তিনি বাংলাদেশে এসেছিলেন। ১৯৮৩ সালের ২৭ মার্চ ফজলুর রহমান খান মাত্র ৫৩ বছর বয়সে হৃদরোগের আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। ১৯৯৯ সালে ফজলুর রহমান খানকে স্বাধীনতার পদক (মরনোত্তর) প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মানে ভূষিত করা হয়। ভেবে দেখো, কোনো দেশের মানুষ কোথায় গিয়ে কীভাবে খ্যাতিমান হচ্ছেন, এমনকী বিশ্বব্যাপী পরিচিতি পাচ্ছেন।

অনুশীলনী ৫: বিভিন্ন প্রেক্ষাপট বিবেচনায় প্রকৌশলী ড. ফজলুর রহমান খানের আত্মপরিচয় লিখি

ফজলুর রহমান খানের আত্মপরিচয়

রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট	পারিবারিক প্রেক্ষাপট
ভৌগোলিক প্রেক্ষাপট	সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট

আমরা এখন বুঝতে পারছি একজন মানুষ একাধিক দেশের পরিচয় বহন করতে পারেন। মানুষের চলাচল শুরু হয়েছে অনেক আগেই। আদি মানুষের উৎপত্তি হয়েছে প্রধানত আফ্রিকায়। সেখান থেকে তাঁদের কিছু কিছু মানুষ বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। সেটা ছিল আদিকালের অভিবাসন। অভিবাসন এখনও আছে, তবে পদ্ধতি-প্রক্রিয়া পরিবর্তিত হয়েছে।

জাতীয় পরিচয়

অষ্টম শ্রেণির তারেকের মামা পনেরো বছর আগে উচ্চমানের শিক্ষার জন্য কানাডায় গিয়েছিলেন। পড়াশোনা শেষ করে সেখানে ভালো চাকরি পেয়ে যান। সেখানেই বিয়ে করে সংসার পাতেন তারপর থেকে তিনি ওখানেই থাকেন। মাঝে মাঝে পুরো পরিবার নিয়ে বাংলাদেশে বেড়াঁতে আসেন। তারা সবাই কানাডার নাগরিক। বাঙালি হয়েও তারা কানাডিয়ান হিসাবে পরিচয় দিতে পারেন। অবশ্য মামা ও মামি এখনো রাষ্ট্রীয় পরিচয়ে বাংলাদেশের নাগরিক, একই সঙ্গে কানাডারও নাগরিক। তাঁদের ছেলে মেয়েরা কানাডায় জন্ম নিয়ে কানাডার নাগরিক পরিচয় বহন করছে, তারা বাংলাদেশের নাগরিক নয়।

তাঁদের সন্তানেরা কানাডার নাগরিক হলেও নিজেদের বাঙালি হিসাবে পরিচয় দেয়। কারণ, তারা মা-বাবার কারণে বাঙালি সংস্কৃতি ধারণ করে, বাংলায় কথা বলে, খাদ্য-পোশাক, আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদি আমাদের দেশের আর সবার মতোই। অর্থাৎ তাঁদের নাগরিক পরিচয় কানাডিয়ান হলেও তারা নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ে বাঙালি। কানাডায় ওদের পরিচয়ে ক্ষুদ্রনৃগোষ্ঠী বলা হয়ে থাকে। কোনো কোনো দেশে অভিবাসন আইন অনুসারে স্থায়ীভাবে বাস করতে হলে জন্মস্থানের দেশের নাগরিকত্ব ছেড়ে দিতে হয়, তবে তারা নৃতাত্ত্বিক জাতিগত পরিচয়ে বাঙালি। তারা ইচ্ছা করলে নাগরিক পরিচয়ে বাংলাদেশি হতে পারে, সেক্ষেত্রে কানাডায় তাঁদের নাগরিক পরিচয় হবে প্রবাসী হিসাবে।

নাগরিকের ধারণা

একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে বসবাসকারী জনসমষ্টি সেই রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে বিবেচিত হয়। নগর বা সিটি থেকে নাগরিক শব্দের উৎপত্তি হয়েছে, প্রাচীনকালে নগরে বসবাসরত অধিবাসীদের নাগরিক বলা হতো। মানব সমাজ মূলত নগরায়ণের মাধ্যমে বিকশিত হয়েছে। ধীরে ধীরে নগর রাষ্ট্রের জায়গায় জাতীয় রাষ্ট্রের উৎপত্তি ঘটেছে। সামাজিক বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় প্রযুক্তির বিকাশ ও উন্নততর যোগাযোগ বৃহত্তর জনগোষ্ঠী রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে একত্র হয়েছে। একজন নাগরিক তার রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে রাষ্ট্র-প্রদত্ত রাজনৈতিক ও অন্যান্য সুবিধা ভোগ করার অধিকার অর্জন করে।

অর্থাৎ, নাগরিক হচ্ছেন তিনি, যিনি ওই রাষ্ট্রে বসবাস করেন এবং রাষ্ট্রের আইন, সংবিধান ও অন্যান্য নির্দেশের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেন । তবে একজন ব্যক্তি বসবাস না করেও কোনো রাষ্ট্রের আইন ও সংবিধানে অনুগত থেকে অন্য দেশে প্রবাসী হিসেবে বাস করতে পারেন কিংবা একাধিক রাষ্ট্রের নাগরিক হতে পারেন। একজন নাগরিক রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত সকল সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করবেন এবং রাষ্ট্রের কল্যাণ সাধনে নিজের কর্মের মাধ্যমে ভূমিকা রাখবেন । রাষ্ট্র নারী-পুরুষ, ধর্ম, গোত্র, নির্বিশেষে নাগরিক হিসেবে সকলের সমান অধিকার নিশ্চিত করে।

চলো এখন আমরা বাংলাদেশের নাগরিকের জাতীয় পরিচয় পত্রের বিভিন্ন অংশ সম্পর্কে জানি। আমরা পরিবারের প্রাপ্ত বয়স্ক কারো কাছ থেকে একটি জাতীয় পরিচয় পত্র নিয়ে নিচের ছবিটির সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারি। আমাদের যখন বয়স ১৮ বছর হবে আমরাও এরকম একটি জাতীয় পরিচয় পত্র পাওয়ার জন্য রাষ্ট্রের কাছে আবেদন করতে পারব।

জাতীয় পরিচয়পত্রের সামনের দিক

জাতীয় পরিচয়পত্রের পিছন দিক

বাংলাদেশের জাতীয় পরিচয় পত্রে একজন নাগরিকের বিভিন্ন তথ্য দেওয়া থাকে। এই তথ্যের ভিত্তিতে নাগরিক তার রাষ্ট্রীয় পরিচয় বহন করে। এভাবে শিক্ষার্থী হিসাবে আমাদের বিদ্যালয়ে একটি পরিচয় রয়েছে। চলো আমরা আমাদের শিক্ষার্থী পরিচয়কে খুঁজি। এজন্য নিচের তথ্যগুলো পূরণ করি।

অনুশীলনী ৬:

শিক্ষার্থীর পরিচয়	
শিক্ষার্থীরা নাম:	
শিক্ষার্থীর ইউনিক আইডি নং:	
লিঙ্গা:	
শ্রেণি:	
বয়স:	
পিতার নাম:	
মাতার নাম:	
ঠিকানা:	
বিদ্যালয়ের নাম:	

আমাদের রাষ্ট্রীয় পরিচয় আমরা বাংলাদেশি, অর্থাৎ আমরা বাংলাদেশের নাগরিক। রাষ্ট্রীয় পরিচয়কে জাতীয়তা বা ন্যাশনালিটি বলা হয়। সেই অর্থে আমরা সবাই বাংলাদেশের নাগরিক। কিন্তু নৃতাত্ত্বিক (সাংস্কৃতিক, ক্ষেত্রবিশেষে জাতি বা বর্ণভিত্তিক) পরিচয়ে একটি দেশের মানুষের মধ্যে অনেক বৈচিত্র্য থাকতে পারে। সেদিক থেকে বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী বাঙালি আর সঙ্গে আছে আরও অনেক জাতিগোষ্ঠী। অর্থাৎ আমাদের পরিচয় যখন সংস্কৃতিভিত্তিক বা নৃতাত্ত্বিক, তখন আমরা বাঙালি অথবা চাকমা, সাঁওতাল, মান্দি বা গারো, হাজং, খাসিয়া, রাখাইন ইত্যাদি। আমাদের দেশের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ে অবাঙালি এসবজনগোষ্ঠীকে এক কথায় ক্ষুদ্রনৃগোষ্ঠী বলা হয়। কোনো কোনো দেশে বা ক্ষেত্রবিশেষে সেই দেশের জনসংখ্যার মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতির তুলনায় অনেক কম কিন্তু ভিন্ন সংস্কৃতির এই জনগোষ্ঠীকে ইংরেজিতে ইথনিসিটি বলে। আমাদের দেশে এই ক্ষুদ্রনৃগোষ্ঠীদের আগে উপজাতি বা আদিবাসী বলা হতো। একটু ভিন্নতর এই জাতিগোষ্ঠীগুলোকে ‘উপ’ বলা যায় না, কারণ তাঁরা সংখ্যায় কম হতে পারে, কিন্তু তাঁদেরও রয়েছে স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য। অন্যদিকে কোনো নৃগোষ্ঠী নানা সময়ে নানা দিক থেকে এসে এই অঞ্চলে বসবাস শুরু করেছে, এদের মধ্যে কারা সবার আগে থেকে বাস করা শুরু করেছে, তা সুনির্দিষ্ট করে জাতিগত বিভাজন রেখা টানা অর্থহীন। সেই অর্থে আমরা নির্দিষ্ট কোনো জাতিগোষ্ঠীকে আদিবাসী বলতে পারিনা। বাংলাদেশে বসবাসকারী ক্ষুদ্রনৃগোষ্ঠীর এই মানুষজন বাঙালি না হয়েও বাংলাদেশি জাতীয় (ন্যাশনালিটি) পরিচয়ের দিক থেকে স্বজাতি।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

অন্য-নৃগোষ্ঠী ও বাঙালি নরনারী

নানা কারণে মানুষ মাতৃভূমি ছেড়ে অন্য দেশে গিয়ে থাকতে পারে। কিছুকাল থেকে ফিরে আসে কেউ কেউ, আবার অনেকে স্থায়ীভাবে থেকে যায়। বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ এমনভাবে প্রবাসজীবন বেছে নিয়েছে। কেউ বাস করছে প্রবাসী হয়ে, কেউ ওই দেশের অভিবাসন আইন মেনে নাগরিকত্ব পরিবর্তন করে বাস করে। অনেক বাঙালি কয়েক প্রজন্ম ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাস করছে। ২০১৯ সালের বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাব অনুসারে এক কোটির অধিক সংখ্যক বাংলাদেশি নাগরিক পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রবাসী হিসাবে বসবাস করছে।

প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে চলতে বসবাসের জন্য উপযুক্ত জায়গা খুঁজে বেড়িয়েছে। এখন থেকে প্রায় যাট হাজার বছর আগে মানুষ অভিবাসনের জন্য সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করেছিল। ভালোভাবে বাঁচার প্রচেষ্টা থেকে মানুষ সৃষ্টির আদিকালে যেমন জন্মস্থান বা মাতৃভূমি পরিবর্তন করেছে, এখনও তাই করছে। কয়েক শতাব্দি থেকে হাজার বছর বসবাসের ফলে সেই দেশের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ ও স্থানীয় সংস্কৃতির প্রভাবে চলমান পরিবর্তনে নতুন মাত্রা যোগ হয়। ফলে তাঁদের পরিচয়ে নতুন মাত্রা যোগ হয়। অন্যদিকে দেশান্তরী হয়ে মানুষ নিজের জীবনযাপন প্রণলীসহ তার ভাষা, ধর্ম, বিশ্বাস সঙ্গে নিয়ে সেখানেও ছড়িয়ে দেয়। ওখানকার মানুষজনও সেইসব সাংস্কৃতিক উপাদান ধীরে ধীরে গ্রহণ করেছে। এভাবে মানুষের পরিচয়ে বিশেষ করে জাতিগত পরিচয়ে নানা বৈচিত্র্য সৃষ্ট হয়েছে।

তোমরা আরবের বেদুইন বা উত্তর মেরুর এস্কীমোদের জীবনের তুলনা করলে দেখবে, আঞ্চলিক ভৌগোলিক পরিবেশ কীভাবে একজন মানুষের জীবনধারাকে প্রভাবিত করে ও বিশিষ্ট করে তোলে। সংক্ষেপে তাঁদের পরিচয় দেওয়া হলো।

ভৌগোলিক পরিচয়

বেদুইন: আরব উপদ্বীপে প্রাচীনকাল থেকে বসবাসকারী জাতি। এরা স্বাধীনচেতা যাযাবর শ্রেণির মানুষ। এরাই আরবের আদিম আদিবাসী। এরা সাধারণত তাঁবুতে বাস করে, উট, ভেড়া, দুম্বা পালন করে, ঘোড়ায় চড়ে চলাচল করে। তাঁদের জীবন সরল ও সাদাসিধে ধরনের। মূলত পশুপালনই তাঁদের পেশা। তারা ধর্মপ্রাণ মুসলমান। তবে আজকাল সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এদের জীবনেও অনেক পরিবর্তন আসছে। তারা মরূভূমিতে থাকে বলে চাষবাস করার সুযোগ পায় না। মরুদ্যান হলো তাঁদের প্রাকৃতিক মনোরম স্থান। তবে তারা কঠিন এবং সবল জীবনেই অভ্যস্ত।

এস্কীমো : উত্তর মেরুর তুষারাবৃত অঞ্চলের বাসিন্দা। এদের চেহারায় মঙ্গোলীয় ধাঁচ রয়েছে বলে ধারণা করা হয় এরা এশিয়া মহাদেশ থেকে প্রাচীনকালে এ অঞ্চলে এসেছিল। এরকম কঠিন প্রাকৃতিক পরিবেশে পৃথিবীর কম মানুষই বসবাস করে থাকে। রেড ইন্ডিয়ান ভাষায় এস্কীমো শব্দের অর্থই হলো কাঁচা মাংস ভক্ষণকারী। তারা তীর, বল্লম ও ফাঁদ ব্যবহার করে কয়েক ধরনের মাছ, সিল ও অন্যান্য মেরুপ্রাণী শিকার করে। এসব প্রাণী থেকেই তারা খাদ্য, বস্ত্র (চামড়া) আলো, তেল, হাতিয়ার সংগ্রহ ও তৈরি করে নেয়। তারা পরিবহন ও যাতায়াতে চামড়ার তৈরি নৌকা ‘কায়াক’ এবং কুকুরে টানা স্লেজ গাড়ি ব্যবহার করে। মাছ ও বল্গা হরিণ তাঁদের অর্থনীতিতে বড়ো ভূমিকা পালন করে। তারা সাধারণত ছোটো ছোটো দলে বাস করে। নিজস্ব পুরাণের ভিত্তিতে তারা ধর্ম ও আচার পালন করে। গ্রীষ্মে তারা তাঁবুতে ও শীতে বরফের তৈরি ইগলুতে বাস করে। মনে রেখো, ওদের দেশে ছয় মাস রাত আর ছয় মাস দিন।

সাংস্কৃতিক পরিচয়

খেয়াল করলে দেখবে, ভাষায় নতুন নতুন শব্দের প্রবেশ কিন্তু থেমে নেই। তেমনি পোশাক খাদ্য, সংগীত, শিল্পকলা সব ক্ষেত্রেই দেওয়া-নেওয়া চলছে। বলা হয় সংস্কৃতিতে গ্রহণ-বর্জন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একটু লক্ষ্য করলে দেখবে আমরা আজকাল দৈনন্দিন কথাবার্তায় ইংরেজি শব্দের ব্যবহার অনেক বেশি করছি। অনেক আগেই টেবিল, চেয়ার, পিন, ফ্যান, ফ্রিজ, অ্যালার্ম, পুলিশ ইত্যাদি শব্দ বাংলায় ব্যবহৃত হচ্ছে। ইদানীং মাউজ, ক্লিক, ফেইসবুক, টুইটার ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার ছাড়া চলছেই না। অন্যান্য ক্ষেত্রেও এরকম পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। তা বলে নিজেদের ভাষা সংস্কৃতি ঐতিহ্য ভুলে গেলেও চলবে না। ঐ যে বলা হয়েছে গ্রহণ-বর্জন সে কথাটা মনে রাখবে।

ভাবো একবার, এইভাবে নিতে নিতে আর ছাড়তে ছাড়তে মানুষের জীবনে কত পরিবর্তন ঘটে যায়। আর এইভাবেই কেউ হয়ে ওঠেন একজন অর্মত্য সেন, কেউবা হয়ে ওঠেন সত্যজিৎ রায়, কেউ জয়নুল আবেদীন, কেউ জসীম উদ্দীন। তোমরা সপ্তম শ্রেণির ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বইয়ে গ্রামের নদী-খাল-কাদা আর কৃষি ক্ষেতের মধ্য থেকে ওঠে আসা বালক মুজিবের বঙ্গবন্ধু, এমনকী বিশ্ববন্ধু হয়ে ওঠার কাহিনি পড়ে নিও।

পারিবারিক পরিচয়

অষ্টম শ্রেণির একজন শিক্ষার্থীর নাম কাজী ফরিদ, যার বাবার নাম কাজী বশির উদ্দিন; একজনের নাম শান্তা সাহা এবং তার বাবার নাম নন্দলাল সাহা। আবার এখানেই একজন আছে লিরা দ্রোফো এবং তার মায়ের নাম দিপালী দ্রোফো। মানুষের নামে দুই তিনটি শব্দ থাকে। একটি হলো তার একেবারেই নিজস্ব নাম, দুটি নামও নিজস্ব হতে পারে, আর একটি শব্দ তার পারিবারিক পরিচয় বহন করে। পারিবারিক পরিচয়ের শব্দটি বাবার বা কোনো সময় বাবা ও মা উভয়ের নামের সঙ্গেও থাকে। মাঝে মাঝে কেবল মায়ের পরিচয়ের শব্দ থেকে নেওয়া হয়। পারিবারিক পরিচয়ে একটি বিশেষ শব্দের ব্যবহার বেশ প্রাচীনকাল থেকেই নানা দেশে নানাভাবে প্রচলিত। আমাদের সমাজে পাবিবারিক পরিচয় বহনকারী শব্দের কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়।

দলগত কাজ ২:

আমরা এই শিখন অভিজ্ঞায় দলগত কাজ ১ এবং অনুশীলনী ৩ এর আমার পারিবারিক পরিচয়ের ছক থেকে তথ্য নিয়ে নিজেদের পরিচয় সম্পর্কে লিখি। আমরা পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ভৌগোলিক এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিজেদের আত্মপরিচয় লিখব। খেয়াল করলে দেখব এই দুটি ছক থেকে আমরা প্রয়োজনীয় তথ্য পেয়ে যাচ্ছি। প্রয়োজনে আমরা দলের অন্যান্য সদস্য বা শিক্ষকের কাছ থেকে সহায়তা নিয়ে নিচের ছকটি পূরণ করতে পারি।

রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

পারিবারিক প্রেক্ষাপট

ভৌগোলিক প্রেক্ষাপট

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট

বিভিন্ন প্রেক্ষাপট বিবেচনায় আমার পরিচয়

কাজটি শেষ হয়ে গেলে আমরা প্রতিদল থেকে নতুন ১-২ জন বিভিন্ন প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিজেদের পরিচয়কে উপস্থাপন করব। আমরা বন্ধুদের উপস্থাপনা শুনে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছি আত্মপরিচয় গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে

আমাদের কিছু প্রেক্ষাপটের মিল রয়েছে। আবার কিছু প্রেক্ষাপটের অমিল রয়েছে। এভাবেই আমাদের পরিচয় হয়ে ওঠে বৈচিত্র্যময় ও অনন্য।

আমরা বিভিন্ন প্রেক্ষাপট বিবেচনায় আত্মপরিচয় গড়ে ওঠার প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানলাম। আমাদের সবার আত্ম পরিচয় বৈচিত্র্যময় ও অনন্য। আমরা অনেক সময় খেয়াল করলে দেখব, আমাদের পরিচয়ের ভিন্নতা অনেকেই পছন্দ করছে না। অনেক সময় কোনো একটি নির্দিষ্ট পরিবার, এলাকার, ভাষার বা গোত্রের মানুষ হবার কারণে মানুষ বিভিন্ন রকম চ্যালেঞ্জ বা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়। অনেকেই বাজে মন্তব্য করে ফেলে। আবার অনেকে খারাপ ব্যবহার করে। কিন্তু প্রতিটি মানুষের আত্মপরিচয়ই হচ্ছে তার গর্ব। আত্মপরিচয়ের ভিন্নতার মধ্যই রয়েছে সৌন্দর্য। চলো এখন আমরা দলগতভাবে একটি কাজ করি।

দলগত কাজ ৩:

দলে আলোচনা করে ঠিক করি সমাজের মানুষ আত্মপরিচয়ের অনন্যতা ও বৈচিত্র্য ধরে রাখতে হলে কী কী চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়ে থাকে। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আমরা কী কী নীতিমালা অনুসরণ করতে পারি।

মানুষের আত্মপরিচয় ধরে রাখার চ্যালেঞ্জ

আত্মপরিচয় ধরে রাখার জন্য আমাদের করণীয় নীতিমালা

আমরা প্রতি দল থেকে ১-২ জন দলীয়ভাবে নির্ধারিত এই নীতিমালা উপস্থাপন করব। এরপর বন্ধুদের সবার সঙ্গে মত বিনিময় করে বিদ্যালয়/পরিবার/সমাজে পালনীয় কিছু নীতিমালা ঠিক করে পোস্টার পেপারে বা কাগজে লিখব। নীতিমালাগুলো 'ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতি' শীর্ষক শিরোনামে শ্রেণিকক্ষে টানিয়ে রাখব। এই নীতিমালাগুলো আমরা সারাবছর ব্যাপী অনুসরণ করব।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বঙ্গবন্ধু: মানবতা ও মানুষের মুক্তির প্রতি অঙ্গীকার

এই শিখন অভিজ্ঞতায় আমরা বর্তমানে বিশ্বে যে যে দেশে স্বাধীনতা যুদ্ধ হচ্ছে তার প্রেক্ষাপট ও কারণ শনাক্ত করব। এরপর বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানব। বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য নিয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও অন্যান্য দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বৈশিষ্ট্যগুলো শনাক্ত করে সাদৃশ্য বা মিল বের করব। সবশেষে, ২৬ মার্চের স্বাধীনতা দিবসে একটি 'স্বাধীনতা মেলা' এর আয়োজন করব। এই মেলাতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেক্ষাপট ও ফলাফল উপস্থাপন করব।

আমরা বিগত ক্লাসগুলোতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে অনেক কিছু জেনেছি। আমরা জানি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর আমরা এই স্বাধীন দেশ পেয়েছি। এই যুদ্ধ নয় মাস ব্যাপী হলেও এর বীজ বপন হয়েছিল অনেক আগে। ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণিতে আমরা এই সম্পর্কে কিছুটা জেনেছি । এই শিখন অভিজ্ঞতায় আমরা আরও বিস্তারিত জানব।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মতো পৃথিবীতে বর্তমানে কয়েকটি দেশে যুদ্ধ চলছে। আমরা হয়তো অনেকেই জানি কোন কোন দেশে এই যুদ্ধ হচ্ছে। এই যুদ্ধ কেনো সংঘটিত হচ্ছে সে বিষয়েও কিছুটা ধারণা আছে। চলো আমরা দলগত কাজের মাধ্যমে সেইসব যুদ্ধ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জেনে নিই ।

দলগত কাজ ১:

এই শিখন অভিজ্ঞতার দলীয় কাজগুলো করার জন্য আমরা নতুন করে ৫-৬ জনের একটি দল গঠন করি। দলে বসে আমরা বর্তমান বিশ্বে কোন কোন দেশে যুদ্ধ হচ্ছে তা নিয়ে আলোচনা করি। বিভিন্ন উৎস যেমন:সংবাদপত্র/বই ইত্যাদি থেকে তথ্য নিই। এরপর দলে আলোচনা করে আমরা সেই সব দেশে কেনো যুদ্ধ সংঘটিত হচ্ছে তা নিচের ছকে লিখি। প্রতিদল থেকে ১-২ জনকে আমরা নির্বাচিত করব আমাদের দলীয় কাজ উপস্থাপন করার জন্য।

বর্তমানে সংঘটিত স্বাধীনতা যুদ্ধ	কেনো এই যুদ্ধ হচ্ছে

এখন আমরা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মত্যাগ সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু বিষয় জেনে নিই।

বাংলা অঞ্চলের মানুষের ইতিহাস কত হাজার বছরের পুরোনো? নিশ্চয়ই মনে আছে তোমাদের? আজ থেকে প্রায় দশ হাজার বছর আগেও যে বাংলা অঞ্চলে মানুষের বিচরণ ছিল, তা আমরা ইতিহাসের অন্য অধ্যায়গুলো পাঠ করে ইতোমধ্যেই জানতে পেরেছি। আদিকালে বাংলা অঞ্চলে নানান স্থানের নানান রকমের মানুষ একের পর এক বসতি স্থাপন করেছে। বাংলার বিশেষ ভূপ্রকৃতি তাঁদেরকে দিয়েছে নানান সুবিধা-অসুবিধা আর টিকে থাকার পথে নানান রকমের প্রতিবন্ধকতা।

বাংলায় মানুষের টিকে থাকার ইতিহাস তাই একদল মানুষের নিজস্ব প্রাণশক্তির ইতিহাস। দ্বন্দ্ব-সংঘাত আর সমন্বয়ের বৈচিত্র্যে সাজানো ইতিহাস। প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার পাশাপাশি বাংলা অঞ্চলের মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড়ো আরও একটি প্রতিবন্ধকতা ছিল পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত নানান রাজশক্তির আগমন এবং নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি এবং পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর হাত থেকে ১৯৭১ সালে আসে মুক্তি, আসে স্বাধীনতা।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হাজার বছরের ইতিহাসে ব্যতিক্রমী একজন নেতা হিসাবে আবির্ভূত হন। প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়ে বাংলা অঞ্চলের ইতিহাসে তাঁর মতো আর কোনো নেতাকে আমরা পাইনি যিনি বাংলার মাটি-পানি-কাদা আর ঝড়বৃষ্টির পরিবেশ থেকে উঠে এসে সাধারণ মানুষের মুক্তির জন্য নেতৃত্ব দিয়েছেন। এই ভূখণ্ডের এক অতি সাধারণ পরিবার থেকে তিনি উঠে এসেছিলেন। আমৃত্যু তিনি সাধারণ মানুষের জন্যই কাজ করে গেছেন।

ব্রিটিশ শাসকরা বাংলা থেকে বিপুল পরিমাণে সম্পদ লুট করে নেয়ার জন্য এমনকিছু নীতি গ্রহণ করেছিল যার অনিবার্য পরিণতিতে সাধারণ কৃষক, শ্রমিক, কারিগরসহ সকল সাধারণ পেশাজীবী মানুষের জীবনে চরম বিপর্যয় নেমে এসেছিল। ফলে ব্রিটিশ শাসক ও তাঁদের অনুগত জমিদার শ্রেণির বিরুদ্ধে মানুষ সশস্ত্র প্রতিবাদ, বিদ্রোহ ও স্বাধীনতা সংগ্রামে জড়িত হতে থাকে। ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ, তিতুমীরের আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন, ব্রিটিশবিরোধী সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন, টঙ্ক আন্দোলনসহ নানান প্রতিবাদ-প্রতিরোধ আন্দোলন এই সময় সংঘটিত হয়।

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসনের অবসান হয়। ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার নামে এই সময় ভারত ভাগ করে তৈরি করা হয় ভারত ও পাকিস্তান নামের পৃথক দুটি রাষ্ট্র। একই কারণ দেখিয়ে বাংলা অঞ্চলের পূর্বাংশের একটি অংশকেও যুক্ত করা হয় দুই হাজার দুইশ কিলোমিটার দূরবর্তী পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রীয় কাঠামোর সঙ্গে। ভারত, পাকিস্তান এবং বাংলার দুই অংশের মধ্যেই নানান ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতির মানুষের বসতি ছিল। একই সঙ্গে ছিল একই ধর্মের নানান তরিকার মানুষের বসতি। এই বৈচিত্র্য আর বহুত্বের বাস্তবতার মধ্যেই দেশভাগ করে হিন্দু আর মুসলমানের নামে ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্র তৈরি করা হয়। বাংলা অঞ্চলের পূর্ব অংশের (পূর্ব বাংলার) মানুষ পাকিস্তান শাসন কাঠামোর অধীনে নতুন এক শোষণের জালে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। পাকিস্তানের

শাসকেরা বাংলা অঞ্চলের পূর্বাংশের মানুষের ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতি চাপিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে সকল সুবিধা নিজেদের দখলে নেয়। বাংলার পূর্বাংশের মানুষের সঙ্গে প্রভূর মতো আচরণে লিপ্ত হয়। ফলে পাকিস্তানের ক্ষমতালোভী শাসকদের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার মানুষের মনে চরম বিক্ষোভ তৈরি হয়। ১৯৪৮ সালের পর থেকেই শুরু হয় ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষার লড়াই। রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে নিজেদের মুক্ত করার লড়াই। আর বাংলার মানুষের এই লড়াই ও সংগ্রামে যিনি অগ্রভাগে থেকে আমৃত্যু লড়াই করে গেছেন , তিনি হলেন তাঁদের আপনজন, স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর হানাদার পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের মানুষ অত্যাচারী শাসকশ্রেণির বিরুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে। এজন্যই ১৬ ডিসেম্বর আমাদের বিজয় দিবস। এই বিজয় ক্ষমতালোভী শাসক ও শোষকের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের বিজয়। খেটে খাওয়া শ্রমিক, কৃষক, কারিগরসহ বাংলাদেশের প্রত্যেকটি মানুষের বিজয়। এই বিজয়ের পথ সহজ ছিল না। এর পেছনে রয়েছে রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের এক দীর্ঘ ইতিহাস। বাংলার জল-কাদা-পলিমাটি থেকে উঠে আসা একজন সাধারণ মানুষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মানবিকতা, সাহস আর আত্মত্যাগের ইতিহাস।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের বাসা থেকে জনতার উদ্দেশে হাত নেড়ে ভালোবাসা জানাচ্ছেন। পেছনে তাঁর কন্যা শেখ হাসিনা। ছবির সময়কাল: ২৩ মার্চ ১৯৭১

শেখ মুজিব জন্মগ্রহণ করেছিলেন ইংরেজ শাসিত ‘ব্রিটিশ ভারত’ উপনিবেশের পূর্ব-প্রান্তে বাংলা নামক একটি প্রদেশের (বেঙ্গাল প্রেসিডেন্সি) পূর্ব অংশে তৎকালীন ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গিপাড়ায়। তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে, বর্তমানে গোপালগঞ্জ পৃথক একটি জেলা হিসাবে বিদ্যমান। দিনটা ছিল ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ। বঙ্গবন্ধুর শৈশব ও কৈশোর কেটেছে ব্রিটিশ ভারতের বিশেষ এক রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে। ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে ইংরেজ শাসকদের বিতাড়িত করে মুক্তি লাভের জন্য ভারতের চারিদিকে তখন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছে মাত্র ষোলো বছর বয়সেই শেখ মুজিবের ভেতর এই চেতনা জাগ্রত হয় যে, স্বাধীনতা আনতে হবে। এই দেশে ইংরেজদের থাকার কোনো অধিকার নেই। বঙ্গবন্ধু তখন নিয়মিত স্বদেশি আন্দোলনের বিপ্লবী নেতাদের কাছ থেকে বিপ্লবী আন্দোলনের অভিজ্ঞতা শুনতেন। স্বদেশী আন্দোলন হলো ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন যা ১৯০৩ সাল থেকে ১৯০৮ সাল পর্যন্ত চলেছিল। নবম আর দশম শ্রেণিতে এ বিষয়ে তোমরা বিস্তারিত পরিসরে জানতে পারবে।

কলকাতায় হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধীর প্রতিবাদ সভায় তরুণ ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমান (পেছনে দাঁড়ানো) এবং হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দী (১৯৪৭)।

ভাষা, ধর্ম, সম্প্রদায় কিংবা রাজনৈতিক পরিচয়ের ঊর্ধ্বে মানুষের প্রতি ছিল বঙ্গবন্ধুর দরদ। ১৯৪৭ সালের আগে বিভিন্ন দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা এবং মহামারির সময় শেখ মুজিব হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধসহ সকলের পাশে দাঁড়িয়েছেন। দাঙ্গার সময় নিজের জীবন বিপন্ন করে মানুষ পরিচয়কে প্রাধান্য দিয়ে ভাষা-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষকে সাহায্য করেছেন। তাঁদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। দাঙ্গায় উগ্রবাদী হিন্দুদের থেকে সাধারণ মুসলমানদের

এবং উগ্রবাদী মুসলমানদের হাত থেকে সাধারণ হিন্দুদের রক্ষা করেছেন। ১৯৪৭ সালে তরুণ ছাত্রনেতা হিসাবে শেখ মুজিব হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক রায়টের বিরুদ্ধে কলকাতায় মহাত্মা গান্ধীর প্রতিবাদকে সমর্থন করেন।

১৯৪৮ সালেই পরিষ্কার হয়ে যায় যে, পাকিস্তানের ক্ষমতালোভী তথাকথিত অভিজাত শাসকেরা বাংলার পূর্ব অংশের মানুষের ওপর নতুন করে শোষণের এক জাল বিস্তারের নীলনকশা আঁকতে শুরু করেছেন। শেখ মুজিব বুঝতে পারেন, পাকিস্তান নামের নতুন এই কাঠামো কেবলই শোষণ-বঞ্চনা ও বৈষম্যের এক রাজনৈতিক খোলস বদল মাত্র। তিনি পাকিস্তানের শাসকদের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেন এবং পূর্ব পাকিস্তানের মানুষদের মুক্তির লক্ষ্যে দীর্ঘ সংগ্রামে লিপ্ত হন।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের পরপরই পূর্ব বাংলার মানুষের ওপর প্রথম আঘাত আসে ভাষার প্রশ্নে। পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় উর্দুভাষী নেতারা উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গ্রহণ করার উদ্যোগ নেন। পূর্ব বাংলার সচেতন রাজনৈতিক কর্মী, বুদ্ধিজীবী এবং সাধারণ শিক্ষার্থীরা এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল এবং সভা-সমাবেশ শুরু করেন। শুরু হয় ভাষা আন্দোলন। এই আন্দোলন তীব্র রূপ লাভ করে ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' স্লোগানে এইদিন ঢাকা শহর মুখর হয়ে ওঠে। সারা দেশের প্রায় সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিক্ষোভ মিছিল এবং ধর্মঘট পালিত হয়। পূর্ব বাংলার সাধারণ শিক্ষার্থী, সচেতন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সহ সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণে আন্দোলন তুঙ্গে পৌঁছায়। পাকিস্তানি শাসকেরা এই আন্দোলনকে নস্যাৎ করে দিতে পুলিশি নির্যাতনের পথ বেছে নেন। মিছিল ও ধর্মঘটে অবস্থান নেওয়া শিক্ষার্থী-জনতার পথ রুদ্ধ করে দেওয়া হয়। শেখ মুজিব, অলি আহাদ, শামসুল হক, মোহাম্মদ তোয়াহা সহ অনেককেই সমাবেশ থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে কারারুদ্ধ করে রাখা হয়।

১৯৪৯ সালে বঙ্গবন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের ন্যায্য দাবির পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেন। এর ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁর ছাত্রত্ব বাতিল করা হয় এবং কারাগারে বন্দি করা হয়। ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন পল্টন ময়দানের এক জনসমাবেশে 'উর্দুই হবে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা' বলে আবারও ঘোষণা দেন। ফলে ভাষার দাবিতে পূর্ব বাংলার মানুষের মধ্যে চলমান বিক্ষোভ আন্দোলন আবারও তীব্র রূপ ধারণ করে। জেলে বসেও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভাষার দাবিতে চলমান আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন এবং আন্দোলন সংক্রান্ত বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান করতেন। ১৯৫২ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু অনশন শুরু করেন। মৃত্যু অবধি না ভাঙার শপথ নিয়ে শুরু করা এই অনশন ১১ দিন ধরে অব্যাহত থাকলে পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ফেব্রুয়ারি মাসের ২৭ তারিখে জেল থেকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। অন্যদিকে, ফেব্রুয়ারির একুশ তারিখে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ধর্মঘটের আহ্বান করে। আন্দোলনরত শিক্ষার্থী-জনতা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল নিয়ে বের হলে পুলিশ তাতে নির্বিচার গুলি চালায়। পুলিশের গুলিতে নিহত হন সালাম, রফিক, বরকত, জব্বার, শফিউরসহ অনেকে। জেল থেকে পাঠানো এক বিবৃতিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভাষাশহিদদের প্রতি শোক জানান এবং শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

ভাষাশহিদদের স্মরণে আয়োজিত ভোরের র‍্যালিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এবং তাজউদ্দীন আহমদ। ছবির সময়কাল: একুশে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৪

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লেখা "অসমাপ্ত আত্মজীবনী", "কারাগারের রোজনামচা", এবং "আমার দেখা নয়াচীন"- গ্রন্থগুলো পাঠ করলে বিক্ষোভ, সংগ্রাম, মিছিল ও প্রতিবাদে মুখর উত্তাল এই দিনগুলোর চিত্র খুঁজে পাওয়া যায়। আন্দোলনরত শিক্ষার্থী ও শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর আত্মিক সম্পর্ক, পাকিস্তানের শাসকদের অত্যাচার-নিপীড়ন থেকে বাংলার মেহনতি কৃষক, শ্রমিকসহ প্রত্যেকটি মানুষের মুক্তির পথ অনুসন্ধান এবং সেই লক্ষ্যে সমস্ত দেশব্যাপী ঘুরে ঘুরে মানুষের দুঃখ-কষ্টের কথা বঙ্গবন্ধু শুনেছেন। শাসক গোষ্ঠীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে কথা বলায় তাঁকে বারবার জেলখানায় বন্দি করে রাখা হয়েছে। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ সময়কালের মধ্যে বঙ্গবন্ধুকে অসংখ্যবার গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মিথ্যা মামলায় বছরের পর বছর কারাগারে আটক করে রাখা হয়েছে। কিন্তু তাতেও তাঁকে দমানো যায়নি। কেননা, বাংলার মানুষ পাকিস্তানি শাসক ও শোষকদের সব রকম অন্যায়, অত্যাচার ও জুলুমের বিরুদ্ধে ততদিনে প্রতিবাদ করতে শিখে গেছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে তারা সংগঠিত হতে শুরু করেছে। ক্রমে ক্রমে বঙ্গবন্ধু হয়ে ওঠেন বাংলার মুক্তিকামী মানুষের পরম আস্থা এবং নির্ভরতার প্রতীক।

কারামুক্ত হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দীকে নিয়ে আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী বক্তব্য রাখছেন শেখ মুজিবুর রহমান (১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৬২)।

১৯৫৩ সালে শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৫৪ সালে অনুষ্ঠিত হয় পূর্ব-পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচন। আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক-শ্রমিক পার্টি, নেজামে ইসলাম প্রভৃতি সমমনা কিছু দল ২১ দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে যুক্তফ্রন্ট গঠন করে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, শিক্ষা সংস্কার প্রভৃতি ছিল ২১ দফা কর্মসূচির উল্লেখযোগ্য প্রতিশ্রুতি। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট জয়লাভ করে। শেখ মুজিবুর রহমান গোপালগঞ্জ আসন থেকে নির্বাচিত হন এবং ১৫ মে নতুন প্রাদেশিক সরকারের সমবায় ও কৃষিমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। যুক্তফ্রন্টের সাফল্য কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকার সুনজরে দেখেনি। মাত্র দুই সপ্তাহের মধ্যেই যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভা ভেঙে দেয়। শেখ মুজিবুর রহমানকে আবারও গ্রেপ্তার করা হয় এবং সে বছর ডিসেম্বরের ২৩ তারিখ পর্যন্ত তাকে জেলে আটকে রাখা হয়।

সেই কিশোর বয়স থেকেই আমরা বঙ্গবন্ধুর চরিত্রে মানবতার গুণাবলি প্রকাশ পেতে দেখেছি। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের মুক্তি চাইতেন তিনি। পূর্ব বাংলার সকল মানুষকে সঙ্গে নিয়ে মুক্তির লড়াই চালিয়ে যেতেই বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ১৯৫৫ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ নাম থেকে মুসলিম শব্দটি প্রত্যাহার করে দলের নাম রাখা হয় আওয়ামী লীগ। ১৯৫৬ সালে খান আতাউর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন শেখ মুজিবুর রহমান। কিন্তু এই দায়িত্বেও বেশিদিন থাকেননি। বাঙালির মুক্তির সংগ্রামকে আরও বেশি সুসংহত ও জোরদার করার লক্ষ্যে মন্ত্রিসভা থেকে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন। ১৯৫৮ সালের শেষের দিকে পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি হয়।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রধান আইয়ুব খান গণতন্ত্রের অপমৃত্যু ঘটিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা সংক্রান্ত সর্বময় ক্ষমতা নিজের হাতে তুলে নেয়। এই সময় শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন এসব উচ্চাভিলাষী শাসকদের পথের কাঁটা। শোষণমুক্ত সমাজ ও রাষ্ট্র নির্মাণের জন্য তিনি কাজ করছিলেন। তাঁকে দমন করার জন্য পাকিস্তান সরকার একের পর এক মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করতে থাকে। টানা ১৪ মাস জেলে বন্দি রেখে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়, আবার সেই জেল গেট থেকেই গ্রেপ্তার করা হয়। পরবর্তী কয়েক বছর ধরেই পাকিস্তানের জান্তা সরকার এভাবে নানান মিথ্যা মামলায় শেখ মুজিবকে গ্রেপ্তার করে জেলে আটকে রাখে। মুক্ত হবার পর শেখ মুজিব আবারও স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে যুক্ত হন। বাংলার আপামর মানুষকে নিয়ে মুক্তির লড়াই চালিয়ে যেতে থাকেন।

১৯৬৬ সালে পাকিস্তানের লাহোরে বঙ্গবন্ধু ‘৬ দফা দাবি’ নামে একটি প্রস্তাবনা পেশ করেন। প্রস্তাবিত এই ৬ দফা ছিল **বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ**। মানুষের জন্য মুক্তির বার্তা। ৬ দফার পক্ষে দেশজুড়ে জনমত গড়ে উঠতে থাকে। শেখ মুজিব বাংলার নদী আর কাদামাটির পথে ঘুরে ঘুরে মানুষের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেন। গণসংযোগ করেন। মানুষের এই ব্যাপক সমর্থন পাকিস্তানি শাসকদের অস্তিত্বের ভিত কাঁপিয়ে দেয়। ১৯৬৬ সালেই সিলেট, ময়মনসিংহ এবং ঢাকায় গণ সংযোগ চলাকালে বঙ্গবন্ধুকে বেশ কয়েকবার গ্রেপ্তার করা হয়। নারায়ণগঞ্জে পাটকল শ্রমিকদের জনসভায় বক্তৃতা শেষে বঙ্গবন্ধুকে আবার গ্রেপ্তার করা হলে বাংলার সাধারণ মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর সঙ্গে আটক নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবিতে সারাদেশে ধর্মঘট পালিত হয়। এই ধর্মঘটের মধ্যে পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালায়। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, টঙ্গীতে পুলিশের গুলিতে ১১ জন শ্রমিক নিহত হয়। এসব হত্যা এবং দমননীতি দিয়েও বাংলার মুক্তিকামী জনতাকে আটকে রাখা যায়নি।

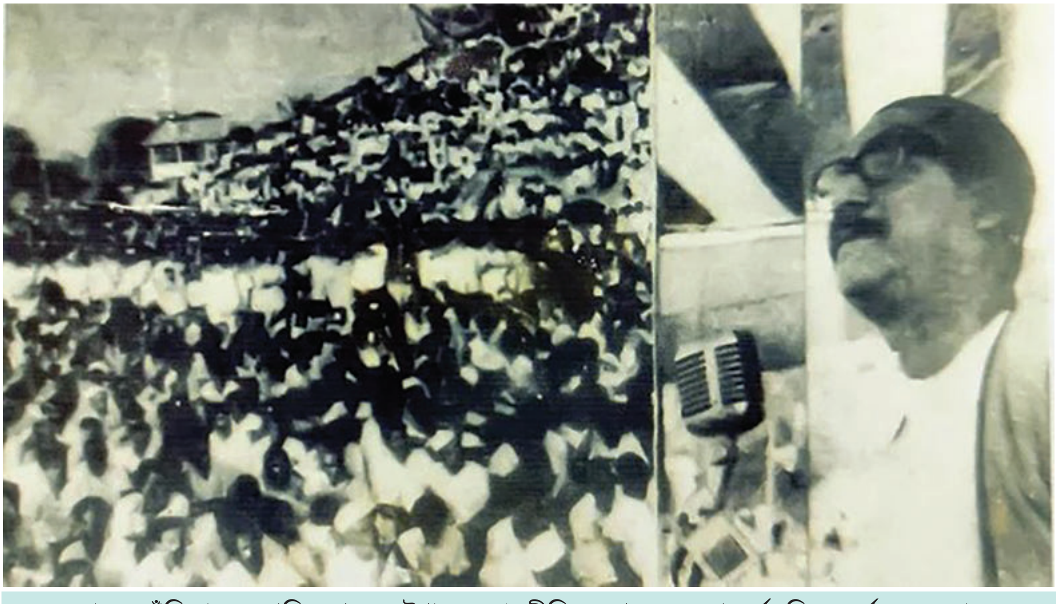

১৯৬৬ সালের পঁচিশে ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু চট্টগ্রামের লালদীঘি ময়দানে ৬ দফা কর্মসূচির সমর্থনে বক্তৃতা করছেন

১৯৬৮ সালে পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধুকে প্রধান আসামি করে মোট ৩৫ জন বাঙালি সেনা ও সিএসপি অফিসারের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগ এনে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে। বঙ্গবন্ধু এই অভিযোগে আবারও গ্রেপ্তার হন। মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার এবং বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবিতে দেশব্যাপী শিক্ষার্থী আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলনে বাংলার কৃষক, শ্রমিক, তাঁতি, জেলে, কামার-কুমারসহ আপামর জনতা যোগ দেয়। দেশজুড়ে গণআন্দোলন গড়ে ওঠে। জনগণের এই চাপের মুখে পাকিস্তানি শাসকেরা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে বঙ্গবন্ধুসহ অন্যান্য আসামিকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। বঙ্গবন্ধুর মুক্তি উপলক্ষে ১৯৬৯ সালে ২৩ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে রেসকোর্স ময়দানে একটি সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। এই সংবর্ধনা সভাতেই কয়েক লক্ষ ছাত্র-জনতার উপস্থিতিতে শেখ মুজিবুর রহমানকে আনুষ্ঠানিকভাবে ‘বঙ্গবন্ধু” উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

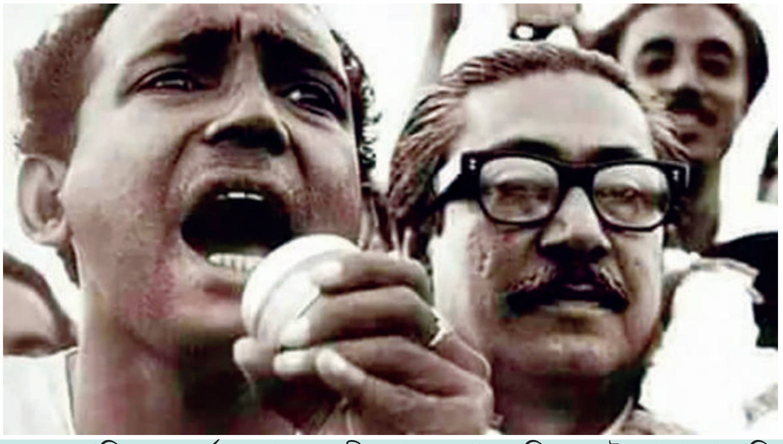

১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত এক সংবর্ধনা সভায় লাখো মানুষের উপস্থিতিতে শেখ মুজিবুর রহমানকে “বঙ্গবন্ধু” উপাধি প্রদান করা হয়।

১৯৬৯ সালেই ডিসেম্বর মাসের ৫ তারিখে হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দীর ষষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আওয়ামী লীগ আয়োজিত এক আলোচনা সভায় বঙ্গবন্ধু পূর্ব বাংলার নামকরণ করেন ‘বাংলাদেশ’। তিনি বলেন —

> “এক সময় এদেশের বুক হতে, মানচিত্রের পৃষ্ঠা হতে ‘বাংলা’ কথাটির সর্বশেষ চিহ্নটুকুও চিরতরে মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে। .... একমাত্র ‘বঙ্গোপসাগর’ ছাড়া আর কোনো কিছুর নামের সঙ্গে ‘বাংলা’ কথাটির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি। ... জনগণের পক্ষ থেকে আমি ঘোষণা করছি, আজ থেকে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশটির নাম ‘পূর্ব পাকিস্তান’ -এর পরিবর্তে শুধুমাত্র ‘বাংলাদেশ’।“

এভাবেই ‘বাংলাদেশ’ আমাদের হলো। সাধারণ মানুষের মুক্তির চিন্তায় নিবেদিতপ্রাণ একজন বঙ্গাবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশ নামে একটি দেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস তৈরি হলো।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গাবন্ধুর আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। আওয়ামী লীগ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন এবং প্রাদেশিক পরিষদে ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৮৮টি আসন লাভ করে। পাকিস্তানের উচ্চাভিলাষী-ক্ষমতালোভী শাসকগোষ্ঠী বাংলার মানুষের এই রায় দেখে বিচলিত হয়ে ওঠে। বঙ্গাবন্ধুর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার জন্য তারা নানান ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়।

বাংলার মানুষ পাকিস্তানি শাসকদের এই ষড়যন্ত্র এবং ক্ষমতা আঁকড়ে রাখার প্রতিবাদে দেশজুড়ে হরতাল, সমাবেশ এবং বিক্ষোভ মিছিল শুরু করে। বঙ্গাবন্ধু বুঝতে পারেন, পাকিস্তানি শাসকদের হাত থেকে এত সহজে বাংলার মানুষের মুক্তি মিলবে না।

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানের (বর্তমান নাম সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) এক ঐতিহাসিক জনসভায় বঙ্গাবন্ধু বাংলার মানুষের মুক্তির দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। শোষণমুক্তি এবং অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে তিনি প্রকারান্তরে গেরিলা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে পাকিস্তানি শাসকদের বিতাড়িত করে বাংলার স্বাধীনতা অর্জনের ঘোষণা দেন। রেসকোর্স ময়দানে সমবেত লাখো মানুষের জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে বঙ্গাবন্ধু বলেন, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, জয় বাংলা।" বাংলার মানুষকে মুক্ত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করে তিনি আরও বলেন, "প্রতিটি ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেবো, এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ।"

৭ মার্চ, ১৯৭১, এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম'– রেসকোর্স ময়দানে মুক্তিকামী লাখো মানুষের মহাসমুদ্রে এক ঐতিহাসিক ভাষণে বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ডাক দেন। ২০১৭ সালের ৩০ অক্টোবর ১৮ মিনিটের এই ভাষণকে ইউনেস্কো বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য বা "ডকুমেন্টারি হেরিটেজ" ঘোষণা করেছে।

পাকিস্তানের স্বৈরশাসক ইয়াহিয়া খানের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। একদিকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নির্দেশ, অন্যদিকে ধানমন্ডি ৩২ নম্বর থেকে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ। বাংলার মানুষ ইয়াহিয়া খানের নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে অফিস, আদালত, ব্যাংক, বিমা, স্কুল-কলেজ, গাড়ি, শিল্প কারখানা চালাতে শুরু করে। এর ফলে ইয়াহিয়া খানের শাসনব্যবস্থা ধসে যায়। পাকিস্তান সরকার পঁচিশে মার্চ দিবাগত রাতে বাংলার নিরীহ মানুষের ওপর মরণাস্ত্রে সজ্জিত সেনাবাহিনী দিয়ে পৃথিবীর ইতিহাসের নির্মমতম ও বর্বর গণহত্যা চালায়। তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পিলখানা রাইফেল সদর দপ্তর ও রাজারবাগ পুলিশ হেডকোয়ার্টার আক্রমণ করে।

১৯৭১ সালের পঁচিশে মার্চ রাত ১২টা ২০ মিনিটে (২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে) পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার হওয়ার পূর্বে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার এই ঘোষণা বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় ওয়্যারলেস, টেলিফোন ও টেলিগ্রামের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।

বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণাটি ছিল নিম্নরূপ:

'এটাই হয়তো আমার শেষ বার্তা। আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। বাংলাদেশের জনগণ, তোমরা যে যেখানেই আছ এবং যার যা কিছু আছে, তাই নিয়ে শেষ পর্যন্ত দখলদার সৈন্য বাহিনীকে প্রতিরোধ করার জন্য আমি তোমাদের আহ্বান জানাচ্ছি। পাকিস্তান দখলদার বাহিনীর শেষ সৈনিকটিকে বাংলাদেশের মাটি থেকে বিতাড়িত করে চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে।'
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, অসমাপ্ত আত্মজীবনী (প্রকাশ সাল জুন ২০১২, পৃষ্ঠা-২৯৯)

বঙ্গবন্ধুর এই ঘোষণা শুনে দেশের সর্বস্তরের জনগণের পাশাপাশি চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, যশোর সেনানিবাসের বাঙালি সৈনিকেরা অস্ত্র হাতে নিয়ে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলেন। রাত ১টা ৩০মিনিটে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করে ঢাকা সেনানিবাসে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে তিনদিন পর বন্দি অবস্থায় তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় পাকিস্তানের লয়ালপুর জেলখানায়।

১৯৭১ সালের পঁচিশে মার্চ রাতের আঁধারে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বাঙালি জনগণের ওপর নৃশংস হত্যাযজ্ঞ শুরু করলেও মুক্তির চেতনা থেকে তাঁদের সরাতে পারেনি। বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে পূর্ব বাংলার মানুষ সশস্ত্র সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠিত হয়। গণপরিষদ কর্তৃক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করা হয়। সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপরাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দীন আহমদ প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়ায় সৈয়দ নজরুল ইসলাম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এপ্রিলের ১৭ তারিখ এই সরকার মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে (বর্তমান মুজিবনগর) শপথ গ্রহণ করে।

দীর্ঘ ৯ মাস ধরে একদিকে পাকিস্তানি হায়নাদের অত্যাচার, নির্যাতন, দমন-পীড়ন, অন্যদিকে বাংলার মানুষের মুক্তির সংগ্রাম চলতে থাকে। পাকিস্তানি সৈন্যরা ৯ মাসে প্রায় ৩০ লাখ নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করে, লক্ষ লক্ষ মেয়েকে ধরে নিয়ে গিয়ে নির্যাতন করে, বাংলার অসংখ্য ঘরবাড়ি আর গ্রাম পুড়িয়ে দেয়। বাংলার মুক্তিকামী জনতাকে এতকিছু করেও তারা দমিয়ে রাখতে পারেনি। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ডাকে সাড়া দিয়ে বাংলার প্রায় প্রত্যেকটি গ্রাম আর ঘর থেকে অসংখ্য শিক্ষার্থী, কৃষক, শ্রমিক, জনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। দীর্ঘ ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানি বাহিনীকে পরাজিত করে তাঁদেরকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করে এবং পাকিস্তানের শেষ সৈন্যটিকে বাংলার মাটি থেকে বিতাড়িত করে মুক্তি আর বিজয় ছিনিয়ে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়। দখলদার পাকিস্তানি সেনাদের পরাজয় এবং আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে।

যুদ্ধের সময় এবং পরাজয়ের পরেও পাকিস্তান সরকার মিথ্যা মামলায় সাজা দিয়ে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার চক্রান্তে লিপ্ত ছিল। কিন্তু আন্তর্জাতিক মহল, বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনায়ক ও কূটনীতিবিদদের চাপের কারণে তা বাস্তবায়ন করতে পারেনি। বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানের কারাগার থেকে তারা মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের মাটিতে পা রাখেন। ১২ জানুয়ারি যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং দেশ গড়ার কাজে পরিপূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেন।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা

ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি, মুক্তিযুদ্ধ আর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-কে নিয়ে অনুসন্ধানের মাধ্যমে যেটুকু তথ্য হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছ তাঁর আলোকে চলো মুক্তমনে বিষয়টা নিয়ে ভাবি। মানুষের মুক্তি এবং নিজের মতো করে বাঁচা ও জীবন গঠনের স্বাধীনতাই হলো মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। আমার ভাষা, সমাজ, সংস্কৃতি আর জীবন-যাপনের স্বাধীনতা, ধর্ম-বর্ণ-ভাষানির্বিশেষে সকল মানুষ মিলেমিশে আনন্দে বেঁচে থাকার অধিকার, নিজের দেশ নিজে গড়ে তোলার স্বাধীনতা আর সর্বপ্রকার অর্থে মুক্তির নিশ্চয়তাই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। এই চেতনায় আমরা বাংলাদেশ গড়ে তুলব। বঙ্গবন্ধু নিজে এই চেতনায় বাংলাদেশ গড়ে তোলার উদ্যোগও গ্রহণ করেছিলেন। স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা মাঠে-খামারে কৃষকের সঙ্গে কাজ করতে শুরু করেছিল। কল-কারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধিতে নিজেদের যুক্ত করেছিল। গ্রামের পর গ্রাম নিরক্ষরতা দূর করতে দিন-রাত শিক্ষার্থীরা কাজ করেছে। এইভাবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটেছিল বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি গ্রামে, শহরে, পাড়ায়, মহল্লায়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একাত্তরের যুদ্ধে আহত একজন মুক্তিযোদ্ধার সঙ্গে কথা বলছেন।
স্থান: ঢাকা মেডিকেল কলেজ। ছবির সময়কাল: ১৯৭২

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এবং বাংলাদেশের প্রথম পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য অধ্যাপক আনিসুর রহমান বলেন, ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত সময়ে বাংলাদেশে মানুষের কল্যাণে নিজ হাতে স্বদেশ গড়ে তোলার বহুমুখী প্রকল্প গ্রহণ করে বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধের চেতনার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন।

যাহোক, বাংলায় মানুষের ওপর হাজার বছর ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা শাসক এবং সবশেষে পাকিস্তানি শাসকদের নির্মম অত্যাচার, নির্যাতন আর শোষণের কথা তোমাদের সকলের এখন জানা। বাংলার সাধারণ মানুষ কীভাবে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে একটি দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে ক্ষমতালিপ্সু শাসকদের বিতাড়িত করে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটিয়েছে তারও কিছু কিছু অনুধাবন করেছ।

পৃথিবীর অন্যান্য অনেক দেশেই ঠিক একইভাবে অত্যাচারী ও ক্ষমতালোভী রাজা, যোদ্ধা ও শাসকদের বিরুদ্ধে লড়াই করে মানুষ স্বাধীনতা অর্জন করেছে। উদাহরণ হিসাবে আমরা বলিভিয়া, কলম্বিয়া, তিউনিসিয়া, ভিয়েতনাম, দক্ষিণ আফ্রিকার নাম বলতে পারি। আবার অনেক দেশ রয়েছে, যেখানে এখনও মানুষ নিজের ভূমিকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার জন্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীতে বিগত কয়েক হাজার বছরের ইতিহাসে নানান জায়গায় যুগে যুগে নানান রাজশক্তির উদয় হয়েছে। তবে ইতিহাস পাঠ থেকে তোমাদের এই উপলব্ধি হবে যে, সাধারণ মানুষের ওপর কোনো রাজশক্তি অত্যাচার-নির্যাতন চালিয়ে, মানুষকে শোষণ করে তৈরি করা ক্ষমতার প্রাসাদ এক সময় সাধারণ মানুষের আন্দোলন সংগ্রামের ফলেই ভেঙে যেতে বাধ্য।

আর একটা তথ্য তোমাদের জানাই। ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আলজেরিয়ায় অনুষ্ঠিত জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, 'পৃথিবী আজ দুই ভাগে বিভক্ত। এক ভাগে শোষক শ্রেণি আরেক ভাগে শোষিত। আমি শোষিতের দলে।'

ভিয়েতনাম যুদ্ধ

ভিয়েতনাম হচ্ছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ। প্রশান্ত মহাসাগরের সুনীল জলধারার তীর ঘেঁষে অবস্থিত সবুজ-শ্যামল এই দেশটি। বাংলাদেশের মতোই ভিয়েতনামের মানুষদের রয়েছে একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের ইতিহাস। দীর্ঘ কয়েক দশকের সংগ্রাম আর নানান ত্যাগ-তিতিক্ষার মধ্য দিয়ে ক্ষমতালোভী শাসকদের বিতাড়িত করে স্বাধীনতা অর্জনের ইতিহাস। উনিশ শতকের শেষের দিকে ভিয়েতনাম ছিল ফ্রান্সের দখলে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুর দিকে ফ্রান্সের পাশাপাশি ভিয়েতনামে জাপানের আধিপত্যও শুরু হয়। ফ্রান্স এবং জাপান — এই দুইটি দেশে ভিয়েতনামের ওপর নিজেদের দখল প্রতিষ্ঠা করে। এই দুইটি দেশ ভিয়েতনামকে ভাগাভাগি করে শাসন শুরু করে।

ঔপনিবেশিক এই শাসকদের আগ্রাসন থেকে মুক্তি লাভের জন্য হো চি মিন নামক ভিয়েতনামের একজন বিপ্লবী নেতা একটি স্বাধীনতা সংঘ গঠন করেন। এই সংঘের নাম দেওয়া হয় 'ভিয়েত মিন'। এই সংগঠনে যোগদান করে ভিয়েতনামের মুক্তিকামী মানুষ জাপানের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করে। ১৯৪৩ সালের দিকে এই যুদ্ধ শুরু করে তারা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান দুর্বল হতে শুরু করে। ১৯৪৫ সালে হো চি মিন ভিয়েতনামের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। মুক্তিকামী মানুষেরা ভিয়েতনামের বিভিন্ন অংশ বিদেশি শাসকদের দখল থেকে মুক্ত করে নিজেদের অধীনে নিয়ে আসতে শুরু করেন। কিন্তু এই মুক্তির পথে আবারও বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় ফরাসি শক্তি। ফ্রান্সের সৈন্যরা ভিয়েতনামের দক্ষিণ ভাগ দখল করে নিজেদের মনোনীত শাসককে ক্ষমতায় বসায়। ভিয়েতনামের দক্ষিণ অংশে ফরাসিদের আধিপত্য আবারও শক্তিশালী রূপ ধারণ করে। ১৯৫৪ সালে ভিয়েত মিন সংঘের স্বাধীনতাকামী যোদ্ধারা দক্ষিণ ভিয়েতনামে চূড়ান্ত আঘাত এবং ফরাসি শক্তিকে পরাজিত করে। কিন্তু এইখানেই এই যুদ্ধের অবসান ঘটেনি। ১৯৫৪ সালে এক চুক্তির মধ্য দিয়ে ভিয়েতনামকে দুইভাগ করে দক্ষিণ ভিয়েতনামের রাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতাচর্চা শুরু হয়। উত্তর ভিয়েতনামের বিপ্লবী মানুষের প্রতি রাশিয়া এবং চীনের সহানুভূতি ছিল। মূলত এই কারণেই দক্ষিণ ভিয়েতনামে যুক্তরাষ্ট্র নিজেদের আধিপত্য বিস্তারে মরিয়া হয়ে ওঠে। রাশিয়া (তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন) এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ছিল বেশকিছু আদর্শগত দ্বন্দ্ব।

এই দ্বন্দ্বের জের ধরেই দক্ষিণ ভিয়েতনামে একটি সরকার প্রতিষ্ঠা করে যুক্তরাষ্ট্র নিজেদের প্রভাব জোরদার করে। সমগ্র ভিয়েতনাম যাতে একত্রিত হতে না পারে সেই লক্ষ্যে দক্ষিণ ভিয়েতনামে অস্ত্র এবং সৈন্য প্রেরণ করে। একদিকে ভিয়েতনামের মুক্তিকামী মানুষের স্বাধীনতার লড়াই, অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা চর্চার লড়াই। এই লড়াই ১৯৬৩ সালের দিকে শুরু হয় এবং এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তা চলতে থাকে। মার্কিন সৈন্যরা অস্ত্র এবং সমরবিদ্যায় উন্নত ছিল। তারা ভিয়েতনামের উত্তর অংশে হামলা করে চিরতরে বিনাশ করে দিতে চেয়েছিল। মার্কিন সেনাদের আক্রমণে ভিয়েতনামের হাজার হাজার যোদ্ধা মৃত্যুবরণ করে। বোমার আঘাতে দেশের অধিকাংশ জায়গা ধ্বংস্তূপে পরিণত হয়। কিন্তু এতকিছুর পরেও ভিয়েতনামের মুক্তিকামী মানুষেরা লড়াই থেকে সরে যায়নি। হত্যা, নির্যাতন, ধ্বংসলীলা সত্ত্বেও তারা গেরিলা কায়দায় যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকে। অত্যাচারী শাসকদের থেকে মুক্তি লাভের অদম্য বাসনা আর দেশপ্রেম ছিল ভিয়েতনামের যোদ্ধাদের প্রধান শক্তি। আর এই কারণেই যুদ্ধের রসদ, অর্থ এবং সমরবিদ্যায় এগিয়ে থাকা সত্ত্বেও মার্কিন যোদ্ধারা হার মানতে বাধ্য হয়। দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের পর ভিয়েতনামের মানুষেরা বিদেশি শাসকদের আধিপত্য থেকে মুক্তি লাভ করে। উত্তর ও দক্ষিণ অংশ একত্রিত করে স্বাধীন-সার্বভৌম ভিয়েতনাম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে।

পৃথিবীতে মানব সভ্যতার শুরু থেকেই দুইটি বিশেষ ধারার অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। একদল মানুষ নানাবিধ প্রাকৃতিক প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্যের বিকাশ ঘটিয়ে নিজেদের টিকে থাকার লড়াই চালিয়ে গেছে। ধর্ম-বর্ণ-ভাষা নির্বিশেষে সকল মানুষ মিলেমিশে সুন্দর একটা জীবন পরিচালনা করেছে। অন্য একদল মানুষ বিভিন্ন অস্ত্রে সজ্জিত সৈন্যবহর নিয়ে সেইসব সাধারণ মানুষের ওপর দখলদারিত্ব করেছে। এসবের ফলে মানুষের জীবন হয়েছে বিপর্যস্ত। মানবতা হয়েছে ভূলুণ্ঠিত। শাসকের অত্যাচার আর শোষণে জর্জরিত হয়েছে জনজীবন। বাংলা অঞ্চল আর ভারতবর্ষের হাজার বছরের ইতিহাসেও একই ঘটনা ঘটেছে। ১৯৪৭ সালে ভারত আর ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর অকল্পনীয় অবদান ও আত্মত্যাগ সম্পর্কে অনেক বিষয় জানলাম। চলো তাহলে আমরা এখন আরেকটি দলগত কাজ করি।

দলগত কাজ ২:

দলে বসে আমরা বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আলোচনা করি। আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করি। এরপর বিশ্বের যেকোনো একটি বা দুটি দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করি। এই জন্য আমরা পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত ভিয়েতনাম যুদ্ধ থেকে তথ্য নিতে পারি। এছাড়াও বিভিন্ন বই/পত্রিকা/আর্টিকেল থেকেও তথ্য নিতে পারি। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে অন্যান্য দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সাদৃশ্য বের করি। এরপর আমরা দলীয় কাজ উপস্থাপন করি। এই উপস্থাপনার জন্য নতুন ১-২ জনকে নির্বাচন করি।

	বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ	পৃথিবীর অন্যান্য দেশের যুদ্ধ
যুদ্ধের কারণ		
নেতৃত্ব দিচ্ছেন যিনি/যাঁরা		
যোদ্ধা		
মিত্রপক্ষ		
শত্রুপক্ষ		
যুদ্ধের ফলাফল		

আমরা দলগত কাজটি করে বুঝতে পেরেছি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের মিল আছে। সবাই শোষণ ও নীপিড়ন থেকে মুক্তির জন্য শাসক বা শোষকের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। বঙ্গবন্ধুর মতো আমরা নিজেরাও শোষিতের পক্ষে একাত্মতা ঘোষণা করব। আমরা প্রত্যাশা করব, একদিন মানবতার জয় হবে। সকল ভেদাভেদ দূরে ঠেলে দিয়ে মানুষের জয় হবে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ আমাদেরকে সেই শিক্ষাই দিয়ে গেছে।

দলগত কাজ ৩:

দলগতভাবে আমরা আরেকটি কাজ করব। আমরা এর আগের ক্লাসের এক বা দুটি অন্য দেশের যুদ্ধ সম্পর্কে বিস্তারিত খুঁজে বের করেছি। এখন একটি দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রেক্ষাপট ও ফলাফল অনুসন্ধান করব। আমরা অনেক তথ্য বিগত ক্লাসের দলগত আলোচনায় খুঁজে পেয়েছি। এইবার প্রয়োজনে আরও একটু ভালোভাবে অনুসন্ধান করব। এরপর প্রতিটি দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ নিয়ে একটি নাটিকা/ পোস্টার পেপার/ পাওয়ার পয়েন্ট ইত্যাদি যেকোনো মাধ্যমে দলগতভাবে উপস্থাপন করব। এই উপস্থাপনার জন্য আমরা **‘স্বাধীনতা মেলা’** এর আয়োজন করব। লক্ষ্য রাখব মেলাটি যেনো ২৬শে মার্চের দিন আয়োজন করা হয়।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস জানার উপায়

এই শিখন অভিজ্ঞতায় আমরা প্রথমে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম’ এর একটি ঘটনা সম্পর্কে জানব। এই ঘটনার বিষয়ে আমরা নিজেদের মতামত প্রদান করব। এরপর নিজেদের মতামতের ভিন্নতা নির্ধারণ করব। পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত ইতিহাসের বিষয়বস্তু পাঠ করব। এরপর খেলার মাধ্যমে তথ্য কীভাবে পরিবর্তিত হতে পারে তা জানব। ‘বৃটিশ আমলের শাসন ব্যবস্থা' নিয়ে কয়েকজন লেখক ও গবেষকের লেখা পড়ব। এই লেখা পাঠ করে লেখকদের মতামতের ভিন্নতাগুলো নির্ধারণ করব। এরপর আমরা ভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের দুইজন ব্যক্তি নির্ধারণ করব। দুইজন ব্যক্তির কাছে একই ঐতিহাসিক ঘটনার মতামত সংগ্রহ করব। তাঁদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা মতামতের ভিন্নতায় কী ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে তা নির্ধারণ করব।

চলো তাহলে আমরা একটি ঘটনা সম্পর্কে জেনে নিই।

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম

কবি কাজী নজরুল ইসলাম সব সময় শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে তিনি কলম ধরেছেন বার বার। তার লেখায় ছিল ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হবার আবেদন। তাইতো তিনি জীবনে অনেক বার হয়েছেন কারাবন্দি। ব্রিটিশরা তাঁকে রাজদ্রোহী হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। অন্যদিকে বাংলার মানুষের কাছে তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন বিদ্রোহী কবি হিসেবে। তার লেখা গান ও কবিতা আজও আমাদের উদ্দীপ্ত করে। আজও আমরা খুঁজি পাই যেকোনো অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর শক্তি।

অনুশীলনী ১:

আমরা এখন জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী চেতনা সম্পর্কে নিজেদের মতামত লিখি। প্রয়োজনে আমরা বিভিন্ন উৎসের সহায়তা নিতে পারি।

আমরা নিজেদের মতামতগুলো উপস্থাপন করি। সহপাঠীদের উপস্থাপনা শুনে আমরা অনেকেই বুঝতে পারছি, জাতীয় কবির বিদ্রোহী চেতনা আমাদেরকে ভাবিয়েছে। আমরা নানান দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করে নিজেদের মতামত প্রদান করেছি।

লক্ষ্য করলে দেখব, ইংরেজ শাসক গোষ্ঠী কবিকে রাজদ্রোহী হিসেবে চিহ্নিত করেছে। কিন্তু বাংলার মানুষ এখনও তাঁকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন শোষণ ও নীপিড়নের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো এক নির্ভীক যোদ্ধা ও বিদ্রোহী কবি হিসেবে। এভাবেই একই ঐতিহাসিক ঘটনা ব্যক্তির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় ভিন্ন ভিন্ন মতামত বা বয়ান তৈরি করে।

এখন আমরা আমাদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট থেকে ইতিহাস জানার উপায় সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নিই।

পহেলা বৈশাখ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ। গ্রামের মাঠে বৈশাখী মেলা দেখার দারুণ অভিজ্ঞতা হয়েছে মরিয়মের। জীবনে প্রথমবার সে মাটির পুতুল, খেলনা, পুতুলনাচ, নাগরদোলা, লাঠিখেলা দেখেছে। গ্রামের সকল ধর্মের সকল মানুষকে মিলেমিশে একসঙ্গে আনন্দ করতে দেখেছে। মেলায় আসার আগে মরিয়মের দাদু ওকে নিয়ে গিয়েছিল বাজারের বড়ো একটি দোকানে যেখান থেকে তাঁদের সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনা হয়। দাদুর কাছ থেকে মরিয়ম শুনেছে, বাংলা সন চালুর পর থেকে নাকী ব্যবসায়ীরা হালখাতা আয়োজন করেন। বঙ্গাব্দের প্রথম তারিখে প্রতিটি দোকানে হিসাবের নতুন খাতা খোলা হয়। পুরাতন বছরের সকল হিসাব নিকাশ শেষ করে নতুন খাতায় শুরু হয় হিসাবের নতুন যাত্রা। রীতি হিসেবে চলে পেট ভরে মিষ্টি খাওয়া।

বৈশাখী মেলার মাঠে নাগরদোলা, মাটির খেলনা, চরকী, বাঁশি, রঙিন বেলুনসহ নানা রকমের খেলনা পাওয়া যায়। সবাই নতুন পোশাকে সেজে মেলায় আসে। নানান রকমের খেলনা কেনে, খাবার কেনে, নাগরদোলায় চড়ে। দেখতে খুব ভালো লাগে।

মরিয়ম আনন্দমনে তার অভিজ্ঞতার গল্প বলে চলেছে। কথাগুলো মন দিয়ে শুনছিল মাইকেল, রেণু, নীলান্ত আর মাসুদ। চোখেমুখে নতুন কিছু দেখা, জানা ও শেখার আনন্দ নিয়ে নীলান্ত যোগ করল, নৌকা বাইচের কথা।

নীলান্ত বলল, এবারই প্রথম সে নৌকা বাইচ দেখেছে তাঁদের গ্রামের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদীতে। নদীর দুই পাড়ে চলছিল কয়েক হাজার মানুষের আনন্দ-উৎসব। ছয়-সাতটি দল বাইচে অংশ নিচ্ছিল। মাঝি ভাইদের গানে গানে আর ছন্দে ছন্দে চলছিল নৌকাবাইচ। মরিয়ম আর নীলান্তের আনন্দ-অভিজ্ঞতা শুনতে শুনতে অনেক প্রশ্ন এসে ভীড় করেছে ওদের মাথায়।

রেণু বলল, শুনেছি আমাদের নানু, দাদুদের সময়ে এবং তার বহু আগেও নাকী বড়ো আয়োজনে বৈশাখী মেলা বসতো। দোকানে দোকানে হালখাতা হতো। আয়োজন করা হতো নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতা।

নৌকাবাইচ বাংলার আবহমান সংস্কৃতির অংশ। মাঝি ভাইদের গানে গানে আর ছন্দে ছন্দে চলে নৌকা বাইচ। নানা রকমের নকশা আর রঙের কারুকার্য থাকে প্রত্যেকটি নৌকায় আর বৈঠায়। মাঝি ভাইদের পরনে থাকে সুন্দর পোশাক। নদীর দুই তীরে দাঁড়িয়ে কৌতূহলী মানুষ মাঝি ভাইদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হল্লা করে। সবাই দেখতে চায়, কে সবার আগে গন্তব্যে পৌঁছায়, কোন নৌকাটি জয়ী হয়!

আচ্ছা, এগুলোর ইতিহাস জানার উপায় কী?

ষষ্ঠ আর সপ্তম শ্রেণিতে ইতিহাস জানার উপায় অনুসন্ধান করে অর্জিত জ্ঞান থেকে রেণুর দিকে তাকিয়ে মাইকেল বলল, আমাদের পারিবারিক লাইব্রেরিতে ইতিহাসের অনেক বই আছে। সেইসব বই থেকে এবং নানু-দাদু আর গ্রামের মুরুব্বিদের কাছ থেকে এই প্রশ্নের উত্তর জানতে তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে। কিন্তু তথ্যগুলো পাওয়াই কেবল যথেষ্ট নয়, এগুলোকে ইতিহাস গবেষণার বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির মতো একের পর এক প্রশ্ন করে, যাচাই-বাছাই, পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর সমালোচনামূলক অনুসন্ধান করে যৌক্তিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে।

অনুসন্ধানী কাজ

দলভিত্তিক উপস্থাপনা

শ্রেণিশিক্ষক শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে বিভক্ত করে দিলেন। তারপর তিনি মজার একটি অনুসন্ধান প্রক্রিয়ায় তাঁদেরকে সম্পৃক্ত করলেন। চলো, নিচের ছবিগুলো থেকে পহেলা বৈশাখ, বাংলা নববর্ষ ও শোভাযাত্রার ইতিহাস নিয়ে দলভিত্তিক একটি লেখা তৈরি করি এবং তা শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করি। এই কাজে তথ্য সংগ্রহের জন্য তোমরা ইন্টারনেট ছাড়াও বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ 'বাংলাপিডিয়া'য় প্রকাশিত এবং এই বইয়ের শেষে পরিশিষ্ট অংশে উল্লিখিত তথ্য থেকেও প্রয়োজনমতো সাহায্য গ্রহণ করতে পারবে।

সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস কাকে বলে?

চলো এবার, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস কাকে বলে তা জেনে নেয়া যাক। ভূ ও খণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে মানুষের আচার-আচরণ, ভাষা-যোগাযোগ, বিশ্বাস, প্রথা-পদ্ধতি, রীতি-নীতি, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ সব কিছুই পৃথক হয়। এই পার্থক্যই মানুষকে ভিন্ন অভিজ্ঞতা আর পরিচয় দান করে। পৃথিবীর বুকে ভিন্ন ভিন্ন ভৌগোলিক পরিমণ্ডলের ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে নানান চ্যালেঞ্জ আর প্রতিকূলতা মোকাবিলা করে টিকে থাকার পথে মানুষের সকল কর্মকাণ্ডই হলো সংস্কৃতি। সমাজ হলো সেই সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান একটি উপকরণ।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন পরিস্থিতি আর প্রতিবন্ধকতার মোকাবিলা করতে গিয়ে মানুষের সমাজ আর সংস্কৃতির প্রতিনিয়ত রূপান্তর ঘটে চলেছে। ইতিহাস পাঠ থেকে এই রূপান্তরের কালানুক্রমিক পর্যায়গুলো সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। আরও ধারণা পাওয়া যায়, একটি ভূখণ্ডে মানুষ অতীতে কীভাবে বসবাস করত, তাঁদের নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক কেমন ছিল সেই সম্পর্কেও। সমাজের নানান উপাদানের পরিবর্তন ও রূপান্তর অনুধাবনের জন্য কালানুক্রমিক গবেষণাভিত্তিক যে প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয় তাই হলো সামাজিক ইতিহাস। একইভাবে যখন মানুষের নানান কর্মকাণ্ডের কালানুক্রমিক ইতিহাস রচনা করা হয়, তখন তা সাংস্কৃতিক ইতিহাস হয়ে ওঠে। ইতিহাস যাঁরা জানার ও লেখার চেষ্টা করেন, তারা গভীর মনোযোগের সঙ্গে অতীতকালের বিভিন্ন উৎস ও উপাদান খুঁজে বের করেন। সেগুলোর ভিত্তিতে যথাযথ গবেষণাপদ্ধতি অনুসরণ করে অতীতে সমাজ ও সংস্কৃতি কেমন ছিল, তা জানার চেষ্টা করেন।

তোমার মতে, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস কাকে বলে?

শ্রেণিকক্ষে সকলের সামনে উপস্থাপন করো।

সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের উৎস কত ধরনের হয়?

তোমরা যদি বাংলা অঞ্চলের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন গঠন ও পরিবর্তনের প্রাচীন ইতিহাস জানতে ও বুঝতে চাও তাহলে কী ধরনের উৎস বা উপাদান অনুসন্ধান করে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের চেষ্টা করতে হবে, চলো তা অনুধাবনের চেষ্টা করি। দক্ষিণ এশিয়া এবং বিশ্ব পরিপ্রেক্ষিতে তোমরা যখন সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবন গঠন ও রূপান্তরের ইতিহাস অনুসন্ধান করবে, তখনো ইতিহাসের উৎস বা উপাদান সম্পর্কে জানতে ও শিখতে পারবে। আর তোমরা তো ইতোমধ্যেই জেনেছ যে, ইতিহাস হতে হলে সকল প্রকার উৎসের ত্রুটি-বিচ্যুতি আর সমস্যাগুলোর চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণ করতে হয়। উৎসগুলোকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে হয়। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যাচাই-বাছাই করতে হয়। সমালোচনামূলক অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের যথাযথ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে তবেই যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়।

খুব সহজ করে মনে রাখার জন্য দুই ধরনের উপাদানের কথা বলা যেতে পারে। এক, সাহিত্যিক উৎস। দুই, প্রত্নতাত্ত্বিক উৎস। বাংলা অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষেরা অতীতে কেমন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন গড়ে তুলেছিলেন তার অনেকটাই জানা যাবে এই উৎসগুলো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে। সাহিত্যিক উৎসগুলোর মধ্যে রয়েছে তালপাতায় লেখা পাণ্ডুলিপি, চর্যাপদ, বিভিন্ন ধরনের কাব্যসংকলন, আইনশাস্ত্র, চিকীৎসাশাস্ত্র, কৃষি বিষয়ক গ্রন্থ, ভ্রমণ বিবরণী ইত্যাদি। প্রত্নতাত্ত্বিক উৎসগুলোর মধ্যে শিলালিপি, তাম্রশাসন, টেরাকোটা, মৃৎপাত্র, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, মুদ্রা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

চলো সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের উৎসগুলো নিচে উল্লেখ করি-

১। তালপাতায় লেখা পাণ্ডুলিপি	২।
৩।	৪।
৫।	৬।
৭।	৮।
৯।	১০।

এছাড়া বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা পর্যটকগণ রেখে গেছেন তাঁদের অভিজ্ঞতামূলক নানান বর্ণনা। এসব উৎসের ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করতে পারলে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনা করা সম্ভব হবে। মানুষের বিস্মৃত নানান ঘটনা ও অভিজ্ঞতার বয়ান জানা যাবে।

প্রাচীন লিপি পাঠোদ্ধারের কাজ কী ইতিহাসবিদর?

মনে রাখবে, ইতিহাসের যত আদিকালে তোমরা প্রবেশ করবে, ভিন্ন ভিন্ন উৎসের সঙ্গে পরিচিত হবে। দেখবে যে, ইতিহাসের উৎস কত বিচিত্র প্রকার হতে পারে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ব্যবহার্য সামগ্রীর পাশাপাশি নানান ভাষায় লিখিত গ্রন্থ ও দলিলাদি উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়। প্রতি শতকে সেই ভাষার ঘটেছে পরিবর্তন, বিবর্তন, রূপান্তর। প্রাচীনকালে দেখা যায়, বহুবিচিত্র ভাষার বহুবিচিত্র ধরন। সেগুলো পাঠোদ্ধার করাও তাই সহজ কথা নয়। পাঠোদ্ধারের এই কাজ করে থাকেন প্রাচীন লিপিবিশারদগণ, লিপিবিদ্যায় পারদর্শী

ভাষাবিদগণ। পাঠোদ্ধারের কাজ ইতিহাসবিদের নয়। ইতিহাসবিদের কাজ পাঠোদ্ধারকৃত উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য কীভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে হয় সেই বিষয় জানা। অপরাপর সহায়ক উৎসের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে কীভাবে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়, তার কলাকৌশল জানা। পাঠোদ্ধারকৃত লিখিত উৎস কীভাবে অনুসন্ধান করতে হয়, উৎস থেকে কীভাবে তথ্য বের করে আনতে হয় ইতিহাসবিদকে তা জানতে হয়। একইসঙ্গে সেই তথ্য কতটুকু গ্রহণযোগ্য আর বিশ্বাসযোগ্য তা যাচাই-বাছাই করে কীভাবে নৈর্ব্যক্তিক আর যৌক্তিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় সেই দক্ষতা ও যোগ্যতা একজন ইতিহাসবিদের থাকা প্রয়োজন।

বাংলা অঞ্চলের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস জানার উপায়

এবার বাংলা অঞ্চলে প্রাপ্ত সাহিত্যিক উৎস থেকে কীভাবে সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস লেখার তথ্য সংগ্রহ এবং তথ্যগুলোকে যাচাই-বাছাই করতে হয় তা অনুসন্ধান করে দেখা যাক। প্রথমেই জানা যাক, সাহিত্যিক উপাদানগুলো কী কী? এগুলো থেকে আমরা কীভাবে অতীতের তথ্যগুলো গ্রহণ করতে পারি?

সাহিত্যিক উৎস বা উপাদানে প্রাপ্ত সব তথ্যই কী ইতিহাস?

আঞ্চলিক বাংলায় ত্রয়োদশ০০ সাল বা সাধারণ অব্দ পর্যন্ত সময়ের সমাজ ও সংস্কৃতির বিভিন্ন তথ্য জানার জন্য যেসব সাহিত্যিক উৎস পাওয়া গেছে, তার মধ্যে শব্দপ্রদীপ, রামচরিতম, সুভাষিত রত্নকোষ, কৃষিপরাশর, কালবিবেক, দানসাগর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থগুলোকে ইতিহাসের প্রাথমিক উৎস বলা হয়ে থাকে। প্রাথমিক উৎসকে মৌলিক উৎসও বলা হয়। এগুলোতে অতীতে বাংলা অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থা, কৃষিজাত ফসল, দৈনন্দিন জীবনের চিত্র, চিকীৎসা ও আইনবিষয়ক তথ্য, সাধারণ মানুষের বিদ্রোহসহ নানান তথ্য রয়েছে। যথাযথভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে করতে পারলে এসব তথ্য থেকে তৎকালীন সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনের রূপরেখার অনেকটাই পাওয়া যেতে পারে। কারণ, তোমরা জেনেছ যে, উৎস বা উপাদানে প্রাপ্ত সব তথ্যই সত্য নয়। সাহিত্যিক উৎস থেকে তথ্য গ্রহণের আগে খোঁজ নেওয়া দরকার, উৎসটি কার হাতে তৈরি? কাদের জন্য তৈরি? ঐ উৎসে কাদের কথা বলা হয়েছে? উৎসটি নির্ভরযোগ্য নাকী পক্ষপাতদুষ্ট? এমন অনেক প্রশ্নের মাধ্যমে উৎসটির সত্যতা ও নিরপেক্ষতা যাচাই করতে হয়। তারপরই কেবল গ্রহণযোগ্য তথ্যটুকু নিয়ে ইতিহাসের যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে।

সাহিত্যিক উপাদান থেকে তথ্য সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, এখানে কবি বা লেখক একজন মানুষ। তাঁর আবেগ-অনুভূতি, কল্পনা, ব্যক্তিগত ভালো লাগা, মন্দ লাগা এ বিষয়গুলো লেখায় স্থান পাচ্ছে কীনা। অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে খুঁজে দেখতে হবে, একজন লেখক যদি কোনো শাসকের সময় কিংবা অনুগ্রহে লেখার কাজটি করেন তাহলে সেই শাসক বা রাজাকে খুশি করার জন্য অযথা প্রশংসার আশ্রয় নিতে পারেন। সমসাময়িক অন্য রাজা বা শাসককে খাটো করে দেখতে পারেন। এই অতিরিক্ত প্রশংসা কিংবা অতিরিক্ত সমালোচনা অর্থাৎ যেকোনো প্রকার অতিরঞ্জন ইতিহাস রচনাকে বাধাগ্রস্ত করে। তাই অতিরঞ্জিত বিষয় বাদ দিয়ে যৌক্তিক আর গ্রহণযোগ্য অংশটুকুই কেবল ইতিহাসে স্থান পায়।

প্রত্নতাত্ত্বিক উৎস বা উপাদান থেকে ইতিহাস জানার উপায়

এবার জানবো প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান সম্পর্কে। প্রত্নতাত্ত্বিক উৎস বা উপাদানগুলো পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে মানুষের প্রাচীন ইতিহাস লেখার জন্য গুরুত্বপূর্ণ উৎস। বাংলা অঞ্চলে বসতি স্থাপনকারী মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস জানার জন্যও এগুলোর ওপর ইতিহাসবিদগণ নির্ভর করে থাকেন। সাহিত্যিক উৎসের তুলনায় এগুলো অপেক্ষাকৃত নিরপেক্ষ এবং বিশ্বস্ত। সাহিত্যিক উৎসের পাশাপাশি প্রত্নতাত্ত্বিক উৎস ব্যবহার করা গেলে অতীতের যেকোনো ঘটনা অনেক বিস্তারিতভাবে জানার সুযোগ পাওয়া যায়। তবে বাংলা অঞ্চলের

ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে সাহিত্যিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিক উভয় উৎসের কিছুটা অভাব রয়েছে। উপাদানগুলোর অনেক সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। তা সত্ত্বেও, প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানগুলোতে সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের যে তথ্য রয়েছে তুলনামূলক বিচারে সেগুলো অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য, গ্রহণযোগ্য। ইতিহাস রচনার কাজে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎস বা উপাদানের ব্যবহার নিয়েও একজন ইতিহাসবিদের অনেক প্রশ্ন থাকে। যেমন: কোন কোন বস্তু বা উপকরণ প্রত্নতাত্ত্বিক উৎস বা উপাদান হিসেবে বিবেচিত হতে পারে? কোথায় কোথায় এ ধরনের উপাদান পাওয়া যায়? এগুলো থেকে তথ্য সংগ্রহের প্রথা-পদ্ধতি কী অনেক কঠিন? এমন অনেক প্রশ্ন নিয়ে একজন ইতিহাসবিদ অনুসন্ধানে নামেন এবং উৎসগুলোতে বিদ্যমান প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ তথ্যের ভিত্তিতে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

বাংলা অঞ্চলে যেসব প্রত্নস্থল রয়েছে এবং খননকাজ চালানো হয়েছে, তারমধ্যে পান্ডু রাজার ঢিবি, চন্দ্রকেতুগড়, তাম্রলিপ্তি, কর্ণসুবর্ণ, মহাস্থানগড়, ময়নামতি, পাহাড়পুর, উয়ারী-বটেশ্বর, বিক্রমপুর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রত্নস্থলগুলোর মধ্যেও ধরনগত পার্থক্য রয়েছে। যেমন: বাংলার পশ্চিমাংশে অবস্থিত পাণ্ডু রাজার ঢিবি হচ্ছে একটি তাম্র-প্রস্তর যুগের সভ্যতা। অন্যদিকে তাম্রলিপ্তি হচ্ছে বাংলার প্রাচীনতম একটি সমুদ্র বন্দর নগর। চন্দ্রকেতুগড়ও একটি বন্দর নগর। কর্ণসুবর্ণ বাংলা অঞ্চলের পশ্চিমাংশের একটি রাজধানী নগর। মহাস্থানগড় বাংলার উত্তরাংশের প্রাচীনতম নগরকেন্দ্র। এটি রাজধানী হিসেবেও গড়ে উঠেছিল। পাহাড়পুর ছিল মহাস্থানগড়ের কাছেই অবস্থিত একটি বৃহত্তর সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। ময়নামতির দেবপর্বত ছিল বাংলা অঞ্চলের পূর্বাংশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক ও নগর কেন্দ্র। দেবপর্বত নামে একটি রাজধানীরও পরিচয় পাওয়া গেছে। বাংলার পূর্বাংশের অপর দুটি প্রত্নস্থল হলো উয়ারী-বটেশ্বর ও বিক্রমপুর। এর মধ্যে উয়ারী-বটেশ্বর বাণিজ্যিক এবং বিক্রমপুর রাজধানী নগর হিসেবে গড়ে উঠেছিল। প্রতিটি প্রত্নস্থলেই প্রাচীনপর্বে বাংলার আঞ্চলিকভূখণ্ডের বিভিন্ন অংশে বসতি স্থাপনকারী মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন গঠন ও পরিবর্তনের মূল্যবান নিদর্শনাবলি পাওয়া গেছে।

জাদুঘরে সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের উৎস/উপাদান

ষষ্ঠ শ্রেণিতে তোমরা উপরে উল্লিখিত প্রত্নস্থলগুলোর ভৌগোলিক এবং সপ্তম শ্রেণিতে অর্থনৈতিক গুরুত্ব সম্পর্কে জেনেছ। সপ্তম শ্রেণিতে এই অঞ্চলের মুদ্রা সম্পর্কেও অনুসন্ধানের মাধ্যমে অনেক তথ্য জানতে পেরেছ। এছাড়াও ধ্বংসপ্রাপ্ত বা পরিত্যক্ত স্থাপনা, পোড়ামাটির ফলক, মাটির পাত্র, বিভিন্ন ধরনের লিপি (শিলালিপি, ভূমি ক্রয়-বিক্রয় বা লেনদেনের দলিল বা তাম্রশাসন, প্রশস্তিলিপি, মূর্তিলিপি, স্মারকলিপি ইত্যাদি), অলংকার, ভাস্কর্য, নিত্য ব্যবহার্য সামগ্রী, শিল্পপণ্যসহ বহুবিচিত্র বস্তুগত নিদর্শন প্রত্নস্থলে পাওয়া যায়।

এই নিদর্শনাবলি বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। জাদুঘরটি বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় অবস্থিত। সারা পৃথিবীতে মানুষের অতীত ইতিহাসের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অর্জনগুলো জানা ও বোঝার জন্য নানান নিদর্শনাবলি সংরক্ষণ করা হয়। জনসাধারণ এই জাদুঘরগুলো পরিদর্শন করে উল্লিখিত সকল নিদর্শন দেখতে পারেন। নিজের সাংস্কৃতিক শিকড় অনুসন্ধান ও অনুধাবন করতে পারেন। বর্তমান বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশে পঞ্চাশটির বেশি জাদুঘর রয়েছে। চলো কয়েকটি বিখ্যাত জাদুঘরের নাম জেনে নেয়া যাক:

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর (ঢাকা), লালবাগ কেল্লা জাদুঘর (ঢাকা), মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর (ঢাকা), বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর (ঢাকা), টাকা জাদুঘর (ঢাকা), বাংলাদেশ লোকশিল্প জাদুঘর (সোনারগাঁ), গণহত্যা জাদুঘর (খুলনা), জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর (চট্টগ্রাম), বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর (রাজশাহী), মহাস্থান

জাদুঘর (বগুড়া), পাহাড়পুর জাদুঘর (নওগাঁ), ময়নামতি জাদুঘর (কুমিল্লা), উপজাতীয় সাংস্কৃতিক জাদুঘর (ময়মনসিংহ ও রাঙ্গামাটি), লালন জাদুঘর (কুষ্টিয়া), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুঠিবাড়ি (কুষ্টিয়া), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছারিবাড়ি স্মৃতি জাদুঘর (সিরাজগঞ্জ) ইত্যাদি।

কার্বন-১৪ কলাকৌশল

বিভিন্ন প্রত্নস্থলে খনন করে যেসব উপাদান পাওয়া যায় তার বয়স বা সময়কাল নির্ণয় করা যায় কার্বন-১৪ নামের একটি পরীক্ষার মাধ্যমে। তার মানেযেকোনো স্থানে পাওয়া জিনিসপত্রই কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান নয়। প্রত্নস্থলে প্রাপ্ত নিদর্শনগুলো যখন বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়, তখনই কেবল এগুলো প্রত্ন-উপাদান হিসেবে গণ্য হয়। আর কার্বন-১৪ পদ্ধতি সম্পর্কে তোমরা ষষ্ঠ শ্রেণির বইয়ে বিস্তারিত জেনেছ। এই পদ্ধতির প্রয়োগ এগুলোর প্রাচীনত্ব প্রমাণ করে বা সময় নির্ধারণে সাহায্য করে। ফলে, এ ধরনের উপাদান সাহিত্যিক উপাদানের তুলনায় অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য উৎস হিসেবে গৃহীত হয়।

তাম্রশাসন কেন প্রাচীনকালের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস?

প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানগুলোর মধ্যে তাম্রশাসন খুব গুরুত্বপূর্ণ। বলা যেতে পারে, প্রাচীনকালের সবচেয়ে বিশ্বস্ত উৎস বা উপাদান। এটা সবচেয়ে বিশ্বস্ত, কিন্তু তার মানে এই নয় যে, এই উৎসের কোনো প্রকার সীমাবদ্ধতা নেই। তাম্রশাসন মূলত ভূমি লেনদেন কিংবা ক্রয়-বিক্রয়ের দলিল। তাম্রপট্ট বা তামার পাতের ওপর খোদাই করে লিখিত হতো বলেই এগুলোকে তাম্রশাসন বলা হয়ে থাকে। ভূমি ক্রয়-বিক্রয়ের দলিল হলেও তাম্রশাসনগুলোতে আরও অনেক কিছু বর্ণনা করা হতো। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের বিচিত্র রীতি-নীতি, প্রথা-পদ্ধতি, আইন-কানুন আর প্রশাসনিক ব্যবস্থার চিত্র এখানে তুলে ধরা হতো। যে জমি দান, বিক্রি বা কেনা হবে তার অবস্থান, স্থানের নাম, শাসকের নাম, গাছগাছালি, সে সময়ের ধর্ম-বিশ্বাস, হাট-বাজারসহ পারিপার্শ্বিক সমাজ জীবনের নানান তথ্য তাম্রশাসনে লিপিবদ্ধ করা হতো। তোমরা জেনে অবাক হবে যে, আঞ্চলিক বাংলায় এই ধরনের প্রায় পাঁচ শতাধিক তাম্রশাসন পাওয়া গেছে। এগুলো বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর এবং বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ সহ বিভিন্ন স্থানে সংরক্ষিত রয়েছে। বাংলা অঞ্চলে প্রাপ্ত শতাধিক তাম্রশাসন ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জাদুঘর ও প্রতিষ্ঠানেও সংরক্ষিত আছে। প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় লেখা এ সব তাম্রশাসনের মধ্যে মাত্র দেড় শতাধিক তাম্রশাসন পাঠোদ্ধার করা হয়েছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রকাশিত গবেষণা পত্রিকায় এগুলো প্রকাশিত হয়েছে। প্রাচীন এই মহামূল্যবান দলিলের অনেকগুলোই এখন পর্যন্ত পাঠোদ্ধারের জন্য অপেক্ষায় রয়েছে।

প্রাচীনকালের তাম্রশাসনগুলো থেকে তথ্য উদ্ধারের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে বাংলার আঞ্চলিকভূখণ্ডে মানুষের সমাজ ও সংস্কৃতি গঠন ও রূপান্তরের আরও অনেক আকর্ষনীয় তথ্য জানা যাবে। এর মাধ্যমে ইতিহাস অনুসন্ধানের কাজ এগিয়ে যাবে বহুদূর। তোমরা মনে রাখবে, প্রাচীন এই উৎসগুলো বিভিন্ন যুগে আঞ্চলিক বাংলার মানুষের বহুমাত্রিক সমাজ-সংস্কৃতি ও ধর্ম বিশ্বাস, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, পরিবেশ, সুখ-দুঃখের নানান চিত্র, অনুষ্ঠান, রীতি-নীতিকে ধারণ করে। তবে যে রাজার সময়ে উৎকীর্ণ বা জারি করা হতো তাম্রশাসনগুলো-তে সেই রাজা ও তাঁর বংশের গুণকীর্তন করা হতো। ইতিহাসসম্মত গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করে, সমালোচনামূলক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে এই গুণকীর্তন থেকেও সত্যটুকু খুঁজে বের করে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়।

মৃৎপাত্র এবং পোড়ামাটির ফলক থেকে ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহ

তাম্রশাসন ছাড়াও প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের মধ্যে রয়েছে নানা ধরনের মৃৎপাত্র। তোমরা জেনে অবাক হবে যে, বাংলা অঞ্চলে এমন কিছু মৃৎপাত্র তৈরি হতো যা বাংলার বাইরেও রপ্তানি হতো। অত্যন্ত মসৃণ, কালো রংয়ের কিছু মৃৎপাত্র পাওয়া যেত, যেগুলো বাংলা এবং বাংলার বাইরে বিভিন্ন অঞ্চলে পরিচিত ছিল। বাংলা অঞ্চলের মাটি ছিল এই ধরনের মৃৎপাত্র তৈরির অন্যতম কাঁচামাল। এগুলো থেকে তৎকালীন সময়ের সাংস্কৃতিক জীবনের মান নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। এগুলো দৈনন্দিন জীবনের পাশাপাশি নগর-সভ্যতার সময়কাল নির্ধারণেও সাহায্য করে। প্রত্নস্থলে পাওয়া একটি পাত্রের গড়ন, নকশা প্রভৃতি দেখে সেই ধারণা পাওয়া যায়, মানুষ কতবছর আগে এইগুলো ব্যবহার করত।

পোড়ামাটির ফলক বা টেরাকোটা ইতিহাসের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। প্রত্নস্থলে প্রাপ্ত পোড়ামাটির ফলকচিত্রগুলো যেন অতীত মানুষের জীবনের বাস্তব প্রতিরূপ। ফলকে অঙ্কীত থাকে নানান রকমের চিত্র। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের নানান ঘটনা, পশুপাখি ও জীবজন্তু, নারী সমাজের কর্মমুখর দিনলিপি, সাধারণ মানুষের অবসর-বিনোদন, সংস্কৃতির প্রতীক, বিভিন্ন ধর্মের দেব-দেবী, ফুল-লতাপাতাসহ বিচিত্র সব দৃষ্টিনন্দন চিত্র ফলকে আঁকা থাকে। অনেক সময় রাজার যুদ্ধযাত্রার চিত্রও পোড়ামাটির ফলক বা টেরাকোটায় ফুটিয়ে তোলা হতো।

কুমিল্লার ময়নামতি-লালমাই এবং পাহাড়পুরের সোমপুর মহাবিহারে পোড়ামাটির অসংখ্য ফলক পাওয়া গেছে। নদীমাতৃক বাংলার সহজলভ্য কাদামাটির সরবরাহ এই শিল্পকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিল, জনপ্রিয় করে তুলেছিল। প্রথমদিকে ফলকগুলো দেয়াল সুসজ্জিত করার জন্য ব্যবহার করা হলেও পরে বৃষ্টির পানিতে যেন দেয়াল নষ্ট না হয়, সে উদ্দেশ্যেও এগুলো ব্যবহার করা হয়।

মৃৎশিল্পীরা তাঁদের চারপাশে যা কিছু দেখতেন তাই নিজেদের সৃষ্টিশীল চিন্তার মাধ্যমে ফলকগুলোকে ফুটিয়ে তুলতেন। ফলে মানুষের জীবনের কর্মবহুল ও ঘটনাবহুল বহু বিষয় ফলকগুলোতে স্থান পেয়েছে। পৌরাণিক কাহিনি, ধর্মীয় প্রতীক, জীব-জন্তু ও পাখির ছবি, মানুষে-মানুষে যুদ্ধ, হিংস্র জন্তুর সঙ্গে মানুষের যুদ্ধরত অবস্থার ছবি, মাছ, পদ্ম ও সূর্যমুখী ফুল, হালচাষরত কৃষক, অবসরে যুবকদের আড্ডাসহ নানান বৈচিত্র্যপূর্ণ বিষয়ের সমাহার পোড়ামাটির ফলকে পাওয়া যায়।

পোড়ামাটির ফলকে হাতে আঁকা ছবি

পোড়ামাটির ফলক দেখে ইতিহাস শিখি

নিচে পোড়ামাটির ফলকের চিত্র দেয়া হলো। এই ফলকগুলোতে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কী কী চিত্র দেখতে পাচ্ছ তা খাতায় লিখে ক্লাসে সকলের সামনে উপস্থাপন করো।

প্রত্নস্থলে প্রাপ্ত পোড়ামাটির বিভিন্ন ধরনের ফলক

ইতিহাসের উৎস হিসেবে বণিক ও পর্যটকদের লেখা বিবরণী বা ভ্রমণকাহিনিগুলো কতটুকু গ্রহণযোগ্য?

ত্রয়োদশ০০ সাল বা সাধারণ অব্দ পর্যন্ত সময়ের আঞ্চলিক বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের তথ্য জানার আরও একটি উপাদান রয়েছে। আর তা হলো বিভিন্ন সময়ে বাংলা অঞ্চলে আগত পর্যটকদের বিবরণ। পর্যটকদের বিবরণগুলোকে সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। গ্রীক-রোমানদের বিবরণ, চৈনিকদের বিবরণ এবং আরবদের বিবরণ।

গ্রিক-রোমানদের বর্ণনা

গ্রিক-রোমানদের মধ্যে মেগাস্থিনিস, টলেমি, প্লিনির নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁদের বর্ণনায় আঞ্চলিক বাংলার ভৌগোলিক তথ্য বেশি পাওয়া যায়। সাধারণ পূর্বাব্দ চতুর্থ শতকে মেগাস্থিনিসের লেখা ‘ইন্ডিকা’ নামক গ্রন্থে আমরা গঙ্গারিডাই রাজ্যের নাম পাই; যা মূলত আঞ্চলিক বাংলাকেই বোঝানো হয়েছে। এটি ছিল মূলত গঙ্গা নদীর দুটি স্রোতোধারার মধ্যবর্তী ভূ-ভাগ। অর্থাৎ বাংলার পশ্চিমে ভাগীরথী এবং পূর্বে পদ্মা নদীর মধ্যবর্তী ভূ-ভাগ। এই ভূভাগের মধ্যে পড়েছে বাংলাদেশের কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, রাজবাড়ী, শরীয়তপুর, মাদারীপুর, মুন্সিগঞ্জসহ দক্ষিণের বেশ কিছু জেলা এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, তমলুক এবং কলকাতা সহ ভাগীরথী নদীর পূর্ব পাশের কয়েকটি জেলা।

এই ভূখণ্ডটিই বেঙ্গল ডেল্টা বা বঙ্গীয় ব-দ্বীপ নামে পরিচিত। টলেমি ও প্লিনির বর্ণনায় (প্রথম শতকের) আঞ্চলিক বাংলার ভৌগোলিক পরিবেশ, বিভিন্ন উপ-অঞ্চলের অবস্থান, পণ্য-দ্রব্যের দাম বিশেষত বস্ত্র, বণিকদের জীবনযাত্রা, বাংলার সমৃদ্ধির নানান চিত্র ফুটে ওঠে। তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে, বাংলা কিংবা বেঙ্গল কিংবা বাংলাদেশ বলে কোনো নামের অস্তিত্ব কিন্তু সেই সময় ছিল না। প্রাকৃতিক সীমানা দিয়ে ঘেরা একটি অঞ্চল ছিল যেখানে কাল পরম্পরায় ‘বাংলা ভাষা’ গড়ে উঠেছে সেইভূখণ্ডটিকেই ‘বাংলা’ নাম-পরিচয়ে গ্রহণ করা হয়েছে। এইভূখণ্ডে বিভিন্ন সময়ে বসতি স্থাপনকারী মানুষেরা সমাজ-সংস্কৃতি ও রাজনীতি গড়ে তুলেছে।

চৈনিকদের বর্ণনা

চীনদেশ থেকে আসা পর্যটকগণ মূলত বৌদ্ধধর্মের নানান ধারা-উপধারা সম্পর্কে জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে বাংলা অঞ্চলে এসেছিলেন। তাঁদের বর্ণনা থেকে বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্য, বৌদ্ধ ধর্মীয় সংস্কৃতির বিস্তার, মানুষের সমাজের নানান দিক সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। ফা-সিয়ানের (পঞ্চম শতক) বর্ণনায় আমরা বাংলার পশ্চিমে অবস্থিত প্রাচীনতম আন্তর্জাতিক সমুদ্রবন্দর তাম্রলিপ্তির কথা জানতে পেরেছি। এই বন্দর নগরীর ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যাবে বর্তমান ভারতের পশ্চিমবঙ্গের তমলুক জেলায়।

ফাসিয়ান (ফাহিয়েন), ইজিং (ইৎসিং), ষুয়ান জাং (হিউয়েন সাং) সহ অনেক পর্যটক বিভিন্ন সময়ে বাংলা অঞ্চলে এসেছেন। তাঁদের বর্ণনায় ওঠে এসেছে সমকালীন বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের নানান খণ্ড-চিত্র। বিশেষ করে ষুয়ান জাং-এর বিবরণ থেকে আমরা বাংলা অঞ্চলে হারিয়ে যাওয়া বৌদ্ধ সংস্কৃতির নানান শাখা-প্রশাখার নানান রূপ খুঁজে পেয়েছি। সপ্তম শতকের এই পর্যটক বাংলার প্রায় সব কয়টি উপ-অঞ্চল ভ্রমণ করেছিলেন এবং প্রতিটি স্থানের সমাজ-সংস্কৃতি, মানুষ, ধর্ম এমনকী কৃষিকাজের বিস্তারিত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। নানান সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ষুয়ান জাং-এর বিবরণ তাই ইতিহাসের মূল্যবান উৎস।

আরবদের বর্ণনা

একইভাবে আরবভূখণ্ড থেকে আসা নাবিক ও বণিকদের বর্ণনায় আমরা নবম শতকের পর হতে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত সময়ের নানান তথ্য পাই। আরবদের বর্ণনায় বাংলার বাণিজ্যিক তথ্য বেশি পাওয়া যায়। মূলতঃ অষ্টম সাধারণ অব্দ থেকে আরবভূখণ্ডের বণিকেরা সমুদ্র-বাণিজ্যের ওপর একক কর্তৃত্ব আরওপ করেন। আরব সাগর, ভারত মহাসাগর এবং বঙ্গোপসাগর হয়ে দক্ষিণ চীন সাগর পর্যন্ত আরবেরা বাণিজ্য পরিচালনা করতেন। আরব বণিকদের লেখনীতে বাংলা অঞ্চলের পূর্বাংশে সমুদ্র বন্দরকেন্দ্রিক ব্যবসা-বাণিজ্য এবং সামাজিক জীবনের কিছু কিছু বর্ণনা পাওয়া যায়। এই সমুদ্রবন্দরনবম শতকের দিকে যাত্রা শুরু করেছিল। বর্তমান চট্টগ্রাম বন্দরের আশেপাশে কোথাও এর অবস্থান ছিল। যাহোক, আরব নাবিক ও বণিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন সুলায়মান, ইবনে খুরদাদবিহ্, আল মাসুদি প্রমুখ। তাঁদের বর্ণনায় বাংলার সূক্ষ্ম সুতি বস্ত্র এবং সুগন্ধী কাঠ সহ অন্যান্য অনেক পণ্যের তথ্য পাওয়া যায়।

উপরে তিন ধরনের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত সম্পর্কে তোমরা কিছুটা ধারণা পেয়েছ। এই ভ্রমণ-বৃত্তান্ত থেকে তথ্য গ্রহণ করার ক্ষেত্রেও যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। ভ্রমণ-বৃত্তান্ত থেকে কেবল তথ্য নিলেই চলবে না, উপযুক্ত পদ্ধতিতে যাচাই-বাছাই করে, পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং সমালোচনামূলক ব্যাখ্যা-বিশেষণ শেষে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা পর্যটকগণ কিছু নির্দিষ্ট জায়গায় কিছু সময়ের জন্য বসবাস করতেন। তাই তাঁদের দৃষ্টিতে যতটুকু ধরা পড়েছে তারা ততটুকু ই লিখেছেন।

ফলে লেখায় একপেশে তথ্য থাকতে পারে। আবার অন্য অঞ্চল থেকে আসা পর্যটকগণ অনেক ক্ষেত্রে শাসকদের আপ্যায়ন গ্রহণ করতেন। ফলে, তাঁদের বর্ণিত তথ্যে অনেক সময় সমাজের সাধারণ মানুষের বিবরণ অনুপস্থিত থাকত। এ বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ রেখে ভ্রমণ বৃত্তান্তগুলো থেকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের তথ্য গ্রহণ করা যেতে পারে। পর্যটকদের প্রায় সবাই প্রাচীনকাল থেকে বাংলায় উৎপাদিত তুলা দিয়ে মসৃণ সুতিবস্ত্র তৈরি করা হতো বলে লিখে গেছেন। এগুলো সারাবিশ্বে সমাদৃত ছিল। মধ্যযুগেও বাংলা অঞ্চলের এই বস্ত্র ছিল অবিস্মরণীয় যা কীনা মসলিন নামে বিপুল খ্যাতি অর্জন করেছিল।

ইবনে বতুতা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তাঁর মতে, বাংলায় যত সস্তায় জিনিসপত্র কীনতে পাওয়া যেত, তা পৃথিবীর অন্য কোথাও পাওয়া যেত না। কিন্তু সস্তায় জিনিসপত্র কেনার মতো সামর্থ্য কতজনের ছিল তা অবশ্য কোনো পর্যটকের লেখায় পাওয়া যায় না। বাংলা অঞ্চলে লেনদেনের জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মুদ্রা প্রচলিত ছিল। মধ্যযুগে সোনা, রুপা এবং তামার পয়সার প্রচলন ছিল। তামার পয়সাকে বলা হতো জিতল। তবে সাধারণ মানুষ কড়ির মাধ্যমে বিনিময় করত। সমাজে শ্রেণিবৈষম্য প্রকট ছিল।

তাহলে পর্যটক কারা?

সহজ করে আরও একবার বলি- পর্যটক হলেন তাঁরাই যাঁরা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ, ভাষা-সংস্কৃতি, ইতিহাস, জীবন-যাপন, নানান বিশ্বাস ও প্রথা-পদ্ধতি, শিক্ষা ইত্যাদি জানার জন্য পৃথিবীর এক স্থান বা অঞ্চল থেকে আরেক স্থান বা অঞ্চলে ঘুরে বেড়ন। বেড়তে বেড়তে তারা বিভিন্ন জায়গার সমাজ-সংস্কৃতি দেখেন, অধ্যয়ন করেন, পরের প্রজন্মকে জানানোর জন্য তা আবার কখনো কখনো লিখেও রাখেন। চাইলে আমরাও কিন্তু পর্যটক হতে পারি!

আমরা পর্যটক সম্পর্কে জানলাম যাদের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন দেশ ও স্থানের তথ্য জানতে পারি। কিন্তু আমরা হয়তো একটু অবাক হয়ে যেতে পারি এই তথ্যও মানুষের মুখে মুখে পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে। কি বিশ্বাস হচ্ছে না? চলো একটা খেলার মাধ্যমে এটি অনুধাবনের চেষ্টা করি।

তথ্য পরিবর্তন হওয়ার খেলা

আমরা ১০-১৫ জন মিলে একটি লাইন তৈরি করি। শিক্ষক লাইনে দাঁড়ানো প্রথমজনের কানে একটি গল্প খুব আস্তে বলবেন যেনো কেউ না শুনতে পারে। এভাবে প্রথমজন গল্পটি দ্বিতীয় জনের কানে বলবে। লাইনে শেষে যে থাকবে সে যে গল্পটি শুনতে পেলো তা জোরে বলবে। সর্বশেষ জনের বলা গল্পটি শিক্ষক বোর্ডে লিখবেন। এরপর শিক্ষক মূল গল্পটি বলবেন। আমরা বোর্ডে লেখা গল্পটির সঙ্গে মূল গল্পটি মিলিয়ে দেখব। গল্পটির কী কী পরিবর্তন হয়েছে তা নির্ধারণ করব।

এভাবে এই খেলার মধ্য দিয়ে আমরা ঐতিহাসিক তথ্য যে বিভিন্ন উৎসের মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে তা উপলব্ধি করতে পারলাম।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় একই ঐতিহাসিক ঘটনার ভিন্ন ভিন্ন বয়ান

ঐতিহাসিক ঘটনাকে বিভিন্ন লেখক, গবেষক বা ইতিহাসবিদ বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় বিভিন্নভাবে বয়ান করে থাকেন। উদাহরণ হিসেবে বৃটিশ শাসন সম্পর্কে নিচে কয়েকজন লেখক ও ইতিহাসবিদের লেখা তুলে ধরা হলো। এখানে দুই ধরনের বয়ান আছে। আমরা এই বয়ানগুলোর সাদৃশ্য ও ভিন্নতা শনাক্ত করব।

বৃটিশ শাসন সম্পর্কে কয়েকজনের মতামত

০১ ভারতে ইংরেজ শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে ১৮৩৫ সালে লর্ড ম্যাকলের বক্তব্য

"আমাদেরকে এমন একটি শ্রেণি গড়ে তোলার চেষ্টা করতে হবে যারা আমাদের এবং আমাদের শাসনাধীন লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে দোভাষী হতে পারে- তারা হবে রক্তে-বর্ণে ভারতীয় কিন্তু রুচি, মতামত, নৈতিকতা ও বুদ্ধিবৃত্তিতে ইংরেজ।" (সংগৃহিত, শশী থারুর, দ্য গার্ডিয়ান-অনুবাদ)

০২ ১৮২৯ সালে বাংলার গর্ভনর জেনারেল লর্ড বেনটিংক, ভারতবর্ষে সতীদাহ প্রথা বন্ধের আইন জারি করেন

তার এই বলিষ্ঠ পদক্ষেপের জন্য রাজা রামমোহন রায়ের নেতৃত্বে ৩০০ সুপরিচিত হিন্দু সমাজ সংস্কারক লর্ড বেন্টিংককে ধন্যবাদ দেন। তিনি বলেন, 'সজ্ঞানে নারী হত্যা করার যে দুর্নাম আমাদের চরিত্রের সাথে জুড়ে গিয়েছিল তা থেকে চিরতরে আমাদের মুক্তির জন্য ধন্যবাদ।'
(সংগৃহিত সৌতিক বিশ্বাস, বিবিসি)

০৩

একটি বৃটিশ সাপ্তাহিকে ২রা ডিসেম্বর ১৯১১ সালে প্রকাশিত আর্টিকেল

আমরা (ব্রিটিশরা) ভারতকে কেবল অভ্যন্তরীণ শান্তি এবং জীবনযাপন ও সম্পত্তির নিরাপত্তাই দেইনি, দেশের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলিকে গভীরভাবে পরিবর্তন করেছি।' (সংগৃহিত, সম্পাদক, THE ECONOMIC TIMES)

০৪

বৃটিশ অর্থনীতিবিদ আঙ্গুস ম্যাডিসন বলেন

আঠার শতকের শুরুতে পৃথিবীর অর্থনীতির ২৩ শতাংশ ছিল ভারতবর্ষের যা ছিল সম্পূর্ণ ইউরোপের সমান। বৃটিশরা যখন ভারত ছেড়ে যায় তখন তা কমে হয় ৩ শতাংশের একটু বেশি। (সংগৃহিত, শশী থারুর, An Era of Darkness)

দলগত কাজ ২:

আমরা পূর্বে গঠিত দলে বসি। উপরের লেখাগুলো পড়ে আমরা দলগতভাবে আলোচনা করে বৃটিশ শাসন সম্পর্কে বিভিন্ন লেখক ও ইতিহাসবিদদের ধারণা কী তা নির্ণয় করব?

আমরা প্রয়োজনে অন্য পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত প্রতিবেদন, বই, পত্রিকা, আর্টিকেল ইত্যাদি থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে পারি।

আমরা তথ্য খুঁজি:

১. বৃটিশদের দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ

২. ভারতীয়দের দৃষ্টিতে ইংরেজ

আমরা দলে আলোচনা করে এই দুই ধরনের প্রেক্ষাপটে প্রাপ্ত মতামতের ভিন্নতা যাচাই করব।

ক. মতামতের ভিন্নতা হবার কারণ।

খ. লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপর মতামতের প্রভাব।

দলগত কাজ ৩:

আমরা দলগতভাবে ২ জন ব্যক্তি নির্ধারণ করব। এই দুইজন ব্যক্তির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট ভিন্ন হবে। যেমন দুজন ভিন্ন পেশার মানুষ বা দুজন ভিন্ন অঞ্চলে বেড়ে ওঠা মানুষ। আমরা পাঠ্যপুস্তক বা অন্য কোনো উৎস থেকে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা বাছাই করব। ঐ ২ জন ব্যক্তির কাছে এই ঘটনা সম্পর্কে শুনে তাঁদের মতামত লিখে আনব। দুজন ব্যক্তির মতামতের ভিন্নতা এবং এই ভিন্নতার সম্ভাব্য কারণগুলো শনাক্ত করব। এরপর নিচের বিষয় নিয়ে দলগতভাবে আলোচনা করব।

- দুজন ব্যক্তির মতামতের ভিন্নতায় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রভাব।
- ব্যক্তির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের প্রভাব।

তারপর আমরা একটি ‘মতামতের ভিন্নতা’ নামক সেমিনারের আয়োজন করব। যেখানে আমরা দলগত আলোচনার বিষয়বস্তু থেকে প্রাপ্ত তথ্য বা ফলাফল উপস্থাপন করব।

বাংলা অঞ্চলে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বৈচিত্র্যময় গতিপথ

আত্মপরিচয় অনুসন্ধান প্রত্যেকটি মানুষের কাছেই আনন্দের। মানুষ নিজেকে জানতে চায়। আর নিজেকে জানতে হলে নিজের অতীত অনুসন্ধান করতে হয়।

কে আমি? আমার পূর্বপুরুষ কারা? কী ছিল তাঁদের পেশা? কেমন ছিল তাঁদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন ধারা? কোথা থেকে এসেছিলেন তারা? এমন হাজারটা প্রশ্ন করে মানুষ আত্মানুসন্ধান করতে চায়, শিকড়খুঁজে বের করতে চায়। শিকড় খুঁজে পাওয়ার মধ্য দিয়ে মানুষ তাঁর পূর্বপুরুষের দক্ষতা, যোগ্যতা এবং দুর্বলতাগুলো জানতে পারে। এই জ্ঞান মানুষের বর্তমানকে কার্যকরভাবে চালিত করতে সাহায্য করে। সুসংহত এবং দূরদর্শী করে। আর নিজের যেকোনো পদক্ষেপ যৌক্তিকভাবে গ্রহণ করতে সহায়তা করে।

সমাজ ও সংস্কৃতি রচিত হয় মানুষের হাত ধরে। মানুষকে উপজীব্য করে। কোনো একটি অঞ্চলের সমাজ ও সংস্কৃতির গঠন এবং রূপান্তরের ইতিহাস জানতে হলে প্রথমেই সে অঞ্চলের মানুষ সম্পর্কে ধারণা নেওয়া প্রয়োজন। বিভিন্ন প্রত্ননিদর্শন এবং প্রাচীন মানুষের প্রাপ্ত দেহাবশেষ থেকে শুরু করে নানান প্রকারের উৎসের ভিত্তিতে আমরা শুরুতেই আঞ্চলিক বাংলা ভূখণ্ডে বিভিন্ন সময়ে আগত মানুষ ও বিভিন্ন জনধারা সম্পর্কে জ্ঞান লাভের চেষ্টা করব। এরপর আমরা অনুসন্ধান করে দেখব, কীভাবে সেই মানুষেরা শিকার ও সংগ্রহভিত্তিক যাযাবর জীবন থেকে ধীরে ধীরে স্থায়ী বসতির দিকে অগ্রসর হয়েছে। নগর ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে। বিভিন্ন ধরনের রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান, প্রথা-পদ্ধতি, খাদ্য, পরিধেয় বস্ত্র, ব্যবহৃত দৈনন্দিন উপকরণ, উৎসব, চিত্তবিনোদন প্রভৃতি উপাদানের সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে বৈচিত্র্য ও বহুত্বে ভরা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন।

বাংলা অঞ্চল এবং বাংলাদেশে মানুষের বসবাস শুরু হয়েছিল সুদূর প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই। আঞ্চলিক বাংলার বিভিন্ন স্থানে খননকাজ চালিয়ে প্রাচীন মানুষের যেসব বসতিকেন্দ্র খুঁজে পাওয়া গিয়েছে তার মধ্যে পাণ্ডুরাজার ঢিবি, চন্দ্রকেতুগড়, মহাস্থানগড়, ময়নামতি, তাম্রলিপ্তি, উয়ারী-বটেশ্বর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রত্নস্থানগুলোর মধ্যে, বাংলার পশ্চিম অংশে অবস্থিত পাণ্ডু রাজার ঢিবি একটি তাম্র-প্রস্তর যুগের সভ্যতা। তাম্রলিপ্তি বাংলার প্রাচীনতম সমুদ্র বন্দর নগরী। মহাস্থানগড় বাংলার উত্তরাংশের প্রাচীনতম নগরকেন্দ্র। বাংলা অঞ্চলের পূর্বাংশে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ছিল ময়নামতি।

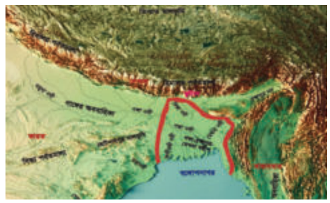

লাল কালি দিয়ে চিহ্নিত অংশটি প্রাকৃতিক সীমানা বেষ্টিত বাংলা অঞ্চলের আনুমানিক সীমানা।

আঞ্চলিক বাংলায় মানুষের প্রাথমিক বসতি ও পরিচয়

যুগে যুগে নানান ধারার মানুষ পৃথিবীর নানান অংশ থেকে বাংলা অঞ্চলে এসে বসতি স্থাপন করেছে। বাংলা অঞ্চলের নানান রকমের প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা মোকাবিলা করে নিজেদের অস্তিত্ব টিকীয়ে রেখেছে। আবার প্রকৃতির অফুরন্ত নিয়ামক গ্রহণ করেই সমাজ ও সভ্যতা নির্মাণের পথ রচনা করেছে। চলো, বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ মমতাজুর রহমান তরফদার এবং সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের গবেষণার আলোকে এই মানুষের দৈহিক গড়ন এবং ভাষাভিত্তিক আদি পরিচয় সংক্ষেপে জেনে নিই।

দৈহিক গড়নভিত্তিক জনগোষ্ঠী

পাণ্ডুরাজার ঢিবির কথা বিভিন্ন প্রসঙ্গে তোমরা জেনেছ। বাংলা অঞ্চলের পশ্চিমাংশে প্রাচীনতম সুসংগঠিত মানববসতি পাণ্ডুরাজার ঢিবি। আদি মানুষের কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছে পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে। এই কঙ্কাল আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগের। নৃ-বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত জ্ঞান অনুযায়ী, বাংলা অঞ্চলের আদিতম দৈহিক গড়নের মানুষ ছিল প্রোটো-অস্ট্রোলয়েড। এরাই খুব সম্ভবত বাংলার আঞ্চলিক ভূখণ্ডে প্রাকৃতিক প্রতিকূলতাকে জয় করে প্রথম বসতি স্থাপন করেছিল। সব মানুষের জীবন ছিল শিকার ও চাষকেন্দ্রিক। প্রোটো-অস্ট্রোলয়েড দেহ গড়নের মানুষেরা যে ভাষায় কথা বলত তার ভিত্তিতে তাঁদেরকে অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ বলা হয়। এই অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীরও ছিল অসংখ্য ধারা ও উপধারা। প্রাচীন সংস্কৃত

সাহিত্যে যাদেরকে নিষাদ বলা হয়েছে এবং বর্তমানকালে আমরা যাদের সাঁওতাল, কোল, ভীল নামে চিনে থাকি, তারা সবাই অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ।

দৈহিক গড়নের ভিত্তিতে আরও যেসব জনধারা বাংলায় এসে বসতি স্থাপন করেছে তার মধ্যে নিগ্রোয়েড এবং মঙ্গোলয়েড অন্যতম। নিগ্রোয়েড এবং মঙ্গোলয়েডদের মধ্যেও রয়েছে অনেক ধারা ও উপধারা। বাংলায় গারো নামে যে আদিবাসী জনগোষ্ঠী রয়েছে, তারা মূলত মঙ্গোলয়েড জনধারারই ক্ষুদ্র একটা অংশ বা উত্তরাধিকার। হাজার বছর ধরে বাংলা অঞ্চলে বসবাস করার ফলে এই সকল মানুষের প্রায় সবাই মিলেমিশে নতুন যে জনধারা সৃষ্টি করেছে, তা বর্তমানে বাঙালি নামে পরিচিত।

ভাষাভিত্তিক জনগোষ্ঠী

অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর অল্প কিছু আগে বা পরে বাংলা অঞ্চলে যাদের আগমন ঘটে, তারা হচ্ছে দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ। এই ভাষাগোষ্ঠীর মানুষের উৎপত্তি কোথায় তা নিশ্চিত করে জানা যায় না। ভাষাতাত্ত্বিক গবেষকগণের অনেকেই বলে থাকেন যে, দ্রাবিড় ভাষীরাই ভারতীয় উপমহাদেশের আদিম বাসিন্দা। কেউ কেউ আবার এদের ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল থেকে আগত বলেও মত দিয়ে থাকেন। তবে এদের উৎপত্তি যেখানেই হোক, সাম্প্রতিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর মানুষের হাতেই ভারতবর্ষের প্রাচীন নগর সভ্যতার জন্ম হয়েছিল। ভারতবর্ষের সর্বপ্রাচীন নগর সভ্যতার নাম হচ্ছে হরপ্পা সভ্যতা। চীনা-তিব্বতি ভাষাগোষ্ঠীর বিভিন্ন শাখা-উপশাখায় কথা বলা মানুষের অস্তিত্বও পাওয়া গিয়েছে বাংলার আঞ্চলিকভূখণ্ডে। আজ থেকে আনুমানিক আড়াই হাজার বছর আগে আর্য ভাষাগোষ্ঠীর মানুষেরা বাংলায় প্রবেশ করতে শুরু করেছিল বলে গবেষকগণ দাবি করেন।

দৈহিক গড়ন ও ভাষার ভিত্তিতে আদিকালে বাংলা অঞ্চলে আগত ও বসতি স্থাপনকারী মানুষের পরিচয় আমরা সংক্ষেপে জেনে নিয়েছি। দূরবর্তী ভূখণ্ড হতে আগমন ও বসতি স্থাপনের এই ধারা যে শুধু প্রাচীন যুগেই চলমান ছিল তা কিন্তু নয়। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আর্য সহ উপরের উল্লিখিত বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর বিভিন্ন ধারা ও উপধারার মানুষ নানান পরিচয় (যেমন: মৌর্য, কুষাণ, হূণ, গুপ্ত, আরব, যবন, তুর্কী, আফগান, পারসিক, তাজিক, মুঘল, ওলন্দাজ, ইংরেজ, ডেনিশ, রাজপুত প্রভৃতি) ধারণ করে বাংলার আঞ্চলিক ভূখণ্ডে প্রবেশ করেছে। স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেছে। নিজেদের ধর্ম-সংস্কৃতির প্রচার ঘটিয়েছে। অপেক্ষাকৃত আগে বসতি স্থাপনকারী জনধারার সঙ্গে মিশে গিয়ে বহুমাত্রিক এবং বৈচিত্র্যময় সমাজ-সংস্কৃতির বিকাশ ঘটিয়েছে।

অনুশীলনী

হাজার বছরের পথ পরিক্রমায় নানান ধারার মানুষের মিলন ও মিশ্রণের মাধ্যমে বাংলা অঞ্চলের মানুষের আত্মপরিচয় গড়ে উঠেছে নানান ধারার মানুষের মিলন ও মিশ্রণের মধ্য দিয়ে আমরা হয়ে ওঠেছি একই সঙ্গে অনন্য ও বৈচিত্র্যময়। চলো, এই অনন্যতা ও বৈচিত্র্য অনুধাবনের অংশ হিসেবে বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠী ও দেহগড়নের মানুষের নাম চিহ্নিত করে একটি প্রতিবেদন লিখি।

বাংলা অঞ্চলে সমাজ ও সংস্কৃতির গঠন ও অবিরাম বদলের ইতিহাস

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। মানুষের বেঁচে থাকা এবং নিরাপত্তার প্রয়োজনে ইতিহাসের উষালগ্নেই সমাজ ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটেছিল। প্রত্যেকটি সমাজে মানুষ নির্দিষ্ট কিছু নিয়মকানুন এবং আচার-অনুষ্ঠান মেনে চলে। অন্যদিকে, মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সকল কর্মকাণ্ডই সংস্কৃতির অংশ। হাজার বছরে গড়ে ওঠা রীতি-নীতি, প্রথা-পদ্ধতি,

আচার-অনুষ্ঠান, ধর্ম-সংস্কৃতি, লোকাচার, বিশ্বাস, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-সংগীত, নন্দন-শিল্প, জামা-কাপড়, খাদ্যাভ্যাস, স্থাপত্য-ভাস্কর্য, সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও মানুষের অর্জিত অভিজ্ঞতার সবকিছুই সংস্কৃতি। সমাজ ও সংস্কৃতি কোনো একরৈখিক প্রতিষ্ঠান নয়। স্থান এবং কালভেদে সমাজ ও সংস্কৃতি গঠনে পার্থক্য তৈরি হয়। আবার কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানের মধ্যেই একটি বৃহত্তর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোর মধ্যে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ধারার মানুষ বসবাস করে। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে এখন অবধি আমরা যদি বাংলা অঞ্চলের মানুষের সমাজ ও সংস্কৃতির গঠন এবং রূপান্তরের অভিজ্ঞতার দিকে তাকাই, অবাক বিস্ময়ে আবিষ্কার করব, রাজনৈতিক এবং ধর্ম-সাংস্কৃতিক পরিবর্তন আর বিবর্তনের পাশাপাশি সামাজিক কাঠামো এবং সাংস্কৃতিক উপাদানেও এসেছে বড়ো পরিবর্তন। আগে থেকে বিদ্যমান একটি সমাজ কাঠামো এবং সাংস্কৃতিক উপাদানের মধ্যে নতুন নতুন উপাদান যুক্ত করেছেন। নতুন এবং পুরাতনের মধ্যে সংঘাত ও সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে সমাজ ও সংস্কৃতি পরিবর্তিত ও বিবর্তিত হয়েছে। সমাজ ও সংস্কৃতির এই নিরন্তর ভাঙা-গড়া, গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়েই মানুষ বৈচিত্র্যে, বহুত্বে আর বহুমাত্রিকতার অভিজ্ঞতায় নিজেদেরকে সমৃদ্ধ করেছেন।

সমাজ-সংস্কৃতি গঠনের আদি পর্ব: কৃষি আবিষ্কার থেকে নগর বিপ্লবের কথা

(প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে ৫০০ সাধারণ পূর্বাব্দ)

আদিকালে মানুষ যখন চাষাবাদ জানত না, স্থায়ী বসতি ছিল না, তখনো তারা দলবদ্ধ হয়েই শিকার এবং সংগ্রহের কাজ করত। আদিম সেই সমাজকে বলা হয় গোত্রভিত্তিক সমাজ। বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার লালমাই, হবিগঞ্জ জেলার চাকলাপুঞ্জি চা-বাগান, চট্টগ্রামের সীতাকুন্ড, নরসিংদী জেলার উয়ারী-বটেশ্বর, ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া, বর্ধমান, বীরভূম, পুরুলিয়া ও মেদিনীপুর জেলা, আসাম ও ত্রিপুরা রাজ্যের বেশ কিছু স্থানে প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষের ব্যবহৃত হাতিয়ার পাওয়া গেছে। এর কোনো কোনোটির বয়স আনুমানিক দশ হাজার বছর। এসব প্রত্নিদর্শন থেকে বাংলা অঞ্চলের শিকার ও সংগ্রহভিত্তিক সমাজের মানুষের বিচরণের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

নারী শিকারির হরিণ শিকারের কাল্পনিক দৃশ্য। আবিষ্কৃত প্রমাণের ভিত্তিতে আঁকা হয়েছে।

মানুষের সমাজ কাঠামোতে সবচেয়ে বড়ো পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন আসে কৃষির আবিষ্কারের ফলে। আদি যুগে মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেই গোত্রগুলো ভেঙে যেত এবং পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে যেত। কিন্তু কৃষির আবিষ্কারের ফলে এই ভাঙন থেকে তারা মুক্তি পায় এবং কোনো একটি স্থানে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করে চাষের মাধ্যমে নিজেদের খাদ্য উৎপাদন করে জীবন ধারণে সক্ষমতা অর্জন করে। কৃষির আবিষ্কার মানুষকে খাদ্যের সংকট থেকে মুক্তি দেয়। স্থায়ী ঘরবাড়ি নির্মাণের সুযোগ তৈরি করে দেয়। গোত্রভিত্তিক জীবন ধারার পরিবর্তে গ্রাম বা নগরভিত্তিক স্থায়ী জীবন ধারার সূত্রপাত ঘটায়। মহাস্থানগড় এবং পাণ্ডুরাজার ঢিবি প্রভৃতি প্রত্নস্থলে খননকাজ পরিচালনা করে দেখা গেছে, এই স্থানগুলোতে নগর প্রতিষ্ঠার আগে কৃষিকে কেন্দ্র করে গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক বসতির সূচনা হয়েছিল। চাষাবাদের পাশাপাশি তারা শিকার এবং মাছ ধরার কাজেও দক্ষ ছিল। কৃষিভিত্তিক সমাজ থেকেই ধীরে ধীরে পাণ্ডুরাজার ঢিবি, মহাস্থানগড়, উয়ারী-বটেশ্বর প্রভৃতি নগর সমাজের উদ্ভব হয়।

বাংলা অঞ্চলের কৃষিনির্ভর এলাকাগুলোতে বা গ্রামে প্রাচীনকাল থেকেই ফসল কাটার দিনটি ছিল সবচেয়ে আনন্দের দিন। চন্দ্রকেতুগড়ে একটি পোড়ামাটির ফলকে দেখা যায়, অর্ধচন্দ্রাকৃতির কাস্তে হাতে নিয়ে কয়েকজন কৃষক কৃষি কাজ করছেন। অপর একটি ফলকে ধরা দিয়েছে প্রাচীন আশ্চর্য সুন্দর একটি ফসল কাটার উৎসবের দিন। ফসল হাতে নিয়ে বাদ্যবাজনা সহযোগে নৃত্যরত মানুষের এই চিত্র প্রথম/দ্বিতীয় শতকে অঙ্কীত হলেও তার মধ্যেই বাংলার কৃষকদের জীবনের একটি শাশ্বত রূপ ধরা পড়েছে। কৃষিকে কেন্দ্র করেই বাংলা অঞ্চলের মানুষের জীবনে স্থায়ী বসতির সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল। বাংলা অঞ্চলের মানুষের সাংস্কৃতিক জীবন গঠনে এই কৃষির সম্পর্ক অতি প্রাচীন এবং অবিচ্ছেদ্য।

কয়েকজন পুরুষ একটি শিকার করা পশু নিয়ে বাড়িতে প্রবেশ করছে। আঙিনায় কয়েকজন নারী শস্য চাষ করছে। আদি যুগের কৃষি ও শিকার জীবনের দৃশ্য কল্পনা করে আঁকা ছবি।

মানুষের জীবন ও সংস্কৃতির সঙ্গে ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠানের সম্পর্ক অতি প্রাচীন। বাংলা অঞ্চলে বসতি স্থাপনকারী মানুষের মধ্যে ইতিহাসের আদিকালেই লোকজ ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা গড়ে উঠেছিল।

অনুশীলনী

আদি যুগে বাংলা অঞ্চলের মানুষের পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনের প্রেক্ষাপট এবং প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা জানলাম। উপরের পাঠ থেকে চলো নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে বের করি-

- আদি যুগে মানুষের পারিবারিক কাঠামো কেমন ছিল?
- সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের প্রধান উৎসবগুলো কেমন ছিল?

আর্য ভাষাগোষ্ঠীর মানুষের আগমন, নতুন বসতি, সমাজ-সংস্কৃতির অবিরাম বদল (৫০০ সাধারণ পূর্বাব্দ থেকে ৬০০ সাল বা সাধারণ অব্দ পর্যন্ত)

আর্য ভাষার মানুষেরা আনুমানিক ৫০০ সাধারণ পূর্বাব্দ থেকে বাংলা অঞ্চলে প্রবেশ করতে শুরু করেছিল বলে তথ্য পাওয়া যায়। বেদ সাহিত্যে এবং মহাভারত ও রামায়ণে বাংলার প্রাচীন জনপদগুলোর উল্লেখ পাওয়া যায়। মৌর্য ও গুপ্ত সম্রাটগণ তৎকালীন ভারতবর্ষের সর্বত্র তাঁদের রাজ্য বিস্তার প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে বঙ্গ-পুণ্ড্র-রাঢ়-সমতট এলাকায় একের পর এক অভিযান পরিচালনা করেন।

গুপ্ত যুগের সোনার মুদ্রার নমুনা

গুপ্ত সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের ঘোড়ায় চড়া প্রতিকৃতি খোদিত সোনার মুদ্রা

গুপ্ত সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের প্রতিকৃতি অঙ্কীত সোনার মুদ্রা

গুপ্ত যুগের মন্দির

এই দেয়াল ঘেরা স্থানটি একটি নগরী ছিল। সেই নগরের কাল্পনিক চিত্র এটি। প্রাচীনকালে এর নাম ছিল পুন্ড্রনগর। এই চিত্রে ওই দুর্গে প্রবেশ করার দরজাগুলো, নগরের মধ্যে জলাধারসহ চারদিকে পরিখা ও ডান দিকে করতয়া নদী প্রবাহিত ছিল। করতয়ার তীরেই মহাস্থানে এই নগর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বর্তমানে এই রাজধানী নগরটি স্বাধীন বাংলাদেশের বগুড়া জেলায় পড়েছে। এই নগরে প্রথম মানব বসতি স্থাপিত হয় মৌর্য শাসকদের শাসনকাল শুরু হবারও আগে। পনেরো শতকেও এই নগরে জনবসতি অব্যাহত ছিল। বিভিন্ন সময়ে নগরটির বৈশিষ্ট্য এবং বসতির ধরন পরিবর্তিত হয়েছে। হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে এখানে জনবসতি ছিল। এরপর বহিঃশক্তির আক্রমণ বা প্রাকৃতিক কোনো দুর্যোগের কারণে নগরটি পরিত্যক্ত হয়। ধীরে ধীরে মাটির নিচে চাপা পড়ে যায়। আধুনিককালে প্রত্নতত্ত্ববিদগণ স্থানটিতে খননকাজ পরিচালনা করে মাটির নিচ থেকে সম্পূর্ণ নগরটির ধ্বংসাবশেষ পুনরুদ্ধার করেন। খননের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিভিন্ন নিদর্শন বিশ্লেষণ করে থাকেন ইতিহাসবিদগণ। ইতিহাস গবেষণার প্রথা-পদ্ধতি ও কলা-কৌশল মেনে, প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের বিচার-বিশ্লেষণ করে এবং বিজ্ঞানসম্মত অনুসন্ধান চালিয়ে একজন ইতিহাসবিদ বিভিন্ন সময়ের মানুষদের জীবন ও সংস্কৃতি সম্পর্কে ইতিহাস রচনা করে থাকেন।

পাহাড়পুরে প্রাপ্ত পোড়ামাটির ফলকে খোদাই করা একজন যোদ্ধার ছবি। সাম্রাজ্যবাদী রাজ্যের রাজাগণ নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখতেন এই যোদ্ধাদের পেশিশক্তি ব্যবহার করে। যোদ্ধারা বাস করতেন নগরের ভেতরে।

আঞ্চলিক পরিচয় গঠন, সমাজ-সংস্কৃতির অবিরাম বদল, বৈচিত্র্য ও বহুত্ব (৬০০ থেকে ১৩০০ সাল বা সাধারণ অব্দ পর্যন্ত)

ষষ্ঠ শতকের পর বাংলা অঞ্চলে বঙ্গ নামে একটি স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব ঘটে বলে বিভিন্ন উৎস থেকে জানা যায়। এই রাজ্যের রাজধানী ছিল বর্তমান বাংলাদেশের গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়ায়। ৫ জন স্বাধীন রাজা ষষ্ট/সপ্তম শতকে ধারাবাহিকভাবে এখানে রাজত্ব করেছেন। তারা হলেন গোপচন্দ্র, সমাচারদেব, ধর্মাদিত্য, দ্বাদশাদিত্য ও সুধান্যাদিত্য। বঙ্গের কিছু পরে গৌড় নামে আরও একটি রাজ্য গড়ে উঠেছিল। এই রাজ্যের স্বাধীন একজন রাজা ছিলেন শশাঙ্ক। রাজবংশের অধীনে বাংলা অঞ্চলে ধীরে ধীরে সমাজ-সংস্কৃতির কাঠামো মজবুত হয়। নগরকেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক কাঠামো স্পষ্ট হতে থাকে। সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও বহুত্ব নিয়েই গড়ে ওঠে সামাজিক বুনিয়াদ। বাংলা অঞ্চলের প্রাচীন ধর্মীয় স্থাপনার মধ্যে স্তুপ, বিহার, মন্দির উল্লেখযোগ্য। বাংলায় প্রথম মন্দিরের উল্লেখ পাওয়া যায় চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত দ্বিতীয় শতকের একটি পোড়ামাটির ফলকে। মন্দির স্থাপত্যের আদিমতম রূপ উৎকীর্ণ হয়েছে ফলকটিতে। ষষ্ঠ শতক থেকে বাংলা অঞ্চলে বিভিন্ন রকমের মন্দির নির্মিত হতে শুরু করে। নবম থেকে এগারো শতকে পাল ও সেন রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা অঞ্চলে অসংখ্য মন্দির এবং মন্দির সংশ্লিষ্ট ভাস্কর্য নির্মিত হয়েছিল।

বৌদ্ধশিক্ষা ও ধর্মচর্চার কেন্দ্র ছিল বিহার। এখানে সন্ন্যাসী ও শিক্ষার্থীরা ধর্মীয় বিষয়ের পাশাপাশি দর্শন, যোগশাস্ত্র, যুক্তিবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, ব্যাকরণ, ধ্বনিতত্ত্ব, চিকীৎসাবিদ্যা, চিত্রকলা, সংগীত ও সাহিত্য বিষয়ে পড়াশোনা করতেন। বাংলা অঞ্চলে নির্মিত বিহারগুলোর মধ্যে সোমপুর মহাবিহার (বর্তমানে বাংলাদেশের নওগাঁ জেলার পাহাড়পুর), শালবন বিহার (বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার লালমাই-ময়নামতিতে অবস্থিত), রক্তমৃত্তিকা মহাবিহার (বর্তমান ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদে অবস্থিত) ছিল জগৎ বিখ্যাত।

দক্ষিণ এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম বিহারের নাম সোমপুর বা পাহাড়পুর বৌদ্ধ মহাবিহার। বিশাল এই স্থাপনার চারদিকে ছিল ১৭৭টি বসবাসের উপযোগী কক্ষ, যেখানে বসে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা জ্ঞানচর্চা করতেন। বিস্তৃত প্রবেশপথ, অসংখ্য নিবেদন স্তূপ এবং ছোটো ছোটো মন্দির শোভিত বিহারের কেন্দ্রে রয়েছে সুউচ্চ একটি মন্দির। খনন কাজের মাধ্যমে এখানে পাওয়া গিয়েছে অনেক পোড়ামাটির ফলক (টেরাকোটা), প্রস্তর ও ধাতব মূর্তি। এসব ফলকে অঙ্কীত চিত্র থেকে আমরা সে যুগের মানুষের জীবন সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য জানতে পারি। এসব নির্দশন বাংলার স্থাপত্য ও ভার্স্কয শিল্পের ইতিহাসে অত্যন্ত মূল্যবান উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

বর্তমান ভারতের বিহার প্রদেশে অবস্থিত নালন্দা মহাবিহার ও মন্দিরসমূহের ছবি।

বর্তমান ভারতের বিহার প্রদেশে অন্তিচক নামক স্থানে অবস্থিত বিক্রমশীলা মহাবিহারের কেন্দ্রীয় মন্দিরের ছবি।

বর্তমান বাংলাদেশের নওগাঁ জেলায় অবস্থিত সোমপুর মহাবিহারের কেন্দ্রীয় মন্দিরের ছবি। প্রাচীন বাংলা অঞ্চলে অবস্থিত এই বিহার ছিল দক্ষিণ এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাবিহার। বৌদ্ধ ধর্মীয় বিষয়ের পাশাপাশি দর্শন, যোগশাস্ত্র, যুক্তিবিদ্যা, ব্যাকরণ, ধ্বনিতত্ত্ব, চিকীৎসাবিদ্যা, চিত্রকলা, সংগীত ও সাহিত্য চর্চার কেন্দ্র ছিল এই রকম বিহারগুলো।

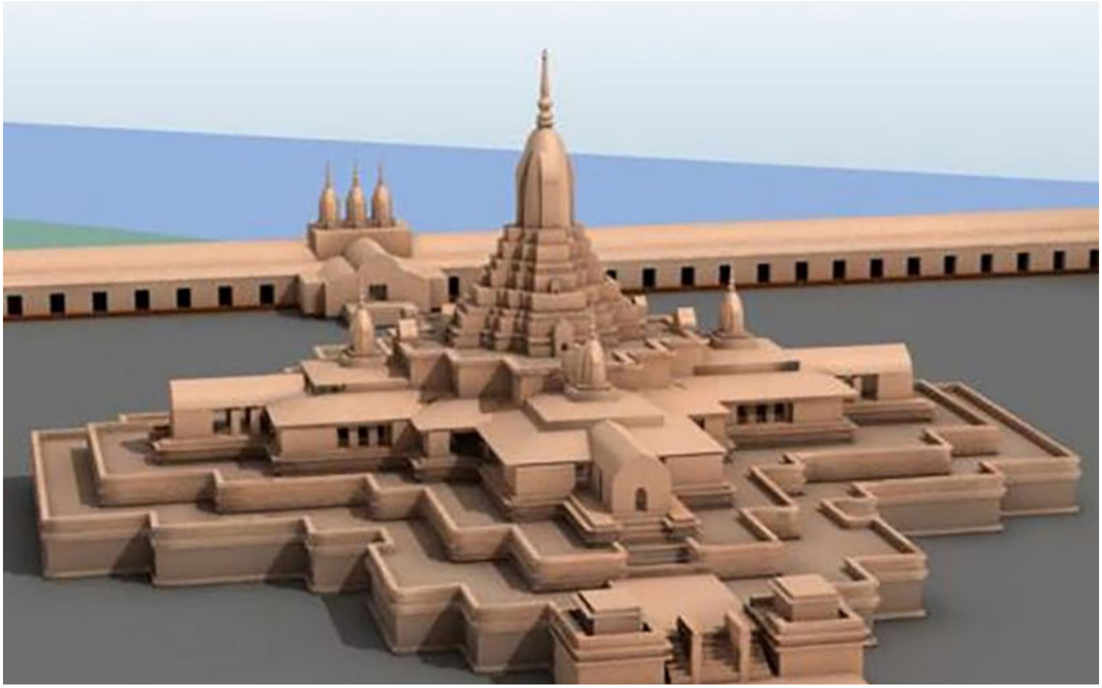

সোমপুর মহাবিহারের কেন্দ্রীয় মন্দির দেখতে এমন ছিল বলে মনে করেন ঐতিহাসিকগণ

শালবন বিহার। বর্তমান বাংলাদেশের পূর্ব দিকে কুমিল্লা জেলায় বিহারটির ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পাওয়া যায়।

লতিকোট বিহার বা লতিকোট মুড়া। বর্তমান বাংলাদেশের পূর্ব দিকে কুমিল্লা জেলায় বিহারটির ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পাওয়া যায়।

একাদশ-দ্বাদশ শতকে সেন রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলায় সংস্কৃত সাহিত্যের বিকাশ ঘটেছিল। পবনদূত, গীতগোবিন্দ, সদুক্তিকর্ণামৃত নামে বেশকিছু গ্রন্থ এ সময় রচিত এবং সংকলিত হয়। এসব গ্রন্থ থেকে সমকালীন বাংলা অঞ্চলের মানুষের জীবন ও সংস্কৃতি সম্পর্কে নানান তথ্য পাওয়া যায়। গ্রন্থগুলোও তাই বাংলা অঞ্চলের ইতিহাসের উৎস হিসেবে পণ্ডিতগণের কাছে বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে।

প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ শাহানারা হোসেন এই সময়ে সংকলিত ‘সুভাষিত রত্নকোষ’ নামে একটি সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠ ও পর্যালোচনা করে বাংলার সাধারণ মানুষের জীবনের সুখ, দুঃখ-দারিদ্র্য ও টিকে থাকার লড়াইয়ের কথা আমাদেরকে জানিয়েছেন। বাংলা অঞ্চলের মানুষের যেকোনো প্রতিকূলতা মোকাবিলা করে টিকে থাকার সক্ষমতা এই শ্লোকগুলোতে প্রতিফলিত হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যের আদি নির্দশন ‘চর্যাপদ’ রচিত হয়েছিল অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে। চর্যাপদের পদগুলোতে সেই সময়ের ভারত উপমহাদেশের পূর্বাংশ তথা বাংলা অঞ্চলের সমাজ জীবন ও সংস্কৃতির নানান বিষয়ে ধারণা পাওয়া যায়। খুঁজে পাওয়া যায় মানুষের দারিদ্র্য, উঁচু-নিচু ভেদাভেদ, বৈষম্য আর বিভিন্ন পথে সাধনার মধ্য দিয়ে ধর্মাচরণের নানান উদাহরণ।

পাল যুগে তালপাতায় লিখিত ও চিত্রিত বৌদ্ধ ধর্মীয় বইয়ের চিত্র ও লেখা।

চর্যাপদ

চর্যাপদ হচ্ছে বাংলার প্রাচীনতম সাহিত্যের নমুনা। চর্যাপদ থেকে বাংলায় বসবাসকারী নানান ধারার মানুষের নাম, পরিচয় এবং তাঁদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন সম্পর্কে নানান তথ্য জানা যায়। ডোম, শবর, পুলিন্দ, নিষাদ নামক মানুষদের কথা জানা যায়। এসব মানুষ আর্যভাষী মানুষদের আগমনের অনেক আগে থেকেই বাংলার আঞ্চলিক ভৌগোলিক পরিবেশে বসতি স্থাপন করেছিলেন। নিজস্ব রীতি-নীতি আর প্রথা-পদ্ধতি মতো সমাজ গঠন করে তারা নিজেদের জীবন পরিচালনা করছিলেন। চর্যাপদ কাব্যে শবরদের জীবনধারা সম্পর্কে চমৎকার তথ্য পাওয়া যায়। শবর মানুষরা অপেক্ষৃত উঁচু এলাকা বা পাহাড়ে বসবাস করত। অরণ্য থেকে সংগ্রহ করা সুন্দর ফুল আর পাখির রঙিন পালক দিয়ে শবর বালিকারা সাজসজ্জা করত। উপরের পাঠে আমরা বিভিন্ন ধরনের উৎসের মাধ্যমে বাংলা অঞ্চলের বিভিন্ন রকমের মানুষের নাম এবং তাঁদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের নানান উৎসব-আয়োজন সম্পর্কে জেনেছি। চর্যাপদ নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যের কথাও জেনেছি। এসবগ্রন্থে বাংলার মানুষের জীবনের যেসব চিত্র অঙ্কীত হয়েছে তাঁর সঙ্গে আমাদের বর্তমান সময়ের মানুষের জীবনের মিল ও অমিলগুলো চিহ্নিত করে চলো একটা তুলনামূলক আলোচনা করি।

চিত্রকলার ক্ষেত্রেও প্রাচীন বাংলার মানুষ বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছিল। চিত্রকলার নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে অসংখ্য পোড়ামাটির ফলকে এবং চিত্রযুক্ত পুঁথিতে। নবম শতকে বাংলার বরেন্দ্রীতে ধীমান এবং বীতপাল নামে শিল্পী বাস করতে জানা যায়। চিত্রকলায় তারা ছিলেন সেই যুগের বিখ্যাত মানুষ।

পালবংশের রাজা রামপালের সময়ে রচিত 'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা' নামে একটি পুঁথি পাওয়া গিয়েছে যাকে প্রাচীন বাংলার চিত্রশিল্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলে অভিহিত করা যায়। বিভিন্ন স্থাপনার দেয়াল অলংকরণ, ব্যবহার্য দ্রব্য সামগ্রীর শোভাবর্ধন এবং গৃহসজ্জায় চিত্র অঙ্কনের রীতি বাংলায় আবহমানকাল ধরেই চর্চা হয়ে আসছে।

অষ্টসহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা গ্রন্থ। প্রাচীনকালে বাংলা অঞ্চল বা ভারতীয় উপমহাদেশের পূর্বাংশে বিভিন্ন বৌদ্ধবিহার ও মহাবিহারে এ ধরনের গ্রন্থ লিখিত ও চিত্রিত হতো।

ভাস্কর্য শিল্প বাংলা অঞ্চলের মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনের অন্যতম উজ্জ্বল একটি দিক। বাংলা অঞ্চলে শিল্পটির যাত্রা শুরু হয়েছিল ২০০ সাধারণ পূর্বাব্দে এবং ৯০০ সাধারণ অব্দের মধ্যে এটি চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল। বিভিন্ন ধরনের পাথর, আগ্নেয়শিলা এবং ব্রোঞ্জের তৈরি প্রচুর ভাস্কর্য পাওয়া গিয়েছে বাংলা অঞ্চলের প্রত্নস্থলগুলোতে। নবম শতাব্দী থেকে কালো আগ্নেয়শিলার ভাস্কর্য দেখা যায়। ভাস্কর্যগুলোর অপূর্ব শিল্পগুণের কারণে অনেকেই একে পৃথিবীর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিল্পরীতি হিসেবে গণ্য করে থাকেন।

বিভিন্ন প্রাচীন সূত্র ও লৌকীক আচার থেকে জানা যায়, প্রাচীনকাল থেকেই বাংলার অধিবাসীরা নৃত্য-গীতির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। বাংলার প্রাচীনতম কাব্যসংকলন চর্যাপদের একটি কবিতায় একজন ডোম্বী রমণীর কথা বলা হয়েছে। সে যখন নৃত্য করে, মনে হয় যেন একটি ফুল চৌষট্টিটি পাপড়ি মেলে দিয়ে শোভা/সৌন্দর্য বিকীরণ করছে। পাহাড়পুর বিহারে পোড়ামাটির যেসব ফলক পাওয়া গেছে সেখানেও প্রাচীন বাংলার মানুষের নানান রকম উৎসব ও আনন্দের সুন্দর সব চিত্র আমরা দেখতে পাই। গায়ক ও গায়িকারা হাতে ডঙ্কা, বাঁশি, কাসর, করতাল বাজিয়ে গান গাইছে। বিবাহ উৎসবে পুরুষেরা গান গাইতো, মেয়েরা নৃত্য করত। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে বাংলার আদি এই অধিবাসীদের জীবন ও সংস্কৃতির গল্পই মূলত পরবর্তীকালে লিখিত কাব্য এবং পোড়ামাটির ফলকগুলোর উৎকীর্ণ হয়েছে।

অনুশীলনী

উপরের পাঠে আমরা বিভিন্ন ধরনের উৎসের মাধ্যমে বাংলা অঞ্চলের বিভিন্ন রকমের মানুষের নাম এবং তাঁদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের নানান উৎসব-আয়োজন সম্পর্কে জেনেছি। সুভাষিত রত্নকোষ এবং চর্যাপদ নামে দুটি গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যের কথাও জেনেছি। এসব গ্রন্থে বাংলার মানুষের জীবনের যেসব চিত্র অঙ্কীত হয়েছে, তাঁর সঙ্গে আমাদের বর্তমান সময়ের মানুষের জীবনের মিল ও অমিলগুলো চিহ্নিত করে চলো একটা তুলনামূলক আলোচনা করি।

১৩০০ সাল বা সাধারণ অব্দের শুরুর দিকেই বাংলা অঞ্চলের উত্তর-পশ্চিম দিকে তুর্কী-আফগানদের আগমন ঘটে। তাঁরা বাংলার উত্তর-পশ্চিম দিকের একটি অংশের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে লখনৌতি নামে একটি রাজনৈতিক কেন্দ্র স্থাপন করে। এরপর থেকে বিভিন্ন এলাকা থেকে বাংলার বিভিন্ন অংশে নানান মতধারার যোদ্ধা, বণিক, ধর্মপ্রচারক পির, দরবেশ, সুফি-সাধকদের আগমন ঘটে। নবাগত শ্রেণির অনেকেই বাংলায় স্থায়ী বসতি স্থাপন করতে শুরু করলে এখানে নতুন ধর্ম-সাংস্কৃতিক রীতি-নীতি আর সমাজব্যবস্থার গোড়াপত্তন হয়। খানকাহ, মসজিদ, মাদ্রাসাসহ নতুন ধারার নানান সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষতা ও সুফিদের তৎপরতায় বাংলা অঞ্চলে আদি বসতি স্থাপনকারী মানুষদের কাছে নতুন এই ধর্ম-সংস্কৃতির কথা পৌঁছাতে শুরু করে।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

ত্রয়োদশ শতকের পর থেকে আরব, পারস্য, তুরস্ক, আফগানিস্তান, উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান থেকে যেসব মুসলমান বাংলায় এসে বসতি স্থাপন করেন তারা সেসব ভূখণ্ড থেকে নিয়ে আসেন নতুন কিছু সামাজিক বিশ্বাস, রীতিনীতি এবং সাংস্কৃতিক উপাদান। এভাবেই বাংলা অঞ্চলে ইসলাম প্রবেশ করেছে।

উপরে উল্লিখিত মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলায় একের পর এক মসজিদ, দরগাহ, খানকাহ নির্মিত হয়েছে। স্থাপনাগুলোর মধ্যে পান্ডুয়ার আদিনা মসজিদ, গৌড়-লখনৌতির ছোটো সোনামসজিদ ও বড়ো সোনা মসজিদ, রাজশাহীর বাঘা মসজিদ, বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ মসজিদ উল্লেখযোগ্য।

বাংলা অঞ্চলে নির্মিত আদিনা মসজিদটিকে খুঁজে পাওয়া যাবে বর্তমান ভারতের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের মালদহ জেলায়। এটা মসজিদ স্থাপত্যের একটি অনন্য নিদর্শন। একটি শিলালিপি থেকে জানা যায়, ১৩৭৩ সালে সিকান্দর শাহ মসজিদটি নির্মাণ করেন। এটি শুধু বাংলা অঞ্চল নয়, গোটা উপমহাদেশের মধ্যে অন্যতম একটি মসজিদ। বর্তমানে এটা প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থায় টিকে রয়েছে। আদিনা মসজিদের অলংকৃত দেয়াল সকলের দৃষ্টি কেড়ে নেয়।

সুলতান নাসির উদ্দীন মাহমুদ শাহের শাসনকালে খান জাহান নামক একজন সুফিসাধক সুন্দরবন এলাকায় গভীর বন কেটে জনবসতি গড়ে তোতুলে। খান জাহান ছিলেন একজন নির্মাতা। বর্তমানে যেখানে যশোর, খুলনা, বাগেরহাট অবস্থিত সেই এলাকায় তিনি অনেকগুলো শহর, মাদ্রাসা, মসজিদ, সেতু, নির্মাণ করেছিলেন। নতুন এক স্থাপত্যরীতিতে নির্মাণ করেন ষাটগম্বুজ মসজিদ।

সুলতানি আমলে বাংলা অঞ্চলে নির্মিত একটি বিখ্যাত মসজিদ হচ্ছে, আদিনা মসজিদ। বর্তমান ভারতের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের মালদহ জেলায় এটির এখনো ধ্বংসাবশেষের খোঁজ পাওয়া যায়। ১৩৭৩ সালে বাংলার সুলতান সিকান্দার শাহ এই মসজিদটি নির্মাণ করেন।

ষাটগম্বুজ মসজিদ। সুলতান নাসির উদ্দীন মাহমুদ শাহের শাসনামলে খান জাহান নামের একজন সুফিসাধক সুন্দরবন এলাকায় গভীর বন কেটে জনবসতি গড়ে তোলেন। এই মসজিদটি তিনিই নির্মাণ করেন।

ষোড়শ শতকের শেষভাগ থেকে বাংলায় মোগল শাসকদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা পেতে শুরু করে এবং শতকের গোঁড়ার দিকেই তা বাংলা অঞ্চলের পূর্ব সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে।

মসজিদ, দুর্গ এবং কাটরার পাশাপাশি বিখ্যাত কিছু মন্দিরও নির্মিত হয় মোগল শাসিত বাংলা অঞ্চলে। এর মধ্যে বর্তমান পাবনার জোড়া বাংলা মন্দির, পুটিয়ার শিবমন্দির এবং দিনাজপুরের কান্তজির মন্দির বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মন্দির স্থাপত্যটি নবরত্ন বা নয় চূড়ার মন্দির। কান্তজির মন্দিরের বাইরের দেয়াল জুড়ে বসানো হয়েছে অনন্য সুন্দর পোড়ামাটির ফলক। এসব ফলকে অঙ্কিত হয়েছে রামায়ণ-মহাভারতের নানান ঘটনাবলি আর তৎকালীন সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন সমাজ-সংস্কৃতির খণ্ডচিত্র। এই মন্দির ছাড়াও আরও অসংখ্য মন্দির বাংলা অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে তৈরি করা হয়েছিল। বাংলার গ্রামের কুঁড়েঘরের আদলে দোচালা আর চৌচালা রীতিতে অনেকগুলো স্থাপত্য গড়ে উঠেছিল।

পাবনার জোড়া বাংলা মন্দির এবং দিনাজপুরের কান্তজির মন্দির

স্থাপত্যকলার পাশাপাশি সংগীত, সাহিত্য, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, চিত্রকলাসহ শিল্প-সংস্কৃতির নানান ক্ষেত্রে এসময় লক্ষ্যণীয় উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল। কৃষিভিত্তিক বাংলা অঞ্চলে ফসল কাটার দিনগুলো যে আদিকাল থেকেই গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তা আমরা আগেই জেনেছি। মোগল শাসনামলে এই ফসলের মৌসুম ধরেই অনুষ্ঠিত হতো পুণ্যাহ নামে একটি উৎসব। 'পুণ্যাহ' ছিল মূলত কৃষক ও রায়তদের কাছ থেকে জমিদারদের রাজস্ব গ্রহণের অনুষ্ঠান। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের এই অনুষ্ঠানে নাচ, গান, যাত্রা, মেলা, ষাঁড়ের লড়াই, মোরগের লড়াইসহ নানান আনন্দ উৎসবের উদ্যোগ নেওয়া হতো। কৃষিভিত্তিক বাংলার সকল মানুষের কাছে ফসল তোলার দিনটি ছিল হাজার বছরের এক অকৃত্রিম আনন্দ প্রকাশের দিন।

১৩০০ থেকে ১৮০০ সালের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য হচ্ছে মঙ্গলকাব্য ও ময়মনসিংহ গীতিকা। মহাকাব্যের আদলে লেখা এই গীতিকবিতাগুলো বাদ্যবাজনাসহ গানের মতো করে পরিবেশন করা হতো। শুরুর দিকে সংস্কৃত এবং পরবর্তীকালে প্রাকৃত ভাষায় বাংলা অঞ্চলের মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং সাহিত্য চর্চা করতেন। প্রাকৃত ভাষা ছিল সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন মুখের ভাষা। এই ভাষা থেকেই ধীরে ধীর বাংলা ভাষার উদ্ভব ঘটে।

এই সময়কালে বাংলায় আরবি এবং ফার্সি ভাষার আগমন ঘটে। বাংলা অঞ্চলে মানুষের শিক্ষাক্ষেত্রে প্রচলিত সংস্কৃত এবং পালি ভাষার পাশাপাশি এই দুটি ভাষাও গৃহীত হয়। বাংলা অঞ্চলে মানুষের মুখের ভাষার সঙ্গে ক্রমে ক্রমে সংস্কৃত, পালি, আরবি, ফার্সি, পর্তুগিজ, ইংরেজি প্রভৃতি ভাষার শব্দ মিশে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ ঘটে।

অনুশীলনী

চলো, একটা অনুসন্ধানমুলক কাজ করি। ইতিহাসের আদিকাল থেকে ১৮০০ সাধারণ অব্দ পর্যন্ত সময়ে বাংলা অঞ্চলে আগমনকারী এবং বসতি স্থাপনকারী মানুষের পরিচয় খুঁজে বের করি। বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে এই সকল মানুষের পৃথক পৃথক সামাজিক রীতি-নীতিগুলো খাতায় লিখি এবং কীভাবে এই পৃথক রীতি-নীতিগুলোর মধ্যে সমন্বয় ঘটে, তা শ্রেণিকক্ষে দলগত উপস্থাপনার মাধ্যমে তুলে ধরি।

সমাজ-সংস্কৃতির অবিরাম বদল, বৈচিত্র্য আর বহুত্ব, ভাষাভিত্তিক পরিচয় গঠন (১৮০০ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত)

পনেরো শতকের শেষ ভাগে বাংলা অঞ্চলে ইউরোপীয় বণিকদের জলপথে নতুন করে আগমন শুরু হয়। আঠারো শতকের মধ্যভাগে পর্তুগিজ, ওলন্দাজ, ফরাসি, ইংরেজ বণিকেরা আঞ্চলিক বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান অংশগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে। ১৭৫৭ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার রাজ ক্ষমতা অধিকার করে নিলে বাংলা অঞ্চলের মানুষের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনে নতুন এক পরিবর্তনের ঢেউ ওঠার ক্ষেত্র তৈরি হয়। শাসনকার্য পরিচালনা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ইংরেজ বাংলায় আসে। ধীরে ধীরে গোটা ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ রাজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন মিশনারি প্রতিষ্ঠান এবং ইংরেজ শাসকদের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা অঞ্চলে নতুন নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। ইউরোপীয় শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাপদ্ধতির আলোকে বিদ্যালয়গুলো পরিচালিত হতে শুরু করে। এর ফলে বাংলা অঞ্চলের

মানুষ পাশ্চাত্য শিক্ষাধারা, দর্শন ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হতে শুরু করে। এই সময় থেকেই কলকাতা থেকে বাংলা ও ইংরেজি সংবাদপত্র, সাময়িক পত্রিকা বিভিন্ন বিষয়ে নিয়মিত গ্রন্থ প্রকাশিত হতে শুরু করে।

উনিশ শতকের শুরুর দিকে বাংলা অঞ্চলের ইংরেজ অধ্যুষিত এলাকাগুলোয় সংস্কৃত, আরবি, ফার্সি শিক্ষার পাশাপাশি ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন হয়। ইউরোপের নানান দেশ এবং ভাষার গ্রন্থসমূহ বাংলায় অনূদিত হয়। এই সময়েই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজা রামমোহন রায়, ডিরোজিও, সৈয়দ আমীর আলী, বেগম রোকেয়া প্রমুখ ব্যক্তিত্বের প্রচেষ্টায় শিক্ষার প্রসার ঘটে, সামাজিক বিভিন্ন কুসংস্কার দূর হতে থাকে এবং এক সামাজিক বিপ্লব সংঘঠিত হয়।

এই বিপ্লবের ফলে সমাজ থেকে বর্ণভেদ প্রথা, বহু বিবাহ, বাল্যবিবাহ, সতীদাহ প্রথা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হতে শুরু করে। সামাজিক জীবনে আরও নানান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন দানবীর হাজি মুহম্মদ মুহসীন, হাজি শরীয়তুল্লাহ, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ।

উনিশ শতকে বাংলা অঞ্চলের মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনের সবচেয়ে উজ্জ্বল দিক হচ্ছে বাংলা সাহিত্য নতুন রূপে উপস্থাপন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, মীর মশাররফ হোসেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখের হাত ধরে প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা এবং উপন্যাস রচিত হতে শুরু করে; যা ধীরে ধীরে পরবর্তীকালে কাজী নজরুল ইসলাম, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, জীবনানন্দ দাশ, জসীমউদ্ দীন, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, হুমায়ূন আহমেদ, জাফর ইকবাল প্রমুখের লেখনীর মাধ্যমে আরও ব্যাপকভাবে বিকশিত হয়ে বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে।

বাংলা অঞ্চলে মানুষের রাজনৈতিক অধিকার ও সাংস্কৃতিক চেতনাবোধ জাগরণের কাল হিসেবে চিহ্নিত করা হয় উনিশ শতককে। ফরাসি বিপ্লবের মতো যুগান্তকারী রাজনৈতিক ঘটনাগুলো বাংলা অঞ্চলের মানুষ কিছু কিছু জানতে শুরু করে। যেকোনো অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে লড়াই করে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংস্কৃতি শিক্ষিত তরুণদের হাত ধরে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাতে শুরু করে। এরপর কখনো নিরস্ত্র আবার কখনো সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলনের মাধ্যমে ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে।

১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের পাশাপাশি বাংলা প্রদেশকেও দুভাগে বিভক্ত করা হয়। বাংলা ভেঙে এর পশ্চিম অংশকে যুক্ত করা হয় ভারতের সঙ্গে আর পূর্ব অংশকে যুক্ত করা হয় ২২০০ কীলোমিটার দূরের পাকিস্তান নামক নতুন একটি রাষ্ট্রের সঙ্গে। সাধারণ মানুষের সম্মতি গ্রহণ না করেই তৎকালীন ব্রিটিশ, কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের রাজনীতিবিদগণ ধর্মের ভিত্তিতে এই ভাগ করেন। হিন্দু জনগোষ্ঠী বেশি এই কথা বলে বাংলার পশ্চিম অংশকে ভারতের সঙ্গে এবং মুসলমান জনগোষ্ঠী বেশি এই কথা বলে বাংলার পূর্ব অংশকে পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত করে দেয়া হয়। কিন্তু দেখা গেল পশ্চিম বাংলায় বিপুল সংখ্যক মুসলমান, বৌদ্ধ আর ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী রয়েছে, একইভাবে পূর্ব বাংলায় রয়েছে বিপুল সংখ্যক হিন্দু, বৌদ্ধ আর ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষ। পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের অল্পদিনের মধ্যেই পাকিস্তান আর পূর্ব বাংলার মানুষের সাংস্কৃতিক বৈপরীত্যের বিষয়টি প্রকট হয়ে ওঠে। পাকিস্তান রাষ্ট্রের অভিজাত শাসকেরা তাঁদের ভাষা উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করতে চায়। শাসকদের এই প্রস্তাবের বিপরীতে তৎকালীন পূর্ব বাংলার সাধারণ শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি আদায়ে সক্ষম হয় পূর্ব বাংলার সাধারণ মানুষ। কিন্তু পূর্ব বাংলা এবং পাকিস্তানের নানান ভাষাগোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে বিদ্যমান সাংস্কৃতিক বৈপরীত্যের তাতে অবসান ঘটেনি। ১৯৫৬ সাল থেকে পূর্ব বাংলার নাম আইনগতভাবে পূর্ব পাকিস্তান করা হয়। তাতেও সংকটের কোনো সমাধান হয়নি। বাঙালি মুসলমান, হিন্দু

ও বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর বৈচিত্র্যময় ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি পাকিস্তান সরকার কর্তৃক বারবার বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের রেশ ধরে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী রেডিও-টেলিভিশনসহ নানান ক্ষেত্রে রবীন্দ্রসংগীত প্রচারকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। বাংলার পূর্বভাগের শিক্ষার্থী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বসহ সাধারণ মানুষ পাকিস্তান সরকারের এই ঘোষণায় আবারও বিক্ষোভ প্রকাশ করেন। সরকারের নিষেধ উপেক্ষা করে মানুষ রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন এবং রবীন্দ্রসংগীতের প্রতি তাঁদের অকৃত্রিম ভালোবাসা প্রকাশ করতে থাকেন।

ছায়ানট

পাকিস্তানি সামরিক শাসকদের শাসনকালে প্রতিকূল পরিবেশে প্রতিষ্ঠিত একটি সাংস্কৃতিক সংগঠনের নাম ছায়ানট। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করার ঐকান্তিক ইচ্ছায় রবীন্দ্র ভাবনা এবং রবীন্দ্রসংগীতকে অবলম্বন করে সংগঠনটির যাত্রা শুরু হয়। সংগীতকে অবলম্বন করে বাঙালির সংস্কৃতি সাধনার সমগ্রতাকে বরণ ও বিকাশে ছায়ানট অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। ধীরে ধীরে সাংস্কৃতিক সংগঠনটি সাহিত্যিক, চিন্তাবিদ, চিত্রশিল্পী, চলচ্চিত্রকর্মী, বিজ্ঞানী, সমাজব্রতীদের মিলনমেলায় পরিণত হয়। পাকিস্তানের এলিট স্বৈরশাসকদের দুঃশাসনের প্রতিবাদ থেকে শুরু করে স্বাধীনতা যুদ্ধ পর্যন্ত বাঙালির পথযাত্রার অংশ ছায়ানট। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এখন অবধি বাঙালি সংস্কৃতি চর্চার লক্ষ্যে গান, নৃত্য, যন্ত্রসংগীত প্রশিক্ষণ ও প্রচারে ছায়ানট নিরলসভাবে ভূমিকা পালন করে চলেছে। সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের দুর্যোগ ও মহামারিতে বিপন্ন মানুষের মধ্যে ত্রাণসহায়তা সহ নানান ধরনের সেবামূলক কাজেও অংশ নেয় এই সংগঠন।

রমনার বটমূলে ছায়ানটের বর্ষবরণ অনুষ্ঠান। বাঙালি সংস্কৃতি চর্চার লক্ষ্যে গান, নৃত্য, যন্ত্রসংগীত, প্রশিক্ষণ ও প্রচারে ছায়ানট নিরলসভাবে ভূমিকা পালন করে চলেছে।

বাংলা অঞ্চলের পূর্বাংশের জনগণ রাজনৈতিক আন্দোলনের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক আন্দোলন চালিয়ে গেছে। বাংলা ভাষা ও বাঙালির মুক্তির সংগ্রাম দিকভ্রান্ত এবং বিভ্রান্ত হয়নি; কারণ বঙ্গীয় বদ্বীপের মানুষের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এতে নেতৃত্ব দেন। তাঁরই নেতৃত্বে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলা অঞ্চলের পূর্বাংশে প্রতিষ্ঠিত হয় স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্র।

ইতিহাসের দীর্ঘ পথযাত্রায় বাংলা অঞ্চলে ধর্ম-সংস্কৃতির পরিবর্তন আর রুপান্তর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সংস্কৃতির নানান রকমফের দেখা যায়, বাংলা অঞ্চলের প্রত্যন্ত অংশে যেগুলোকে লোকজ সংস্কৃতি বলা হয়ে থাকে। সংস্কৃতির এই লোকজ উপকরণ বাংলার আঞ্চলিক সংস্কৃতির প্রাণ। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নানান ধর্ম-সংস্কৃতি নিয়ে বিভিন্ন সময়ে যাঁরা বাংলা অঞ্চলে এসেছেন তাঁদের সঙ্গে মিলনে-বিরোধে বাংলার সংস্কৃতির এই লোকজ ধারা টিকে রয়েছে। গ্রহণ-বর্জন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাঙালি সংস্কৃতি হিসেবে শক্তিশালী রূপে গড়ে উঠেছে তোমরা মনে রাখবে, বাংলার মানুষেরা আবহমানকালের ধারা অনুযায়ী পুরোনো সাংস্কৃতিক রীতি-নীতিকে বজায় রেখে এবং নতুনের কিছু বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করার মাধ্যমে সাংস্কৃতিকভাবে সব সময় সক্রিয় থেকেছে।

আঞ্চলিক বাংলার মানুষ যেভাবে ধর্ম-সাংস্কৃতিক উৎসব উদ্‌যাপন করে সেখানেও রয়েছে একটা নিজস্বতা। উৎসবে রয়েছে স্বকীয় কিছু মাত্রা। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বাংলার সকল মানুষের প্রধানতম ধর্ম-সাংস্কৃতিক উৎসবগুলোর মধ্যে ঈদ, ঈদে-মিলাদুন্নবী, দুর্গাপূজা, সরস্বতী পুজা, দোল উৎসব, দেওয়ালি, শবে-বরাত, মহররম, বুদ্ধ পূর্ণিমা, বড়োদিন, বিজু বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বিপুল আয়োজনে বৈশাখের প্রথমদিন উদযাপন করেন বাংলা নববর্ষ উৎসব। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোতে চলে হালখাতা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা থেকে বের হয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ধারণকারী মঙ্গল শোভাযাত্রা। তোমরা জেনে খুশি হবে যে, ২০১৬ সালের ৩০ নভেম্বর জাতিসংঘের সংস্কৃতিবিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কো কর্তৃক মঙ্গল শোভাযাত্রা 'বিশ্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য' হিসেবে ঘোষিত হয়েছে। মঙ্গল শোভাযাত্রা এখন আর কেবল বাঙালির নয়, বিশ্ব সংস্কৃতির অংশ।

গান বা সংগীত বাংলা অঞ্চলের মানুষের হাজার বছরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অন্যতম অনুষঙ্গ। লালন ফকির, হাসনরাজা, আব্বাসউদ্দীন আহমদ, আবদুল আলীম, শাহ আব্দুল করিমের গান বাংলার মানুষের মুখে মুখে ভেসে বেড়ায়। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের গান বাংলা গানের জগৎকে নিয়ে গেছে এক অনন্য উচ্চতায়।

বাংলার স্থাপত্যকলার ইতিহাসও একই সঙ্গে প্রাচীন এবং আধুনিক উপাদানে সমৃদ্ধ। বর্তমান বাংলাদেশের সংসদ ভবন, কার্জন হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি অডিটোরিয়াম প্রভৃতি ভবনগুলোতে পাশ্চাত্য নির্মাণধারার ব্যাপক প্রভাব লক্ষ করা যায়। 'বাটারফ্লাই ক্যানপি' বা প্রজাপতির পাখার মতো দেখতে টিএসসির মূল অডিটোরিয়াম ভবনটিতে বাংলার কুঁড়েঘরের আদলে চালাযুক্ত স্থাপত্য রীতির সঙ্গে গ্রিক রীতির অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি অডিটোরিয়াম ভবনের ছবি। বাটারফ্লাই ক্যানপি বা প্রজাপতির পাখার মতো দেখতে এই স্থাপনাটিকে বাংলার কুঁড়েঘরের আদল চালাযুক্ত স্থাপত্যরীতির সঙ্গে গ্রিক রীতির অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে।

বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনের ধারাবাহিক আলোচনাতে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে চিত্রকলা। তোমরা নিশ্চয়ই এস এম সুলতান ও জয়নুল আবেদিনের মতো প্রতিভাবান চিত্রকরদের নাম শুনেছ। এসএম সুলতানের চিত্রকর্মে ফুটে উঠেছে নানান প্রতিকূলতার মধ্যেও আবহমানকালের বাংলার মানুষের সক্ষমতার ইতিহাস আর টিকে থাকার অনুপ্রেরণার গল্প। সুলতানের চিত্রকর্মে বাঙালি কৃষক সবসময় শক্তিশালী মানুষ হিসেবে চিত্রিত হয়েছেন।

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের আঁকা বিখ্যাত চিত্রকর্ম 'সংগ্রাম'। বাংলার মানুষের জীবনে উপগত নানান দুর্যোগ, দুঃশাসন, প্রতিকূলতা ছাপিয়ে মানুষের বেঁচে থাকার লড়াই মূর্তিমান হয়ে উঠেছে মহান এই চিত্রশিল্পীর তুলিতে।

বাংলার আরেকজন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী হলেন এস এম সুলতান। এস এম সুলতান কৃষিভিত্তিক বাংলার কৃষাণ-কৃষাণীদের ছবি এঁকেছেন অত্যন্ত বলশালী অবয়বে।

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের উল্লেখযোগ্য চিত্রকর্মের মধ্যে রয়েছে নবান্ন, মনপুরা এবং সংগ্রাম। বাংলার মানুষের জীবনের উপগত নানা দুর্যোগ, দুর্ভিক্ষ, বহিঃশত্রুর আগ্রাসন এবং সবকিছু ছাপিয়ে মানুষের বেঁচে থাকার লড়াই মূর্তিমান হয়ে উঠেছে

অনুশীলনী

আত্মপরিচয় অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদন

আদিকাল থেকে শুরু করে ১৯৭১ সাল অবধি বাংলা অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বৈচিত্র্যময় গতিপথ সম্পর্কে তোমরা কিছুটা ধারণা পেয়েছ। সমাজ-সংস্কৃতির এই গতিপথ নির্ধারণে রাজনৈতিক ঘটনাবলি এবং বাংলা অঞ্চলের ভৌগোলিক উপাদানগুলোরও রয়েছে কিছু প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভূমিকা। পরিবার থেকে শুরু করে রাষ্ট্র ও সমাজে আমাদের পরিচয় গঠন প্রক্রিয়ায় যুগে যুগে নানান উপাদান যুক্ত হয়েছে। নানান ধারার মানুষের সংমিশ্রণ ঘটেছে। এর ফলে বৈচিত্র্য আর ভিন্নতাকে সঙ্গে নিয়েই আমরা লাভ করেছি এক অনন্য আত্মপরিচয়। চলো, আদিকাল থেকে শুরু করে ইতিহাসের বিভিন্ন কালপর্বে আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতি যেসব রূপান্তরের মধ্য দিয়ে গেছে, সেগুলো উল্লেখ করে একটি প্রতিবেদন লিখি।

সামাজিকীকরণ, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও সমাজ পরিবর্তন

এই শিখন অভিজ্ঞতায় আমরা সমাজের প্রচলিত রীতিনীতি ও মূল্যবোধ নির্ণয় করব। সমাজের প্রচলিত রীতিনীতি ও মূল্যবোধের মধ্যে কোনগুলো আমরা বিদ্যালয়ে চর্চা করি তা নির্ধারণ করব। এরপর সামাজিকীকরণ ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ায় মানুষ কীভাবে এবং কেনো প্রচলিত রীতিনীতি ও মূল্যবোধ শেখে এবং চর্চা করে তা জানব। সমাজ পরিবর্তনের মাধ্যমে সামাজিক কাঠামো কীভাবে প্রচলিত রীতিনীতি ও মূল্যবোধকে পরিবর্তন করতে পারে তা জানব। এরপর বিদ্যালয়ে শেখা কিছু প্রচলিত রীতিনীতি ও মূল্যবোধ আমরা নির্ধারণ করব যা আমরা সমাজে চর্চা করতে চাই।

আমরা ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণিতে ইতোমধ্যে রীতিনীতি ও মূল্যবোধ সম্পর্কে বিস্তারিত জেনেছি। তাই প্রথমেই আমরা একটি কাজ করব। আমরা এই শিখন অভিজ্ঞতার জন্য নতুন করে একটি দল গঠন করি।

দলগত কাজ ১:

প্রতি দলে ৫ থেকে ৬ জন থাকবে। দলে আলোচনা করে আমরা আমাদের সমাজের কয়েকটি প্রচলিত রীতিনীতি ও মূল্যবোধ নির্ণয় করে একটি তালিকা তৈরি করি।

অনুশীলনী কাজ ১:

আমার সমাজের প্রচলিত রীতিনীতি ও মূল্যবোধ

অনুশীলনী ১ এর কাজটি করার পর আমরা দলে আলোচনা করে নির্ধারণ করি আমাদের সমাজের প্রচলিত রীতিনীতি ও মূল্যবোধের কোনগুলো আমরা বিদ্যালয়ে চর্চা করি।

অনুশীলনী কাজ ২:

আমার বিদ্যালয়ে চর্চা করা হয় সমাজে প্রচলিত এমন রীতিনীতি ও মূল্যবোধ

অনুশীলনী কাজ ১ ও অনুশীলনী কাজ ২ হয়ে গেলে প্রতি দল থেকে ১ বা ২ জন আমরা দলীয় কাজ উপস্থাপন করব।

আচ্ছা আমরা একটু কল্পনা করে দেখিতো আমরা যদি কোনো পরিবারে লালিত-পালিত না হয়ে কোনো বন-জঙ্গালে বন্য প্রাণীদের সান্নিধ্যে বেড়ে উঠতাম, তাহলে কী হতো? কী খুব অবাক লাগছে? চলো, আমরা ইংরেজ লেখক রুডিয়ার্ড কীপলিংয়ের বিখ্যাত 'দ্য জাংগল বুক' গল্পটার সংক্ষেপ পড়ে নিই।

বনে হারিয়ে যাওয়া মুগলি

গল্পের মূল চরিত্রের নাম মুগলি। সে জন্মের পরপরই ভারতীয় এক জঙ্গালে হারিয়ে গিয়েছিল। সে জানত না তার মাতা-পিতা কারা, তারা দেখতে কেমন। মাতা-পিতার সংস্পর্শ ছাড়া মুগলি বেড়ে ওঠে জঙ্গালে। তাকে বড়োো করে তুলেছিল কে জানো? একদল নেকড়ে। সে নেকড়েদের মতো করেই জঙ্গালের জীবনে মানিয়ে নিয়েছিল। মুগলি একমাত্র মানুষ হিসেবে সেখানে বসবাস করত। বনে তো মানুষের জন্য অনেক বিপদ-বাধা ছিল। শেরশাহ নামক মানুষ খেকো এক বাঘের কবল থেকে মুগলিকে রক্ষা করার জন্য বাঘীরা নামের চিতাবাঘ কিছু পশু বন্ধুর সঙ্গো মিলে তাকে কাছেই এক গ্রামে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। তবে মুগলি ছোটোবেলা থেকে বেড়ে উঠেছিল জঙ্গালে। নেকড়ের দল এবং অন্যান্য পশুপাখিদের সে তার পরিবার-পরিজন হিসেবে জেনে এসেছে। নেকড়ে দলের মাধ্যমে তার সামাজিকীকরণ হওয়ায় এর আচার-ব্যবহার সবকিছুতেই তার প্রভাব ছিল, যা মানুষের আচরণ ও সমাজের সঙ্গো সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। মুগলি, বাঘীরার সিদ্ধান্তে তাই জঙ্গাল ছেড়ে যেতে চায়নি। যাহোক অন্য মানুষের সংস্পর্শে গিয়ে তার মনোভাব পরিবর্তন হয়। এক্ষেত্রে তার সমবয়সী এক সঙ্গী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। তাঁদের সংস্পর্শে এসেই মুগলির সামাজিক ব্যবহার, আচার-আচরণ, আবেগ, অনুভূতির যথাযথ বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে শুরু করে। সমাজের একজন হওয়ার জন্য মুগলিকে মানুষের জীবনাচরণ শিখে নিতে হয়েছিল। একে বলা হয় পুণঃসামাজিকীকরণ।

এটি যদিও নিছক গল্প, কিন্তু মানুষের জীবনে সামাজিকীকরণের গুরুত্ব বোঝার জন্য একটি চমৎকার উদাহরণ। শুধু গল্পে নয়, বাস্তব জীবনেও সামাজিকীকরণ না হলে কী ঘটে তা জানা যায় বিভিন্ন সত্য ঘটনার আলোকে। চলো, এবার আমরা এরকম একটা সত্য ঘটনা জানব। ১৯২০ সালে ভারতের গোদামুরি গ্রামের নিকটবর্তী জঙ্গলে এক ধর্মপ্রচারক দম্পতি স্থানীয় লোকজনের কিছু কথাবার্তার ভিত্তিতে অনুসরণ করে জঙ্গলে গিয়ে এক গুহায় কিছু নেকড়ের সঙ্গে থাকা দুটি মানব শিশুকে উদ্ধার করেন। এদের নাম দেন অমলা ও কমলা। তারা জন্মের পর থেকেই নেকড়দের সঙ্গে বড়ো হওয়ায় মুগলির মতো তাঁদেরও প্রাথমিক সামাজিকীকরণ হয়নি। তারা নেকড়েদের মতোই নির্দিষ্ট সময়ে চিৎকার করত, চার পায়ে চলাচল করত এবং অন্যান্য আচার-আচরণেও নেকড়েদের প্রভাব ছিল দৃশ্যমান। তারা কাঁচা মাংস খেত। তাঁদের পোশাক-পরিচ্ছদ পরানো হলেও তারা তা খুলে ফেলতে চাইতো; উদোম শরীরে থাকতে চাইতো। যখন তাঁদের উদ্ধার করা হয়, তখন অমলার বয়স ছিল দুই বছর, আর কমলার বয়স ছিল আট বছর । কিন্তু তাঁদের আচার-আচরণ দেখে মনে হত যেন তারা মাত্র ছয় মাসের মানব শিশু। মানুষের আচার-আচরণ শিখিয়ে তাঁদের সমাজের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার সর্বাত্মক চেষ্টা করা হয়। তবে জঙ্গল থেকে উদ্ধার করার কয়েক মাসের মাঝে অমলা মারা যায়; আর কমলার মৃত্যু হয় ১৭ বছর বয়সে ১৯২৯ সালে। মৃত্যুর আগে কমলা কিছুটা হলেও মানব আচরণ শিখেছিল। সে দুই হাতে খেতে পারত, কিছু শব্দ উচ্চারণ করতে পারত। অমলা কমলার ঘটনায় প্রমাণিত হয় আসলে বংশগত বৈশিষ্ট্য নয়, সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই শিশু আচার-ব্যবহার, সামাজিক রীতিনীতি, ও মূল্যবোধ শেখে।

মানুষের সংস্পর্শে এসে কমলা কিছুটা মানুষের মতো খেতে অভ্যস্ত হয়

সামাজিকীকরণ

মানুষ মাত্রই সামাজিক জীব তা আমরা ছোটোবেলা থেকে জেনে এসেছি। কিন্তু কেন তা বলা হয় তা আমাদের জানা দরকার। একজন মানবশিশু জন্মমাত্রই সামাজিক প্রাণীতে পরিণত হয় না। তাকে বেড়ে ওঠার পাশাপাশি সমাজের নিয়ম-নীতি ও মূল্যবোধগুলো শিখে সমাজের একজন হয়ে উঠতে হয়। যেহেতু একজন ব্যক্তি একা একা তার চাহিদা পূরণ করতে পারে না, তাই তাকে দলবদ্ধ হয়ে জীবনযাপন করতে হয়। সেজন্য একজন মানুষকে তার নিজস্ব সমাজ-সংস্কৃতিকে বুঝতে এবং সে অনুযায়ী আচার-আচরণ করতে হয়।

সামাজিকীকরণ হলো একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি সমাজের আকাঙ্ক্ষিত মূল্যবোধ, রীতিনীতি, আচার-আচরণ ও দক্ষতাসমূহ আত্মস্থ করে সফলভাবে সমাজের একজন হতে শেখে। প্রতিটি সমাজেরই বেশ কিছু নিজস্ব বিশ্বাস, নিয়ম-নীতি, মূল্যবোধ ইত্যাদি থাকে যা ওই সমাজের সকল সদস্যের মেনে চলতে হয়। সামাজিকীকরণ আমাদের এসব সামাজিক গুণ শেখায় এবং অন্যের কাছ থেকে আমরা কী ধরনের আচরণ প্রত্যাশা করব, তাও শেখায়। অর্থাৎ এ প্রক্রিয়ায় আমরা সমাজের একজন সদস্য হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলি। সমাজ ও মানুষ একে অপরকে পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে গ্রহণ করে নেয়। সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া একজন মানুষের ছোটোবেলা থেকে শুরু করে সারাজীবন চলমান থাকে।

জীবনের একেক স্তরে সামাজিকীকরণ একেক রকম হয়। একজন শিশু যেমন করে শেখে, একজন প্রাপ্তবয়স্ক সেভাবে শেখে না। সামাজিকীকরণের মাধ্যমগুলো বয়সভেদে ভিন্ন হয়। বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান যেমন পরিবার, বন্ধু-বান্ধব ও বিদ্যালয় সামাজিকীকরণের বিভিন্ন পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শুধু দল বা প্রতিষ্ঠান নয়, চারপাশে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনা, টেলিভিশন, পত্রপত্রিকা, ম্যাগাজিন, সামাজিক যোগাযোগ ও মাধ্যম ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

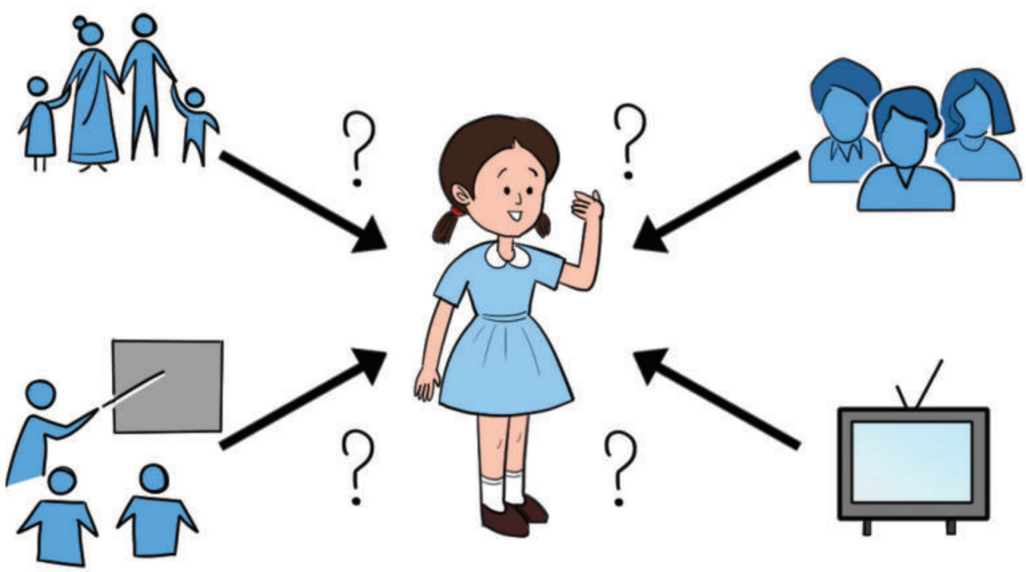

একজন ব্যক্তির সামাজিকীকরণের মাধ্যমসমূহ

সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় সমাজের রীতি-নীতি ও মূল্যবোধ এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে স্থানান্তর হয়। সামাজিকীকরণ সংঘটিত হয় একটি নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে; অর্থাৎ দেশ বা সমাজ ভেদে একজন ব্যক্তির নিকট প্রত্যাশিত আচার-আচরণ ভিন্ন হয়। বাংলাদেশে বসবাসরত মানুষের সঙ্গে অন্য দেশের মানুষের আচরণের পার্থক্যের মূল কারণ হলো সামাজিকীকরণের ভিন্নতা। একজন মানুষের ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে সামাজিকীকরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। কারণ, ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে আমাদের আশপাশের পরিবেশ ও মানুষের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার ফলে। ব্যক্তিত্ব হল একজন মানুষের মনোভাব, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহারের ধরন। একজন মানুষের সঙ্গে অন্য মানুষের ব্যক্তিত্বের ভিন্নতা তৈরি হয় তাঁদের মিথস্ক্রিয়ার ধরনের পার্থক্যের জন্য।

সামাজিকীকরণের বাহনসমূহ

সামাজিকীকরণ সংঘটিত হয় সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা দলের মাধ্যমে, আমরা এগুলোকে সামাজিকীকরণের মাধ্যম বা বাহন বলি। এবার চলো, আমরা সমাজিকীকরণের বাহনসমূহের সঙ্গে পরিচিত হই এবং বোঝার চেষ্টা করি মানুষকে সামাজিক প্রাণীতে রূপান্তরে সেগুলোর অবদান।

পরিবার: শিশু জন্মের পরপরই তার মাতা-পিতা ও পরিবারের অন্যদের মাধ্যমে তার চারপাশকে বোঝার চেষ্টা করে। তখন সে মূলত প্রাথমিক আচরণ করতে শেখে। মুখে কিছু কিছু আওয়াজ করে যা তার প্রাথমিক ভাষা। তার মাঝে আবেগ, অনুভূতি ও মানবিকতার বিকাশ ঘটতে শুরু হয়। শিশুমাত্রই অনুকরণপ্রিয় হয়ে থাকে। তাই পরিবার-পরিজন শিশুর আশপাশে কী আচার-আচরণ করে তা গুরুত্বপূর্ণ। আবার শিশুর আচরণ বা কর্মকান্ড দেখে মা-বাবা ও অন্যরা কী প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে, তার দ্বারাও শিশুর আচরণ প্রভাবিত হয়। আর এর মাধ্যমেই তার মাঝে মানবিক মূল্যবোধ এবং অন্যান্য সামাজিক ও নৈতিক গুণাবলির বিকাশ ঘটে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সামাজিকীকরণের দ্বিতীয় প্রধান বাহন রূপে কাজ করে। পরিবারের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকা শিশুর ছোটো সামাজিক জগৎ কে সম্প্রসারিত করে তোলে একটি বিদ্যালয়। এখানে একজন শিশুর সঙ্গে বিভিন্ন সামাজিক অবস্থান থেকে আসা শিশু ছাড়াও অন্যান্য মানুষের পরিচয় ঘটে। শিশু হলেও তারা কিন্তু অনুধাবন করতে শেখে ব্যক্তির সামাজিক অবস্থানের পার্থক্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শ্রেণিকক্ষে ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক অবস্থান থেকে আসা ছাত্র-ছাত্রীরা সমবেতভাবে জাতীয় সংগীত গায়, একসঙ্গে ওঠাবসা ও খেলাধুলা করে। এতে তাঁদের মাঝে শৃঙ্খলা, দেশপ্রেম, নিয়মানুবর্তিতা, সহমর্মিতাসহ নানা গুণাবলি বিকশিত হয়।

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক-শিক্ষিকারা শুধুমাত্র পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মনে জ্ঞানের সঞ্চারণ করেন না। পরিবেশ বা অবস্থা থেকেও শিক্ষার্থীরা নিজেরাই নানা বিষয় আত্মস্থ করে থাকে। খেলাধুলার ফলে তাঁদের দৌড়ানো, লাফঝাঁপ ইত্যাদি সক্ষমতা নিশ্চিত হওয়ার পাশাপাশি শৃঙ্খলা, সহযোগিতা ও নিয়মানুবর্তিতার মতো প্রয়োজনীয় গুণাগুণ অর্জিত হয়। সেইসঙ্গে শিক্ষার্থীদের নৈতিকতা ও নেতৃত্বের গুণাবলিও বিকশিত হয়।

সমবয়সী সঙ্গী: পরিবারের পরপরই মানুষের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, ঠাট্টা-মশকরার সঙ্গী হয়ে ওঠে একই বয়সের খেলার সাথী, সহপাঠী বা সমবয়সী বন্ধু। নিজেদের মাঝে প্রাণ খুলে, বাধাহীনভাবে মনের কথা বলা যায় একে অপরের সঙ্গে। সমবয়সী সঙ্গী বলতে আমরা এমন একটি সামাজিক দলকে বুঝে থাকি, যাঁরা প্রায় একই বয়সের এবং সামাজিক অবস্থান ও আগ্রহের জায়গায় তাঁদের মধ্যে মিল থাকে। প্রাকৃতিকভাবেই শিশু এসময় শেখে কীভাবে তার সমবয়সী গোষ্ঠীর সাঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে হয়। নিজের ধ্যান-ধারণা বা অনুভূতিকে লালন করে এ সময়টা শিশুরা নিজেদের মধ্যে নিজেকে সমাজের একজন করে গড়ে তোলে। সকলে একই বয়সের হওয়ায় ও নিয়মিত মিথস্ক্রিয়ার ফলে তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরতা বা সংহতি পরিলক্ষিত হয়।

গণমাধ্যম: গোটা বিশ্বের সকল মানুষ প্রতিদিন তার কিছুটা সময় ব্যয় করে গণমাধ্যম ব্যবহার করে। আগেকার জনপ্রিয় গণমাধ্যম ছিল পত্রিকা, রেডিও, টেলিভিশন। বর্তমানের জনপ্রিয় গণমাধ্যম হলো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো। যেমন: ইউটিউব, টুইটার বা ফেসবুক। এসব গণমাধ্যম বর্তমানে সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ইন্টারনেটের সহজলভ্যতা নতুন গণমাধ্যমকে জনপ্রিয় করেছে। এ নতুন গণমাধ্যম আমাদের চিন্তা-চেতনা, মূল্যবোধ গঠন ও আচরণে সর্বব্যাপী প্রভাব ফেলছে। আমাদের বিশ্বনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলছে। এসব প্রভাব সব সময় ইতিবাচক নয়, আমরা বিভিন্ন নেতিবাচক প্রভাবও লক্ষ্য করি।

কর্মক্ষেত্র: আমরা জেনেছি যে, সামাজিকীকরণ আজীবন অব্যাহত থাকে। নতুন চাকরি শুরু করার সময় শুধু নিয়োগকর্তা কী ধরনের কাজের প্রত্যাশা করেন তা জানলেই হবে না; সেই সঙ্গে সহকর্মীদের সঙ্গে মেলামেশার মাধ্যমে মানিয়ে নেয়াও সমান গুরুত্বপূর্ণ। কর্মক্ষেত্রে নতুন রীতিনীতি ও মূল্যবোধের সমন্বয়ে একজন ব্যক্তির মাঝে সামাজিকীকরণ ঘটে থাকে। কাজের পরিবেশে বা সহকর্মীদের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য ব্যক্তি তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হয়। এভাবেই একজন ব্যক্তিকে ক্রমাগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। একইভাবে, আমরা কী ভেবে দেখেছি, আমরা কেনো পরিবার বা স্কুলের নিয়মকানুন, রীতিনীতি মেনে চলি? কখনো কী ভেবেছি এসব রীতিনীতি না মেনে চললে কী হবে? অনেক প্রশ্ন এখন হয়তো আমাদের মনে উঁকী দিচ্ছে। চলো, তাহলে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আমরা কিছু জেনে নিই।

সামাজিক নিয়ন্ত্রণ

সমাজে বসবাসরত ব্যক্তিদের চিন্তা-ভাবনা ও আচরণ নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা হলো সামাজিক নিয়ন্ত্রণ। এর ফলে সমাজের সদস্যরা কিছু প্রচলিত মূল্যবোধ, রীতিনীতি এবং রাষ্ট্রের আইন মেনে চলতে বাধ্য হয়। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ মানুষকে একই ধরনের আচরণ করতে উৎসাহ দেয়। যার ফলে সমাজের শৃঙ্খলা বজায় থাকে এবং আমাদের মধ্যে একাত্মতাবোধ তৈরি হয়।

আমরা নিজেরা যেমন সমাজের রীতিনীতি ও মূল্যবোধ মেনে চলি, তেমনি আশা করি যে অন্যরাও তা করবে। কোনো রকম ভাবনা-চিন্তা ছাড়াই আমরা প্রতিদিনকার জীবনে অসংখ্য সামাজিক নিয়ম, বিধি-বিধান ও আইন-কানুন মেনে চলি বা মানতে বাধ্য হই কারণ ব্যক্তি, দল ও প্রতিষ্ঠানসমূহ আশা করে যে, আমরা তা মেনে চলব। আর আমরা যদি তা মেনে চলি তাহলে সমাজ আমাদেরকে 'ভালো মানুষ' হিসেবে জানবে এবং এতে আমরা নানানভাবে উপকৃতও হব। আর যদি কেউ সমাজের কাঙ্ক্ষিত আচরণ না করে তাহলে মানুষ তার নিন্দা করবে এবং সেজন্য সে শাস্তিও পেতে পারে। ভালো কাজের জন্য পুরস্কার, আর 'মন্দ' কাজের জন্য শাস্তির মাধ্যমে সমাজ নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়।

মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনগুলোর ভিন্নতাকে বিবেচনা করে সামাজিক নিয়ন্ত্রণকে দুইভাগে বিভক্ত করা হয়।

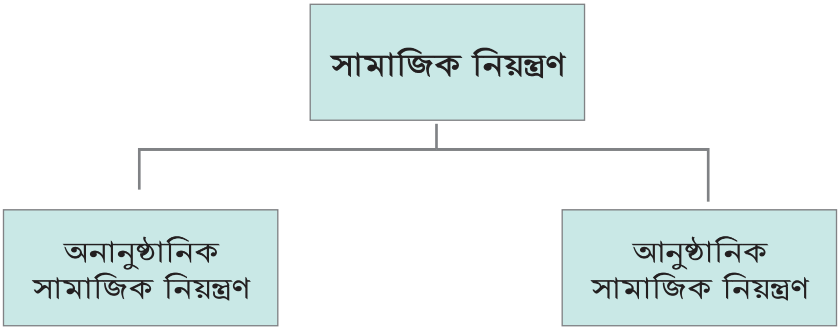

অনানুষ্ঠানিক সামাজিক নিয়ন্ত্রণ:

সমাজের রীতি-নীতি ও মূল্যবোধ না মানলে পরিবার, সমবয়সী বন্ধু বা সহপাঠীরা যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখায় তাকে আমরা অনানুষ্ঠানিক সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলি। কেউ যদি প্রচলিত নিয়ম-কানুন ও আচার-আচরণ না করে তখন পরিচিত ও অপরিচিত মানুষেরা হাসি-তামাশা, ঠাট্টা বা মস্করার মাধ্যমে তার বিরোধিতা করে। তাই আমরা কেউই চাই না আমাদের আচরণের মাধ্যমে অন্যদেরকে সমালোচনার সুযোগ দিতে।

আনুষ্ঠানিক সামাজিক নিয়ন্ত্রণ

আনুষ্ঠানিক সমাজ নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে প্রাতিষ্ঠানিক এজেন্ট যেমন পুলিশ কর্মকর্তা, বিচারক, স্কুলের প্রশাসক বা চাকরিদাতারা। যখন অনানুষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ কাজ করে না তখন আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানগুলো সমাজ নিয়ন্ত্রণে এগিয়ে আসে। সব দেশে বা সমাজেই দেখা গেছে কিছু মানুষ প্রাতিষ্ঠানিক বিধি-বিধান ও আইন-কানুন মানে না। এ ধরনের আচরণকে অপরাধ বলা হয়। কেউ অপরাধ করলে প্রচলিত আইন অনুযায়ী সমাজ নানান রকম শাস্তি দিয়ে থাকে। শাস্তি বিভিন্ন ধরনের হতে পারে যেমন: আর্থিক জরিমানা, কারাদণ্ড বা চাকরিচ্যুতি। এ সমস্ত শাস্তির ব্যবস্থা একদিকে যেমন অপরাধীদের ভবিষ্যতে বিভিন্ন অপরাধ থেকে নিবৃত রেখে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখে, আবার সুনাগরিকসহ সকল নাগরিকের জন্যও অপরাধ থেকে বিরত থাকার বার্তা দেয়।

পরিবার বিভিন্ন সামাজিক নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা পালন করে

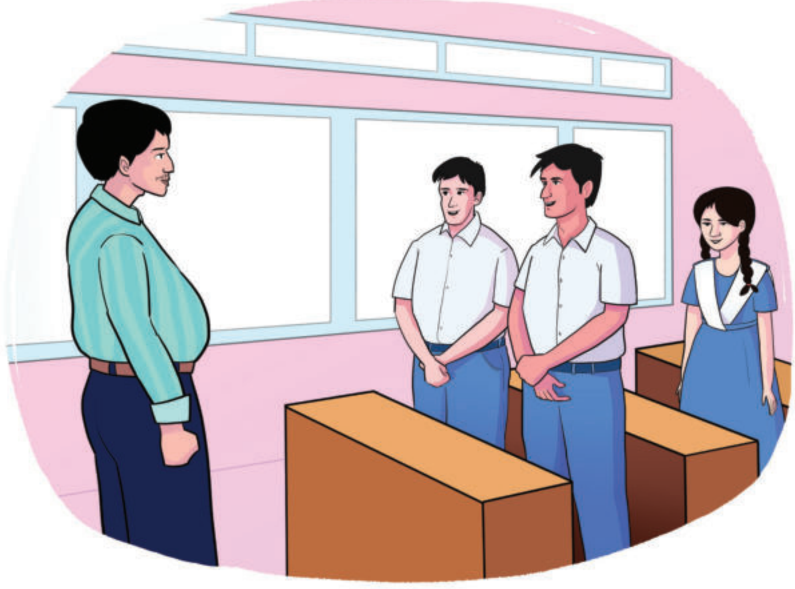

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আমাদের আচরণ নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে

সমাজ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে একটি দেশকে বিভিন্ন ইউনিটে বিভক্ত করা হয়। যেমন: বাংলাদেশকে বিভাগ, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন/পৌরসভা এবং ওয়ার্ডে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রতিটি ইউনিটে রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানগুলো সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে। মূলত সমাজে বিচ্যুত, অনাকাঙ্ক্ষিত ও সমাজবিরোধী কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সমাজজীবনে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রের এই প্রচেষ্টা।

সরকারের বিভাগসমূহ:

সরকার তিনটি বিভাগের মাধ্যমে কাজ করে—

আইন বিভাগ : আইন তৈরি ও সংশোধন করা।

শাসন বিভাগ : রাষ্ট্রের মধ্যে আইনকে প্রয়োগ করা।

বিচার বিভাগ : কেউ আইন ভঙ্গ করলে তার বিচার করা।

তবে শাসন বিভাগকে সরকারের বিভিন্ন কাজ সম্পাদনের দায়িত্ব পালন করতে হয়। সেসব কথাও তোমরা অন্য অধ্যায়ে জানতে পারবে।

সামাজিক পরিবর্তন

সমাজ স্থিতিশীল কোনোকিছু নয়, বরং সর্বদা পরিবর্তনশীল। 'সম্প্রদায় ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা' (Communal Society) ক্রমান্বয়ে পরিবর্তনের মাধ্যমেই আজকের আধুনিক 'সংঘ ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা'(Associational Society) তৈরি হয়েছে। 'সম্প্রদায়ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা'য় সদস্যদের মধ্যে সম্পর্ক ও সংহতি ছিল অত্যন্ত নিবিড় ও আন্তরিকতাপূর্ণ। সে সমাজে এক ব্যক্তির সঙ্গে অন্য ব্যক্তির পার্থক্য ছিল খুবই কম, সকলেই ছিল প্রায় একই রকম আচার-আচরণ ও চিন্তাচেতনা এবং মূল্যবোধের অধিকারী। এখানে ব্যক্তির ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষার তুলনায় সম্প্রদায়ের মঙ্গল ও ইচ্ছাকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়। এই সম্প্রদায়গুলো পরিবারের মতো কাজ করে। এখানে কোনো ব্যক্তি বা পরিবারের মধ্যে সংকট তৈরি হলে পুরো সমাজের মধ্যে তা ছড়িয়ে যায় এবং সম্প্রদায়ের কল্যাণে সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় সেটি সমাধানের চেষ্টা করা হয়।

'সম্প্রদায়ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা'র বৈশিষ্ট্যগুলো পরিবর্তিত হয়ে তৈরি হয়েছে আধুনিক 'সংঘভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা'। এটি সম্প্রদায়ভিত্তিক সমাজের বিপরীত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এই সমাজ ব্যবস্থায় সদস্যদের মধ্যে চিন্তায়, আচরণে, মূল্যবোধে তেমন মিল নেই। এই ধরনের সমাজের সদস্যরা যতটা তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনের ওপর গুরুত্ব দিয়ে থাকে, ততটা সমাজের মঙ্গলের দিকে নয়।

সামাজিক পরিবর্তন বিভিন্ন কারণে হয়ে থাকে। সাংস্কৃতিক পরিবর্তন হল সমাজ পরিবর্তনের অন্যতম কারণ। সময়ের পরিবর্তনের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক উপাদানগুলোরও (প্রযুক্তি, মূল্যবোধ ইত্যাদি) পরিবর্তন সাধিত হয় যার ফলে সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেও পরিবর্তন আসে। পরিবর্তন সব সময় ইতিবাচক নাও হতে পারে, সংস্কৃতির উপাদানগুলোর নেতিবাচক পরিবর্তনের কারণে সমাজের সমস্যা বা অবক্ষয় সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে। আবার সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে জনসংখ্যার আকার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানের নব নব উদ্ভাবনের ফলে একদিকে যেমন মাতৃ ও শিশু মৃত্যুহার কমেছে, আবার মানুষের গড় আয়ু বেড়েছে। জনসংখ্যার তারতম্যের ওপর সামাজিক পরিবর্তন নির্ভর করে। নতুন ধারণাও সমাজ পরিবর্তনে ভূমিকা পালন করে।

বাংলাদেশের সমাজ পরিবর্তন

বাংলাদেশেও সমাজকাঠামোতে পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। সমাজকাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ উপাদান পরিবারে আমরা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করি। এক সময় আমাদের দেশে যৌথ পরিবারের প্রাধান্য ছিল। কিন্তু যৌথ পরিবার আস্তে আস্তে একক পরিবারে রূপান্তরিত হচ্ছে। সেই সঙ্গে পরিবারের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশি নারীর মতামতও গুরুত্ব পাচ্ছে। আগে পরিবারের অর্থনৈতিক দিক দেখাশোনা করত পুরুষরা, এখন পুরুষদের পাশাপাশি নারীরা নানান পেশায় জড়িত হচ্ছে। আমাদের গার্মেন্টস শিল্পের অধিকাংশ শ্রমিকই নারী, তাঁরা প্রাপ্ত উপার্জন দিয়ে পরিবারের প্রয়োজন মেটাচ্ছে। এ ছাড়াও অফিস-আদালত থেকে শুরু করে ব্যবসা-বাণিজ্য সকল ক্ষেত্রে নারীরা এগিয়ে যাচ্ছে। সামজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিবার কাঠামোর এই পরিবর্তন মূলত সমাজ পরিবর্তনের অংশ।

সমাজ কাঠামোর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো, আমাদের দেশে যার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। গত কয়েক দশকে বাংলাদেশের কৃষিনির্ভর অর্থনীতি রূপান্তরিত হয়ে শিল্পনির্ভর হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ১৯৯০ সালে মোট দেশজ উৎপাদন (Gross Domestic Product) বা জিডিপিতে কৃষির অবদান ৩৩ শতাংশ থেকে কমে প্রায় ১৩ শতাংশ হয়েছে, অন্যদিকে জিডিপিতে শিল্পের অংশ ২১ শতাংশ থেকে বেড়ে প্রায় ৩০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। ফলে একদিকে যেমন কৃষিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা বিভিন্ন দল বা প্রতিষ্ঠান ক্রমে সংকুচিত হয়েছে, অন্যদিকে শহরের আয়তন বৃদ্ধি পেয়েছে, সেইসঙ্গে এখানে নতুন নতুন দল ও প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে ফলে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের পরিবর্তন হয়ে চলেছে। তাছাড়া দিনে দিনে বিদেশের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যোগাযোগের প্রভাব পড়েছে আমাদের খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, শিক্ষা ও অন্যান্য কর্মকাণ্ডে।

সামাজিক পরিবর্তনের উল্লেখযোগ্য কারণ হল দ্বন্দ্ব-সংঘাত, আন্দোলন-সংগ্রাম। সমাজের মানুষ নানান শ্রেণিতে বিভক্ত এবং এ শ্রেণিগুলির মাঝে দ্বন্দ্বের কারণে সমাজের পরিবর্তন হয়। বিভিন্ন শ্রেণির ভেতর দ্বন্দ্বের কারণ হলো অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈষম্য। দ্বন্দ্বের ফলে বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পূর্ণ রূপে ভেঙে পড়ে এবং নতুন সমাজব্যবস্থা বিকাশের পথ খুলে যায়।

ইতিহাসে আমরা অহিংস সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের উদাহরণ দেখতে পাই। সেসব আন্দোলনে আমরা ভারতের মহাত্মা গান্ধী ও যুক্তরাষ্ট্রের মার্টিন লুথার কীং জুনিয়ারের মত কিছু নেতার অসামান্য অবদান দেখতে পাই।

আমরা অনেকেই হয়তো মীনা কার্টুন দেখেছি। মীনা তার বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা দিয়ে অনেক সামাজিক সচেতনতামূলক কাজ করেছে। নিজের এলাকার মানুষের অনেক প্রচলিত রীতি-নীতি ও অভ্যাস পরিবর্তনে ভূমিকা রেখেছে। আমরা মীনার একটি ঘটনার সারসংক্ষেপ সম্পর্কে জেনে নিই।

মীনার পরিচিত বড়োবোন তারাবু'র বিয়ে ঠিক করেছে, তার মা-বাবা। ছেলে শহর থেকে আসা দোকানদারের ভাইয়ের ছেলে। দোকানদার, তার ভাই ও ভাইয়ের ছেলে মিলে ঠিক করল বিয়েতে যৌতুক নেবে। গ্রামের মানুষ তখনো যৌতুক বন্ধের আইন সম্পর্কে জানে না। তাই তারা পরিকল্পনা করে বিয়ের আগে চাইবে সাইকেল, বিয়ের পরে চাইবে মোটরসাইকেল। তাঁদের এই পরিকল্পনার কথা জেনে যায় মীনার পোষা পাখি মিঠু। মিঠুর কাছ থেকে এটা জেনে মীনা ও রাজু তারাবু ও তার মা-বাবার কাছে এই তথ্য দেয়। তারা সবাই মিলে গ্রামের মাতবারের কাছে এই বিষয়ে জানতে চায়। মাতবার জানান যৌতুক দেওয়া ও নেওয়া দুটোই অপরাধ। তাই গ্রামের সবাই মিলে ঠিক করে, যৌতুক চায় এমন কোনো ছেলের সঙ্গে তাঁদের বিয়ের যোগ্য কোনো মেয়েকে বিয়ে দেবে না। যৌতুক না পেয়ে শহর থেকে আসা এই ছেলে বিয়ে না করেই শহরে ফিরে যায়।

মিনা কার্টুন (যৌতুক)

আমরা একটু চিন্তা করলেই হয়তো বুঝতে পারব সমাজে প্রচলিত, যৌতুকপ্রথা বন্ধে মীনা গ্রামবাসীর সহায়তায় কীভাবে সফলভাবে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলে গ্রামবাসীর মধ্যে সচেতনতা গড়ে তুলেছিল। যদিও এটি একটি গল্প। আমরা এমন কয়েকজন ব্যক্তি সম্পর্কে জেনে নিই যাঁরা সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলে প্রচলিত রীতিনীতি ও প্রথা পরিবর্তনে ভূমিকা রেখেছেন।

সামাজিক আন্দোলন

সামাজিক আন্দোলন হলো একটি সম্মিলিত প্রচেষ্টা যার মাধ্যমে সমাজ, রাষ্ট্র বা দেশের বিদ্যমান সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের চেষ্টা করা হয়। সামাজিক আন্দোলনের উৎপত্তি হয় সমাজে বিদ্যমান কোনো অসংগীতি বা বৈষম্যের প্রতি অসন্তুষ্টির ফলে। সুতরাং বলা যায়, বিদ্যমান সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন সাধন, অসংগীতি ও অসন্তোষ দূরীকরণ এবং শৃঙ্খলা আনয়নে মানুষের সচেতন ও সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টাই সামাজিক আন্দোলন।

সামাজিক আন্দোলনের মধ্য দিয়েই ব্রিটিশ ভারতে রাজা রামমোহন রায়ের নেতৃত্বে সতীদাহ প্রথা রোধ, ঈশ্বরচন্দ্র

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় বিধবা বিবাহের প্রচলন হয়েছিল। পরবর্তী নারীশিক্ষা বিস্তার, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন বিলোপ ইত্যাদির পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বর্তমানে পৃথিবীর নানা প্রান্তে গণতন্ত্র, সুশাসন, মানবাধিকার, নারীর ক্ষমতায়ন, পরিবেশ রক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে সামজিক আন্দোলন চলমান রয়েছে।

এ পর্যায়ে আমরা কিছু সামাজিক আন্দোলন সম্পর্কে জানব, যেগুলো বিভিন্ন সময় বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, এবং সামাজিক পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

মার্টিন লুথার কীং এর বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলন

যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত মানবাধিকার নেতা মার্টিন লুথার কীং জুনিয়র সারা জীবন বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে ও কৃষ্ণাঙ্গদের সম-অধিকার আদায়ে লড়াই করে গেছেন। তাঁর নেতৃত্বে আমেরিকায় কৃষ্ণাঙ্গদের অধিকার প্রতিষ্ঠা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে ১৯৫৫ সালে কীং ব্যাপটিস্ট চার্চের যাজক হিসেবে যোগদান করেন। এরপর তিনি সরাসরি কৃষ্ণাঙ্গদের অধিকার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। সে বছরই মন্টোগোমারিতে শুরু হয় ঐতিহাসিক বাস ধর্মঘট, যার সূত্রপাত হয় বাসের আসন বরাদ্দকে কেন্দ্র করে। যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণের অধিকাংশ রাজ্যেই বাসের সামনের দিকে বসার অধিকার ছিল না কৃষ্ণাঙ্গদের। শ্বেতাঙ্গ যাত্রী উঠলে কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য সংরক্ষিত আসন ছেড়ে দিতে হতো। কিন্তু এই নিয়ম মানতে অস্বীকার করলেন কৃষ্ণাঙ্গ নারী রোজা পার্কস। যা ছিল তৎকালীন আইনের লঙ্ঘন। রোজাকে থানায় নিয়ে ১০ ডলার জরিমানা করা হয়। এই ঘটনার প্রতিবাদে লুথার কীং ও অন্য কৃষ্ণাঙ্গ ধর্মযাজকেরা বাস সার্ভিস বর্জনের সিদ্ধান্ত নেন। টানা ৩৮১ দিন নানা প্রতিকূলতার পরেও কৃষ্ণাঙ্গদের সরকারি বাস বয়কট চলতে থাকলে সুপ্রিম কোর্ট বাসের আসন বন্টনের এই বর্ণবৈষম্যমূলক ব্যবস্থাকে সংবিধানবিরোধী বলে ঘোষণা করেন। অবশেষে বাসে সবার বসার সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে গোটা আমেরিকায়। তাঁর এই অহিংস আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানাতে এগিয়ে আসেন বহু কৃষ্ণাঙ্গ নেতা। আমেরিকা জুড়েই বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জেগে উঠতে থাকে। এর ধারাবাহিকতায় কীং ১৯৬৩ সালে সরকারের নেওয়া বৈষম্যমূলক আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন ঘোষণা করেন। এর মূল লক্ষ্য ছিল কৃষ্ণাঙ্গদের শ্বেতাঙ্গদের সমান অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিধা দিতে হবে এবং শিশুশ্রম বন্ধ করতে হবে।

মার্টিন লুথার কীং

এক শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ সমাবেশে আলাবামার পুলিশ সমবেত জনতার ওপর দমনমূলক নিপীড়ন চালায়। মার্টিন লুথার কীংসহ আরও অনেকে সে সময় গ্রেপ্তার হন। এই ঘটনা বিশ্বজুড়ে ব্যাপক সাড়া জাগায়। এরপর তিনি স্থির করেন, দেশজুড়ে শুরু করবেন ফ্রিডম মার্চ। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শুরু হয় ওয়াশিংটন অভিমুখে পদযাত্রা। ১৯৬৩ সালের ২৭ আগস্ট ওয়াশিংটনের লিঙ্কন মেমোরিয়ালে সমবেত হয় আড়াই লাখের বেশি মানুষ। তাঁদের সামনে ঐতিহাসিক ভাষণ দিলেন কীং, 'আমার একটি স্বপ্ন আছে' (আই হ্যাভ আ ড্রিম)। ভাষণে তিনি বলেন, কীভাবে বর্ণবৈষম্য গোটা জাতিকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। তিনি তুলে ধরেন ভবিষ্যতের আমেরিকা নিয়ে তাঁর আশাবাদ। যেখানে সব আমেরিকান হবে সমান। এটাই হবে সত্যিকারের স্বপ্নের আমেরিকা।

তাঁর স্বপ্নের কিছু দিক এভাবে তিনি উল্লেখ করেন- 'বন্ধুরা, আজ আমি আপনাদের বলছি, বর্তমানের প্রতিকূলতা ও বাধা সত্ত্বেও আমি আজও স্বপ্ন দেখি। আমার এই স্বপ্ন আমেরিকান স্বপ্নের গভীরে শিকড়বদ্ধ। আমি স্বপ্ন দেখি, একদিন এ জাতি জাগবে এবং তারা বাঁচিয়ে রাখবে এই বিশ্বাস যে আমরা সকল আমেরিকান স্বতঃসিদ্ধ ভাবে এই সত্যকে গ্রহণ করেছি যে, সব মানুষ সমান। আমি স্বপ্ন দেখি, একদিন জর্জিয়ার লাল পাহাড়ে সাবেক দাস আর সাবেক দাস মালিকের সন্তানেরা ভ্রাতৃত্বের এক টেবিলে বসতে সক্ষম হবে। আমি স্বপ্ন দেখি, একদিন মরূময় মিসিসিপি রাজ্য অবিচার আর নিপীড়নের ব্যবস্থা বন্ধ করে মিসিসিপি হয়ে উঠবে মুক্তি আর সুবিচারের মরুদ্যান। আমি স্বপ্ন দেখি, আমার চার সন্তান একদিন এমন এক জাতের মধ্যে বাস করবে, যেখানে তাঁদের চামড়ার রং দিয়ে নয়, তাঁদের চরিত্রের গুণ দিয়ে তারা মূল্যায়িত হবে। আমি আজ এই স্বপ্ন দেখি। আমি স্বপ্ন দেখি, একদিন আলাবামা রাজ্যে, যেখানে গভর্নরের ঠোঁট থেকে কেবলই বাধা-নিষেধ আর গঞ্জনার বাণী ঝরে, সেখানকার পরিস্থিতি এমনভাবে বদলে যাবে যে, কালো-ধলো যাই হোক বালকেরা-বালিকাদের সঙ্গে ভাইবোনের মতো হাত ধরাধরি করবে। আমি আজ এই স্বপ্ন দেখি।' তাঁর এই বিখ্যাত ভাষণের প্রভাবেই কৃষ্ণাঙ্গদের অধিকার স্বীকৃতি দিয়ে ১৯৬৪ সালে আমেরিকায় নাগরিক অধিকার আইন ও ১৯৬৫ সালে ভোটাধিকার আইন প্রণয়ন করা হয়। সেই বছর টাইমস পত্রিকা কীংকে বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হিসেবে 'ম্যান অব দ্য ইয়ার' পুরস্কার দেয়। মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অবিস্মরণীয় অবদানের জন্য কীং ১৯৬৪ সালে মাত্র ৩৫ বছর বয়সেই শান্তিতে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন।

মার্টিন লুথার কীং সম্পর্কে দুটি কথা জানা প্রয়োজন। অহিংস অসহেযাগ আন্দোলনের ধারণা তিনি পেয়েছিলেন ভারতীয় উপমহাদেশের বিখ্যাত রাজনীতিবিদ মাহাত্মা গান্ধীর কাছ থেকে। দ্বিতীয় কথাটি দুঃখের, ১৯৬৮ সালে কীং আততায়ীর হাতে নিহত হয়েছিলেন।

আমরা একটু ভেবে দেখলে দেখব বিদ্যালয়, পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ইত্যাদি মাধ্যমে আমরা একদিকে যেমন প্রচলিত রীতিনীতি ও মূল্যবোধ চর্চা শিখি। অন্যদিকে সমাজের অর্থনৈতিক, সামাজিক বা রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন অথবা সামাজিক আন্দোলন ইত্যাদি প্রক্রিয়ায় সমাজের এই প্রচলিত রীতিনীতি ও মূল্যবোধেরও পরিবর্তন হতে পারে। তাই প্রচলিত রীতিনীতি ও মূল্যবোধ সামাজিক কাঠামোর ওপর প্রভাব ফেলে, সেইসঙ্গে সামাজিক কাঠামো রীতিনীতি ও মূল্যবোধকে নিয়ন্ত্রণ করে।

আমরা বিদ্যালয় থেকে নানান সময় বিভিন্ন সমাজ বা দেশ বা রাষ্ট্রের প্রচলিত রীতিনীতি ও মূল্যবোধ সম্পর্কে জেনেছি। এখন আমরা এমন কয়েকটি রীতিনীতি ও মূল্যবোধের তালিকা তৈরি করব। এই জন্য আমরা এই শিখন অভিজ্ঞতার শুরুতে যে দলটি গঠন করেছি সেই দলেই আবার বসে যাব।

দলগত কাজ ২:

এখন আমরা দলগতভাবে আলোচনা করে নিচের তালিকাটি পূরণ করি। এজন্য আমরা বিদ্যালয়ের পাঠাগার থেকে শুদ্ধাচার বইটি সংগ্রহ করে নিতে পারি।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

যে যে প্রচলিত রীতিনীতি ও মূল্যবোধ সম্পর্কে আমরা বিদ্যালয় থেকে জানতে পেরেছি:

●
●
●
●
●
●

এখন আমরা দলে আলোচনা করে নির্ণয় করি এই রীতিনীতি ও মূল্যবোধগুলোর কোনগুলো আমাদের সমাজে প্রচলিত নয়। এর মধ্যে কোনো রীতিনীতি ও মূল্যবোধ আমাদের সমাজেও থাকা প্রয়োজন। নির্ধারিত এই রীতিনীতি ও মূল্যবোধগুলো আমরা পরিবার, বিদ্যালয় ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কীভাবে চর্চা করতে পারি তা দলে আলোচনা করে লিখে রাখি। এরপর আমরা প্রতি দল থেকে ১-২ জন উপস্থাপন করব। সব দলের উপস্থাপনা শেষে সবার মতামতের ভিত্তিতে কয়েকটি রীতিনীতি ও মূল্যবোধ নির্ধারণ করি।

এই রীতিনীতি ও মূল্যবোধ কোনো কোনো মাধ্যমে এবং কীভাবে চর্চা করতে পারি তার একটি গাইডলাইন তৈরি করি। এই গাইড লাইন অনুসারে সক্রিয় নাগরিক ক্লাবের মাধ্যমে আমরা সারা বছর রীতিনীতি ও মূল্যবোধ চর্চার কাজটি করব।

অনুশীলনী: গাইড লাইন

নির্ধারিত রীতিনীতি ও মূল্যবোধ	কোথায় চর্চা করব	কীভাবে চর্চা করব

আমরা খেয়াল করলে দেখব বিদ্যালয়ে যেমন সমাজের প্রচলিত ও মূল্যবোধ চর্চা হয় তেমনি বিদ্যালয় নতুন রীতিনীতি ও মূল্যবোধ গঠন ও প্রচলিত রীতিনীতি ও মূল্যবোধ পরিবর্তনেও ভূমিকা রাখে। এভাবেই সামাজিক কাঠামোর ওপর প্রচলিত রীতিনীতি ও মূল্যবোধের প্রভাব রয়েছে। সেই সঙ্গে সামাজিক কাঠামো এই রীতিনীতি ও মূল্যবোধকে নিয়ন্ত্রিত করে।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন ও ব্যক্তির ভূমিকা

আমাদের চারপাশে প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে কতই না পরিবর্তন। কোনো কোনো সময় সেসকল পরিবর্তন হয় প্রাকৃতিক কাঠামোতে আবার কখনো রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর ওপর। এসকল পরিবর্তন প্রভাব ফেলছে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে। আমরা এসকল পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে গিয়ে নিজেদের অবস্থান ও ভূমিকারও বদল ঘটাই। এই শিখন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমরা সময়ের সঙ্গে আমাদের এলাকার, দেশের সর্বোপরি বৈশ্বিকভাবে সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তনের পাশাপাশি ব্যক্তির অবস্থান ও ভূমিকায় কী ধরনের প্রভাব পড়ে তার সামগ্রীক চিত্র অনুসন্ধান করবো।

সময়ের সঙ্গে এলাকার সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন অনুসন্ধান

আমরা তো দেখি সময়ের সঙ্গে আমাদের এলাকার অনেক কিছু বদলে যায়। চলো এখন আমরা এরকমই একটা বিষয়ে অনুসন্ধান করি।

আমরা আমাদের এলাকার ২০ বছরের বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন, কেন হলো এসকল পরিবর্তন এবং এসকল পরিবর্তনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কে অনুসন্ধান করব। কাজটি করার জন্য আমরা এলাকাভিত্তিক ৫-৬ জনের দল তৈরি করে নিচে দেওয়া ছকের মতো করে একটি ছক তৈরি করে নিয়ে করব।

আমার এলাকার পরিবর্তন অনুসন্ধান		
বিগত ২০ বছরের এলাকার যে যে পরিবর্তন হয়েছে	কেনো প্রয়োজন হলো এসকল পরিবর্তন	এসকল পরিবর্তনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিবর্গ

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

অনুসন্ধানী কাজ

নমুনা প্রশ্ন:

১. এলাকার পারিবারিক কাঠামো ২০ বছর আগে কেমন ছিল?

২. এলাকার পারিবারিক কাঠামো এখন কেমন?

৩. যদি কোনো পরিবর্তন হয়ে থাকে, পরিবর্তনের কারণগুলো কী কী?

৪. এলাকার উন্নয়ন মূলক কাজের ধরন ২০ বছর আগে কেমন ছিলো?

৫. এলাকার উন্নয়ন মূলক কাজের ধরন এখন কেমন?

৬. যদি কোনো পরিবর্তন হয়ে থাকে, পরিবর্তনের কারণগুলো কী কী?

....

....

....

....

এলাকার বয়স্কদের কাছ থেকে তথ্য নিয়ে নিচের চার্টটি পূরণ করে উপস্থাপন করব।

এলাকার সামাজিক পরিবর্তন	এলাকার রাজনৈতিক পরিবর্তন	পরিবর্তনে যুক্ত ব্যক্তিবর্গ

সময়ের সঙ্গে বৈশ্বিকভাবে সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তনের ওপর ব্যক্তির অবস্থান ও ভূমিকার প্রভাব অনুসন্ধান

আমরা নিজ এলাকার সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন সম্পর্কে অনুসন্ধান করেছি। নিশ্চয়ই এই ধরনের পরিবর্তন বিশ্বব্যাপী হয়ে আসছে এবং হচ্ছে। এখন আমরা আমাদের পূর্বের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে বৈশ্বিক পরিসরে সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন এবং এসকল পরিবর্তনের ফলে সেসকল স্থানের ব্যক্তিবর্গের অবস্থান ও ভূমিকার যে ধরনের পরিবর্তন হয় তা অনুসন্ধান করে বের করবো।

- কাজটি করার জন্য প্রথমে আমরা ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বইয়ের প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন ও ব্যক্তির ভূমিকা ও বিশ্ব প্রেক্ষাপটে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বৈচিত্র্যময় গতিপথ উক্ত শিখন অভিজ্ঞতা দুটি খুব ভালোভাবে পড়বো।
- এরপর উক্ত শিখন অভিজ্ঞতা দুটি এবং অন্যান্য উৎসের সাহায্যে দলে বসে সামাজিক প্রেক্ষাপেটের পরিবর্তন. রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন এবং উক্ত পরিবর্তনের সেসময়ের মানুষের অবস্থান ও ভূমিকা অনুসন্ধান করব।
- অনুসন্ধান হতে প্রাপ্ত তথ্য আমরা নিচে তৈরি ছকের মতো করে বিশ্লেষণ করবো।

প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন	ব্যক্তির অবস্থান ও ভূমিকা
সামাজিক	
রাজনৈতিক	

আমরা তো অনেকভাবেই আমাদের অনুসন্ধান হতে প্রাপ্ত ফলাফল উপস্থাপন করেছি, এবার একটি বিতর্ক সভার আয়োজন করে আমাদের বিশ্লেষণকৃত তথ্য ও অভিজ্ঞতা উপস্থাপন করবো। বিতর্কের বিষয় এমন হতে পারে-

১. শুধুমাত্র সামাজিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তনই ব্যক্তির অবস্থান ও ভূমিকার ওপর প্রভাব ফেলে (পক্ষে/বিপক্ষে)

২.শুধুমাত্র রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তনই ব্যক্তির অবস্থান ও ভূমিকার ওপর প্রভাব ফেলে (পক্ষে/বিপক্ষে)

তোমরা কী খেয়াল করেছ পুলিশ, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনীতেও মেয়েদের অংশগ্রহণ বাড়ছে। এমনকী জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনীর সদস্য হিসেবেও অনেক মেয়ে বিশ্বের বিভিন্ন যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে কাজ করছেন। তাঁরাও দেশের জন্য গৌরব বয়ে আনছেন।
বলা যায়, আজ পুরুষের পাশাপাশি নারীরা কর্মজগতে প্রবেশ করতে শুরু করেছেন। পরিবারে উপার্জনশীল নারীর কেবল মর্যাদা বাড়ে না তাঁদের ভূমিকার গুরুত্বও বাড়ে। তাঁরা সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ নিচ্ছেন। সমাজবিজ্ঞানের ভাষায়, একে নারীর ক্ষমতায়ন বলা হয়।

অনুশীলনী কাজ

আমরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে ক্ষমতায়নের ফলে নারীর ভূমিকায় কী কী পরিবর্তন আসতে পারে নিচের দৃষ্টান্ত অনুযায়ী তার একটি তালিকা করি —

পল্লীকবি জসীমউদ্‌দীন একটি কবিতা ছোটোবেলায় সবাই পড়েছ। প্রথম দুটি পংক্তি বললেই মনে পড়ে যাবে

'রাখাল ছেলে! রাখাল ছেলে! বারেক ফিরে চাও,
বাঁকা গাঁয়ের পথটি বেয়ে কোথায় চলে যাও?'

এ কবিতার প্রসঙ্গ আসার আগেই একটি প্রশ্ন করি। ইদানীং গ্রামের জীবনে আরও অনেক ধরনের পরিবর্তন কী লক্ষ্য করছ তোমরা? করছ না? একটু খেয়াল করে কৃষিজমি বা লোকালয়ে তাকালে দেখবে অনেক পরিবর্তন। গরু দিয়ে লাঙলের চাষ কমে এসেছে। বেশির ভাগ কৃষিজমি চাষের কাজে ব্যবহার করা হয় টিলার ও ট্রাক্টর। এতে দ্রুত চাষ হয়। তাতে চূড়ান্ত বিচারে খরচ কম পড়ে। মানুষ এবং পশুর প্রচন্ড- পরিশ্রমও আর প্রয়োজন হয় না। কাজের ধরন পাল্টেছে। ধান কাটা ও মাড়াইয়ের কাজেও ধীরে ধীরে যন্ত্রের ব্যবহার বাড়ছে। কাস্তে নিয়ে রোদে-জলে পুড়ে আর ধান কাটতে হবে না। এ যন্ত্রের নাম কম্বাইন্ড হারভেস্টার। এভাবে কৃষি কাজে অনেক যন্ত্রপাতির ব্যবহার যেমন বেড়েছে তেমনি বাড়ছে সেচ, সার ও কীটনাশকের ব্যবহার। কৃষিজমি মজুরদের কাজ কমে যাওয়ায় - তারা ধীরে ধীরে রিক্সা চালানো, নির্মাণকাজ, ফেরিওয়ালার কাজ ইত্যাদি নানা কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ছে। আগের তুলনায় জমিতে যেমন ফসলের পরিমাণ বাড়ছে, বছরে এক ফসলের বদলে তিন ফসল হচ্ছে তেমনি উৎপাদিত পণ্যেরও বৈচিত্র্য বেড়েছে। আজ বাংলাদেশ শাক-সবজি, বিভিন্ন ফল, মাছ, ডিম ইত্যাদি চাষ ও উৎপাদনে বিশ্বের অগ্রণী দেশের মধ্যে একটি। এসবের সরবরাহ ও বিপণন ঘিরেও অনেক কাজ তৈরি হচ্ছে। বলা যায়, গ্রামের মানুষ আর আগের মতো কেবল কৃষিকাজ বা ধান চাষই করে না, তাঁদের চাষ যেমন বৈচিত্র্যময়, তেমনি কাজের ধরন বিচিত্র রকম হয়েছে।

ওই যে বলেছিলাম জসীমউদ্‌দীনের কবিতার কথা। সেই রাখাল বালকরা এখন হারিয়ে যাচ্ছে। খামারে যেভাবে গরু লালন করা হয়, তাতে আর মাঠে মাঠে চারণের কাজ নেই। বাঁশি বাজিয়ে গরু চরিয়ে কেউ আর জীবন কাটাচ্ছে না। তোমাদের মতো কিশোররা এখন লেখাপড়া করছে। যদিও অনেকে এখনো কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় বাংলাদেশে এখনো প্রায় ৩০ লাখ শিশু শ্রমিক রয়েছে। সরকার অবশ্য তাঁদেরও পড়ালেখার মধ্যে নিয়ে আসার কার্যক্রম হাতে নিচ্ছে।

একবার ভেবে দেখো তো স্বাধীনতার পর থেকে আমাদের গ্রামীণ সমাজে কত ধরনের পরিবর্তন এসেছে। তোমরা তো জানোই যে, আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী—যিনি হলেন সরকার প্রধান, একজন নারী। সপ্তম শ্রেণির বইতে তোমরা দেখেছ জাতীয় সংসদের স্পিকারও একজন নারী। শিক্ষামন্ত্রী নারী, এমনকী শ্রমমন্ত্রীও নারী। এছাড়া সংসদের উপনেতাও একজন নারী।

কেউ কেউ নিশ্চয় লক্ষ্য করেছ যে, উপজেলা পরিষদে নারী ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। এছাড়া ইউনিয়ন পরিষদে নারীরা সদস্য নির্বাচিত হন। একইভাবে শহরের কর্পোরেশনগুলোতেও নারীদের অংশগ্রহণ বাড়ছে।

দেখা যাচ্ছে, সামাজিক কাঠামোতে যেমন পরিবর্তন ঘটে, তেমনি রাজনৈতিক কাঠামোতেও পরিবর্তন ঘটে। নারীর অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়নের মাধ্যমে সমাজের মতই রাজনৈতিক অঙ্গানেও পরিবর্তন ঘটছে। এটি অবশ্য পরিবর্তনের একটি দৃষ্টান্ত।

অনুশীলনী কাজ

এবার শিক্ষকের সহায়তা নিয়ে আমরা এ দুই ক্ষেত্রে পরিবর্তনের আরও আরও কারণ খুঁজে বের করতে পারি। আমরা তো জানি, পরিবারের বয়স্কজনদের সঙ্গে আলাপ করলে অনেক পুরোনো তথ্য পাওয়া যাবে।

গত ৩০-৪০ বছরে সমাজ ও রাজনৈতিক অঙ্গনে ঘটে যাওয়া পরিবর্তনের চিত্র:

ক্ষেত্র	পূর্ববর্তী অবস্থা	বর্তমান পরিবর্তন
নারীর অংশগ্রহণ		
প্রতিনিধিত্বের ধরন		
ভূমিকা		
অবদান		
রাষ্ট্রীয়/সামাজিক স্বীকৃতি		
গ্রহণযোগ্যতা		

রাষ্ট্রের ধারণা

অধ্যাপক গার্নারের মতে, রাষ্ট্র হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাসকারী অনেক ব্যক্তি নিয়ে গঠিত একটি জনসমাজ, যা বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত, রাষ্ট্রের একটি সুগঠিত সরকার থাকবে এবং এর নিয়ম-কানুন জনগণ মেনে চলবে।

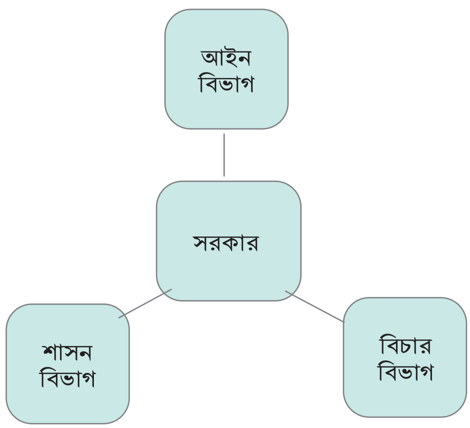

তোমরা পূর্বের শ্রেণিতে এ সম্পর্কে বিস্তারিত জেনেছ।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মূলনীতি চারটি

১৯৭২ সালে গণপরিষদে গৃহীত সংবিধানে ৪টি মূলনীতির কথা বলা হয়েছে — জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র।

১. জাতীয়তাবাদ: বাংলা ভাষা, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও বাঙালি জাতিগত পরিচয়ে জাতীয় ঐক্য গঠিত হয়। তাই সংবিধানে বলা হয়েছে, একই ভাষা ও সংস্কৃতিতে আবদ্ধ বাঙালি জাতি যে ঐক্যবদ্ধ ও সংকল্পবদ্ধ সংগ্রাম করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করেছে, সেই ঐক্য ও সংহতি হবে বাঙালি জাতীয়তাবদের ভিত্তি।

২. সমাজতন্ত্র: অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমতা আনার মাধ্যমে সবার জন্য সমান সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা সমাজতন্ত্রের মূল লক্ষ্য।

৩. গণতন্ত্র: রাষ্ট্রের সকল কাজে নাগরিকের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করাই হলো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মূলনীতি।

৪. ধর্মনিরপেক্ষতা: রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি মানুষ স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে এবং ধর্ম পালনে কেউ কাউকে বাঁধা প্রদান করবে না - এই লক্ষ্য সামনে রেখে ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রের মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার পরে সংবিধানের মূলনীতিতে কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যাখ্যায় যদিও সকল ধর্মের মানুষের নিজ নিজ ধর্ম পালনে সম-অধিকারের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছিল তবুও তৎকালীন সরকার সংবিধান পরিবর্তন করে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্মীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়। তখন ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করা হয়, যদিও বহু ধর্মের মানুষের দেশে রাষ্ট্রের এরকম ধর্মীয় পরিচয় হতে পারে কী না, অনেকেই সে প্রশ্ন তোলেন। এছাড়া সমাজতন্ত্রের বদলে সামাজিক সুবিচারের কথা বলা হয়। এ সময় নাগরিক পরিচয়ের ক্ষেত্রে বাংলাদেশি কথাটিও যোগ করা হয়। আরও পরে দেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষের পরিচয়ের স্বীকৃতি দেয় রাষ্ট্র।

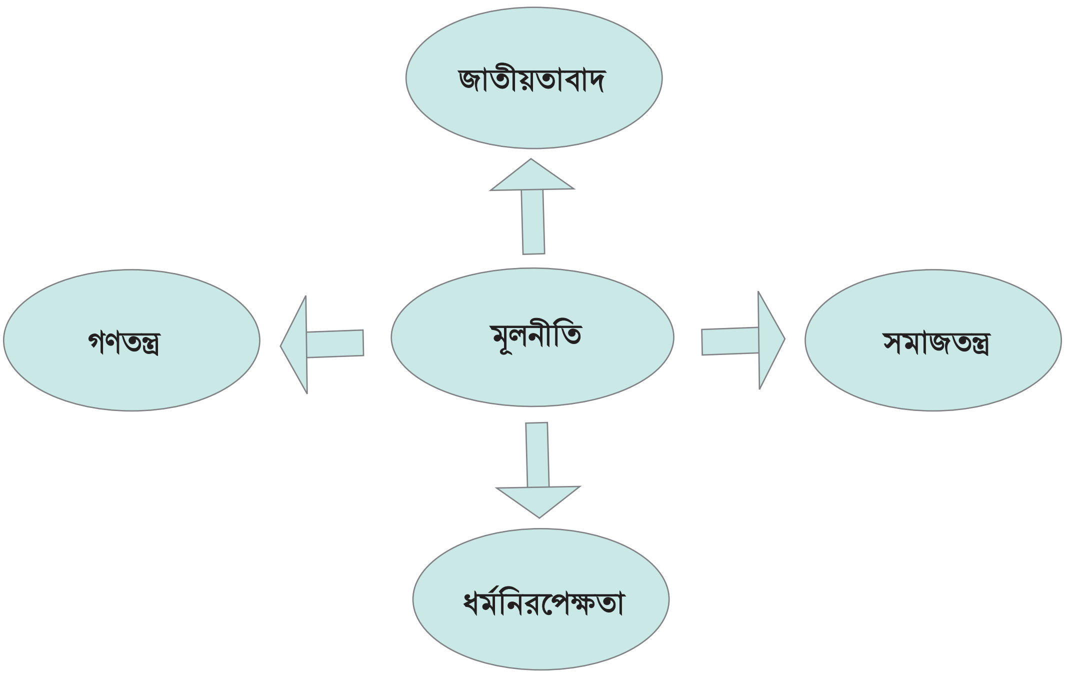

সংবিধানের প্রকারভেদ

সংবিধান হচ্ছে রাষ্ট্রের দর্পণস্বরূপ। একটি রাষ্ট্র পরিচালনায় কিছু নীতিমালা থাকার প্রয়োজন। কোনো কোনো রাষ্ট্রের সংবিধানে এই নীতিমালা পরিবর্তন বা সংশোধন করা যায়। আবার কোনো কোনো রাষ্ট্রে এটা অপরিবর্তনীয়। কোনো কোনো রাষ্ট্রে নীতিমালা লিখিত আকারে থাকে। কোনো কোনো রাষ্ট্রে থাকে অলিখিত আকারে।

বাংলাদেশ, ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া প্রভৃতিসহ বিশ্বের প্রায় সব দেশেরই সংবিধান লিখিত। এরূপ সংবিধান রচিত হয় দেশের বিশিষ্ট জ্ঞানী-গুণী ও প্রজ্ঞাবান রাজনীতিবিদদের মাধ্যমে এবং তা কোনো গণপরিষদ বা সম্মেলন কর্তৃক প্রণীত, ঘোষিত ও স্বীকৃত হয়।

অনুশীলনী কাজ

বাংলাদেশের সংবিধানের মূলনীতি অনুসারে নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্যগুলো দলে আলোচনা করে লিখি। প্রয়োজনে বই, ইন্টারনেট বা সাক্ষাৎকারের মাধ্যমেও তথ্য সংগ্রহ করতে পারি।

অধিকার	কর্তব্য
১.	১.
২.	২.
৩.	৩.
৪.	৪.
৫.	৫.

অনুসন্ধানী পাঠ

বিশ্ব প্রেক্ষাপটে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বৈচিত্র্যময় গতিপথ

এই অধ্যায়ে আমরা বিশ্ব পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবন গঠন ও রুপান্তরের ইতিহাস অনুসন্ধান করে কিছু যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের চেষ্টা করব।

বাংলা অঞ্চলের মানুষের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বৈচিত্র্যময় গতিপথ আমরা কিছুটা অনুসন্ধান করেছি। সেখানে আমরা দেখেছি, স্থান ও কাল ভেদে মানুষ নানান বৈচিত্র্য এবং ভিন্নতা নিয়ে সমাজ ও সংস্কৃতি গঠন করেছে। হাজার বছরের ইতিহাসে সামাজিক রীতি-নীতি, প্রথা-পদ্ধতি আর সাংস্কৃতিক আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে নতুন নতুন উপাদান যুক্ত হয়েছে। আবার অনেক উপাদান সময়ের সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে গেছে। এর ফলে সমাজের গঠন প্রক্রিয়ায় এসেছে নানান পরিবর্তন ও বিবর্তন। তৈরি হয়েছে নানান ধরনের বৈচিত্র্য ও বহুত্ব। এই যে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন হয় তার ফলে সেই সমাজের মানুষের অবস্থান এবং ভূমিকাতেও আসে নানান পরিবর্তন।

চলো, আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা এবং পূর্ববর্তী পাঠের আলোকে দু'টি ভিন্ন সময়ে এবং ভিন্ন ধারার সমাজে একজন ব্যক্তির অবস্থান ও ভূমিকা কেমন হতে পারে, সেই বিষয়ে একটি আলোচনা করি। কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে এই আলোচনা পর্বটি আমরা কার্যকর করতে পারি।

আলোচনার শেষে নিচের ছকটি পূরণ করি-

শিকার ও সংগ্রহ যুগে একজন মানুষ কীভাবে জীবন যাপন করত?	২০২৪ সালে যেকোনো শহরে বসবাস করে এমন একজন মানুষ কীভাবে জীবন যাপন করছে?

প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতায় সমাজ ও সংস্কৃতি

মিশরীয় সভ্যতা হচ্ছে পৃথিবীর ইতিহাসে প্রাচীনতম সভ্যতাগুলোর অন্যতম। আফ্রিকা মহাদেশের উত্তর-পূর্বদিকে নীল নদের তীরে আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে সভ্যতাটির উদ্ভব হয়। প্রাচীন নগরভিত্তিক সমাজ কাঠামোর পূর্ণাঙ্গ রূপ দেখা গিয়েছিল মিশরীয় সমাজব্যবস্থায়।

মিশরীয় সমাজে মানুষ তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। উচ্চ শ্রেণিতে অবস্থান করত- ফারাও বা শাসকগণ, অভিজাত অমাত্যগণ, পুরোহিত, বিত্তবান ভূমিমালিকেরা। দ্বিতীয় শেণিতে অবস্থান করত- বণিক, কারিগর, শ্রমশিল্পীসহ বিভিন্ন স্বাধীন পেশার মানুষেরা। যে কৃষিকে কেন্দ্র করে সভ্যতার অগ্রযাত্রার সূচনা হয়েছিল, সেই কৃষকেরা ছিলেন তৃতীয় শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। মিশরে অধিকাংশ কৃষকের নিজের জমি ছিল না। কৃষকেরা তাই ভূমিদাস হিসেবে বিত্তবান ভূমি-মালিকদের জমিতে কাজ করতে বাধ্য থাকতেন। প্রাচীন মিশরীয় সমাজের সকল সুবিধা ভোগ করতেন রাজা, পুরোহিত এবং অভিজাত শ্রেণির মানুষেরা। রাজাকে সেখানে বলা হতো ফারাও। সমাজ ব্যবস্থার একেবারে উপরে অবস্থান করতেন ফারাওগণ।

মিশরীয়দের প্রাচীন ইতিহাসে সমাজ ব্যবস্থার মূল ভিত্তি ছিল পরিবার। পারিবারিক সম্পত্তির ওপর মেয়েদের অধিকার স্বীকৃত ছিল। নারীদের সামাজিক মর্যাদা ছিল খুবই উঁচু অবস্থানে। মিশরের রাণীকে দেবতার স্ত্রী, মা, কন্যা বলে বিবেচনা করা হতো। রাজবংশের মেয়েরাও সিংহাসনের দাবিদার ছিল এবং অনেকেই সিংহাসনে অধিষ্ঠিতও হতো। মিশরের একজন রাণীর নাম হচ্ছে নেফারতিতি। তিনি ছিলেন রাজা আখেনাতেনের স্ত্রী।

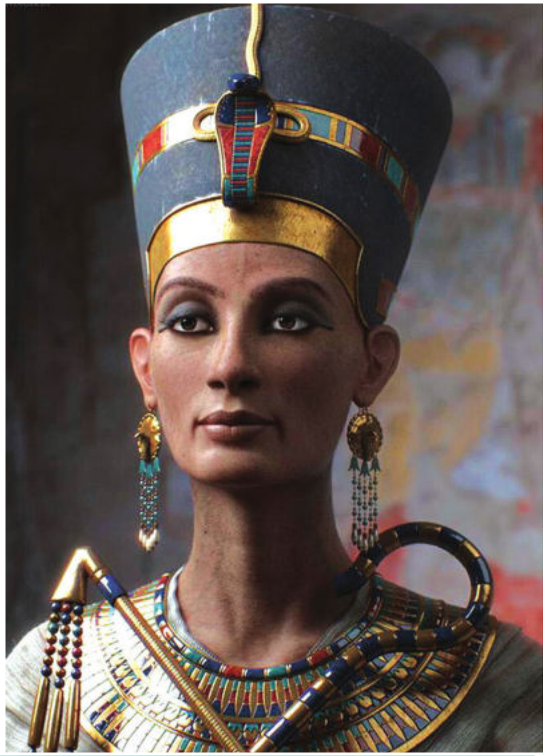

প্রাচীন মিশরেই প্রথম সিংহাসনের দাবিদার হিসেবে নারীদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ কাজেও নারীরা অংশ নিতেন। মিশরের রাজা আখেনাতেনের স্ত্রী রাণী নেফারতিতি ছিলেন তেমনই একজন প্রভাবশালী নারী। রাজা আখেনাতেন এবং তাঁর স্ত্রী নেফারতিতি মিশরীয়দের জীবনযাপনে বড়ো পরিবর্তন নিয়ে এসেছিলেন। প্রথম ছবিতে রানী নেফারতিতির ভাস্কর্য এবং দ্বিতীয় ছবিতে শিল্পীর কল্পনায় নেফারতিতির চেহারার পুনর্গঠিত চিত্র।

সাংস্কৃতিক ইতিহাসে মিশরীয়দের অত্যন্ত উজ্জ্বল ও বহুবিচিত্র অবদানের নজির পাওয়া যায়। মিশরীয়দের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের ওপর ধর্মের প্রভাব ছিল প্রবল। তারা বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক শক্তি (যেমন: সূর্য, চন্দ্র, ঝড়, প্লাবন, বাতাস প্রভৃতি) এবং পশুপাখির (যেমন: সিংহ, বাঘ, সাপ, বাজপাখি, কুমির, বিড়াল প্রভৃতি) পূজা করত। মিশরীয় প্রধান দেবতা ছিল সূর্য দেবতা। সূর্য দেবতার নাম ছিল 'আমান রে'।

মিশরের শাসকদের উপাধি ছিল ফারাও। শাসক এবং পুরোহিতেরা মানুষের মধ্যে এই বিশ্বাস গেঁথে দিয়েছিল যে, ফারাওগণ দেবতাঁদের বংশধর। পরকালেও ফারাওগণ শাসকের মর্যাদা ফিরে পাবে। মৃত্যুর পর ফারাওদের দেহ যাতে পচে নষ্ট না হয়ে যায় সেই জন্য বিশেষ কায়দায় তাঁদের দেহ মমি করা হতো। পিরামিড নামে এক ধরনের অতিকায় স্থাপনার মধ্যে এসবমমি রাখা হতো। মমিকরণ প্রক্রিয়া এবং পিরামিড নির্মাণ কৌশলে মিশরীয়দের স্থাপত্যশৈলী এবং শরীরবিদ্যা সম্পর্কে উন্নত জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

পিরামিড তৈরির বিভিন্ন ধাপ:

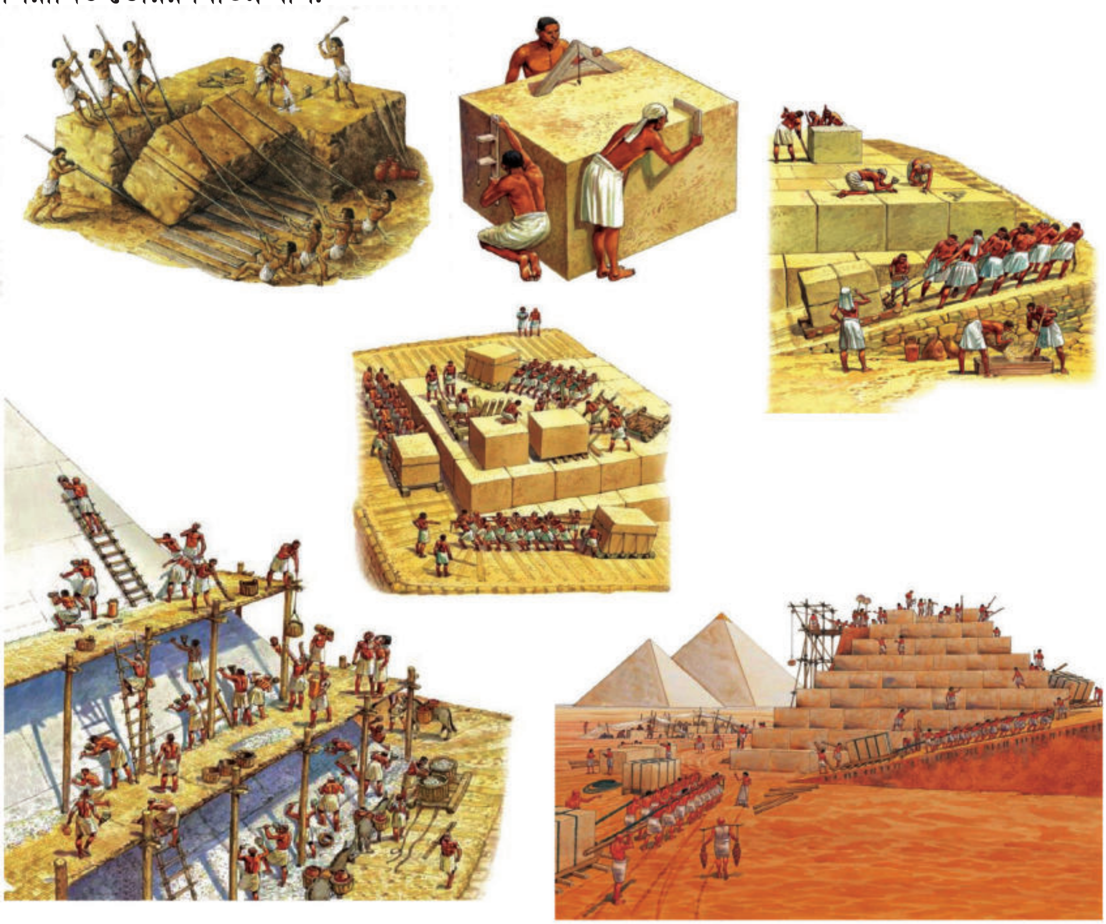

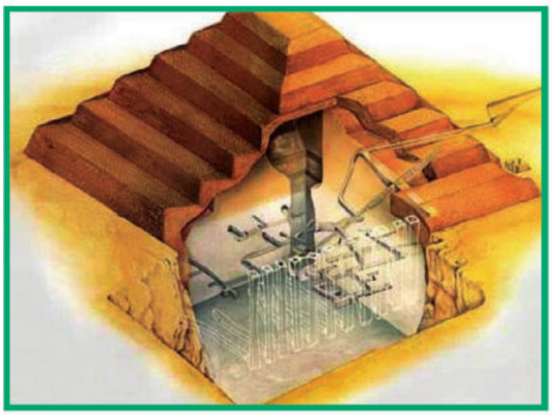

পিরামিডের ভিতরের দেখতে কেমন ছিল।

পিরামিড নির্মাণের বিভিন্ন ধাপ :
পাথর মেপে, কেটে দরকারী আকার দিয়ে পিরামিড তৈরির উপযোগী করা হত। একটা পাথরের উপরে আরেকটা পাথরের টুকরো বসানো হত। দড়ি দিয়ে টেনে বেঁধে উপরের দিকে পাথরের টুকরাগুলোকে উঠানো হত। একটার উপরে আরেকটা স্থাপন করা হত। পিরামিড তৈরির এই প্রক্রিয়ার প্রচুর শ্রমিক দরকার হত। গবেষকগণ মনে করেন, বড় আকারের একটা পিরামিড তৈরি করতে ২৫০০০ থেকে ৩০০০০ জন শ্রমিক প্রয়োজন হত। এই শ্রমিকগণের থাকার ও খাওয়ার ব্যবস্থা করা হত নির্মাণ স্থানের কাছে। উপরের ছবি এই প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপ কল্পনা করে আঁকা হয়েছে।

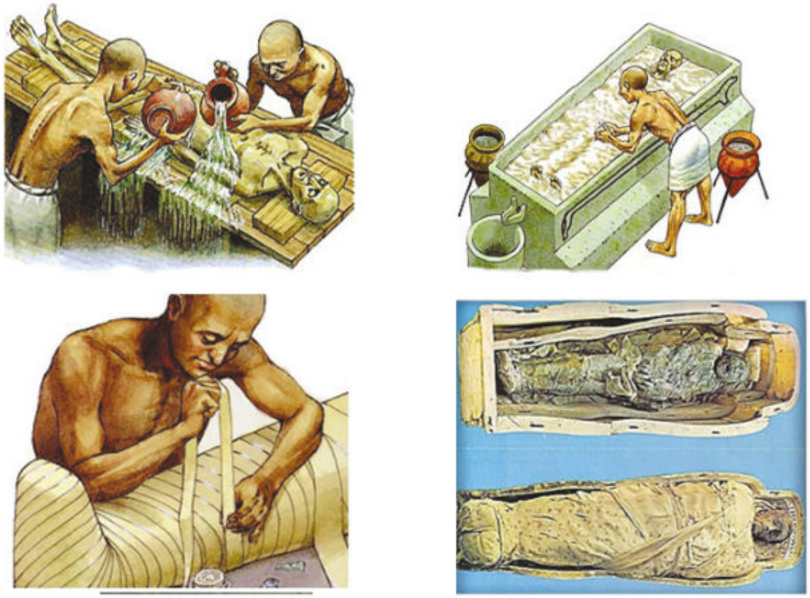

মৃতদেহকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় রুপান্তর, পরিবর্তন, রাসায়নিক ব্যবহার করে কাপড়ের পরতে পরতে আবৃত করে কয়েকটি ধাপে অনেক সময় ধরে মমিতে পরিণত করা হতো। উপরের ছবিতে তেমনই কয়েকটি ধাপ গবেষণার মাধ্যমে পুনর্গঠন করা হয়েছে।

সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্পকলায় মিশরীয় সভ্যতা প্রভূত উন্নতি সাধন করেছিল। কৃষির ওপর ভিত্তি করেই মিশরীয় সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। নীল নদের বন্যা, খরা প্রভৃতি বিষয়ের সঙ্গে আকাশের নক্ষত্ররাজির সম্পর্ক লক্ষ করেই তারা জ্যোতির্বিদ্যা চর্চায় মনোনিবেশ করেছিল। কৃষি এবং ধর্মীয় প্রয়োজন থেকে তারা চন্দ্রপঞ্জিকার উদ্ভাবন করেছিল। আকাশে চন্দ্রের অবস্থান নিরীক্ষণ করে রচিত হয়েছিল চন্দ্রপঞ্জিকা। এই পঞ্জিকা অনুসারে বছরে তাঁদের দিনের সংখ্যা ছিল ৩৫৪টি। আনুমানিক ৪২০০ সাধারণ পূর্বাব্দের দিকে মিশরীয়রা সূর্যকে পর্যবেক্ষণ করে ৩৬৫ দিনে বছর হিসাব করে সৌর পঞ্জিকা তৈরি করে। ৩০ দিনে ১ মাস, ১২ মাসে বছরের হিসাব মিশরীয়রাই প্রথম আবিষ্কার করেছিল। শুধু তাই নয়, নীলনদের বন্যার সঙ্গে বছরের হিসাবে মিলাতে গিয়ে তাঁরাই প্রথম ‘লিপ ইয়ার’ আবিষ্কার করে প্রতি চার বছর পরপর ৩৬৬ দিনে বছর গণনার রীতি চালু করে। দিনের বিভিন্ন সময় নিরূপণের জন্য তারা একধরনের সূর্যঘড়ি আবিষ্কার করেছিল।

গণিতের ক্ষেত্রেও তাঁদের অবদান ছিল অনেক। যোগ, বিয়োগ, গুণ পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছিল তারা। জ্যামিতিক হিসাব ও নকশা মিলিয়ে নির্মাণ করেছিল সে যুগের শ্রেষ্ঠতম বেশকিছু স্থাপত্যকীর্তি। এসব কীর্তি ইতিহাসের এক বিশেষ কালে নির্দিষ্ট একভূখণ্ডে একদল মানুষের জীবন-সংগ্রাম আর সভ্যতা রচনার অভিজ্ঞতাকে আজও ধারণ করে আছে।

ইতিহাসে মিশরীয় সভ্যতার অন্যতম বড়ো অবদান হচ্ছে লিপির আবিষ্কার। মানুষের ইতিহাসে তাঁরাই প্রথম লিপির উদ্ভাবন করে। প্রথম দিকে তাঁদের লিপি ছিল চিত্রভিত্তিক। কোনো একটি বস্তুর নাম ও সংখ্যা লিখে রাখার জন্য তারা সে বস্তুটির চিত্র আঁকত এবং ছোটো ছোটো বিন্দু দিয়ে তার সংখ্যা উল্লেখ করত। চিত্রভিত্তিক

সেই লিপিকে বলা হয় হায়ারোগ্লিফিক। হায়ারোগ্লিফিক নামটি গ্রিকদের দেওয়া। এর অর্থ হচ্ছে, পবিত্র খোদাই কর্ম। চিত্রভিত্তিক লিপি থেকেই তারা ক্রমে ক্রমে অক্ষরভিত্তিক লিখনপদ্ধতি আবিষ্কার করে। লেখার উপকরণ হিসাবে মিশরীয়রা প্যাপিরাস নামক কাগজ এবং কালো কালির আবিষ্কার করেছিল। প্যাপিরাস ছিল মূলত একধরনের নলখাগড়া জাতীয় উদ্ভিদ। প্যাপিরাসের কাণ্ডকে খুব পাতলা করে কেটে রঙে ডুবিয়ে, রোদে শুকীয়ে লেখার উপযোগী করা হতো।

প্রাচীন মেসোপটেমিয়া সভ্যতায় সমাজ ও সংস্কৃতি

আনুমানিক ৪০০০ সাধারণ পূর্বাব্দ থেকে বর্তমান ইরাকের টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে ধারাবাহিকভাবে কতগুলো নগর সভ্যতার জন্ম হয়েছিল। এগুলোর মধ্যে সুমেরীয়, ব্যাবিলনীয়, এসেরীয়, ফনেশীয় এবং ক্যালডীয় সভ্যতার নাম উল্লেখযোগ্য। ইতিহাসে এই সভ্যতাগুলোর সমন্বিত নাম মেসোপটেমীয় সভ্যতা। ভূ-পৃষ্ঠের ভিন্ন ভৌগোলিক বাস্তবতায় ভিন্ন ভিন্ন সময়ে গড়ে উঠা এই নগর সভ্যতাগুলোতেও মিশরীয় সভ্যতার মতোই শ্রেণিভিত্তিক সমাজ গড়ে উঠেছিল। রাজা ছিলেন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। রাজাদের এই ক্ষমতাকে আরও বেশি শক্তিশালী করেছিল পুরোহিত বা ধর্মগুরুরা। রাজাকে তারা ক্ষেত্রবিশেষে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলে পরিচয় করিয়ে দিতেন। অন্যান্য শ্রেণির মানুষের সামাজিক অবস্থান ছিল অনেক নিচে। সমাজে দাস প্রথার প্রচলন ছিল। ভূমিদাস ও ক্রীতদাসদের অবস্থান ছিল সবচেয়ে নিচের শ্রেণিতে।

মেসোপটেমিয়া অঞ্চলে গড়ে উঠা সভ্যতাগুলোর মধ্যে সুমেরীয় এবং ব্যাবিলনীয় সভ্যতায় মেয়েরা সম্পদের অধিকারী হতে পারতো এবং স্বাধীনভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য করার অধিকার তাঁদের ছিল। অন্যদিকে একই অঞ্চলে গড়ে উঠা এসেরীয় সভ্যতায় মেয়েদের সেই অধিকার ছিল না। ক্যালডীয় সভ্যতায়ও মেয়েদের অধিকার ছিল অত্যন্ত সীমিত।

মেসোপটেমিয়া সভ্যতার অগ্রদূত বলা হয় সুমেরীয় সভ্যতাকে। ইতিহাসে তাঁদের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। ৩০০০ সাধারণ পূর্বাব্দে সুমেরীয়রা কীউনিফর্ম নামের এক ধরনের লিখন পদ্ধতি আবিষ্কার করে। কাদামাটির নরম প্লেটের ওপর সরু কাঠির অগ্রভাগ দিয়ে অক্ষর ফুটিয়ে তোলা হতো। পরে তা রোদে শুকীয়ে বা আগুনে পুড়িয়ে সংরক্ষণ করা হতো। সুমেরীয়রা ছিল সাহিত্যপ্রেমি। আনুমানিক ২০০০ সাধারণ পূর্বাব্দে তারা 'গিলগামেশ' নামে একটি মহাকাব্য রচনা করেছিল। গিলগামেশ কাব্যে মহাপ্লাবন এবং সৃষ্টিতত্ত্ব সংক্রান্ত এমনঅনেক কিছুই বলা হয়েছে যা পরবর্তীকালে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হতে দেখা যায়।

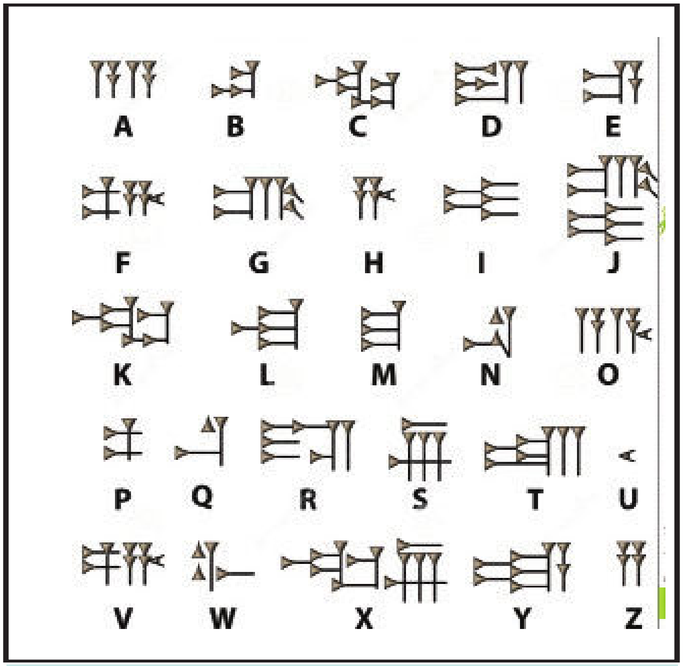

ইংরেজি বর্ণমালা অনুসারে কীউনিফর্ম লিপি

সুমেরীয় সভ্যতায় প্রথম চাকাচালিত যানবাহনের প্রচলন হয়। স্থাপত্যক্ষেত্রেও সুমেরীয়দের অবদান ছিল উল্লেখযোগ্য। সুমেরীয়দের স্থাপত্যবিদ্যার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি ছিল জিগুরাত নামের ধর্মমন্দির।

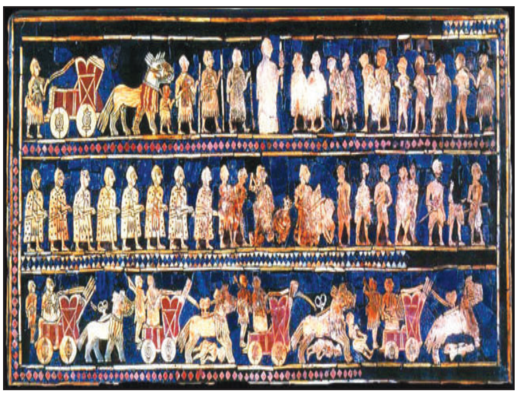

উর থেকে প্রাপ্ত চিত্রে অঙ্কীত যানবাহনে চাকার ব্যবহার For Video https://www.khanacademy.org/humanities/history/ancient-medieval/Ancient/v/standard-of-ur-c-2600-2400-b-c-e

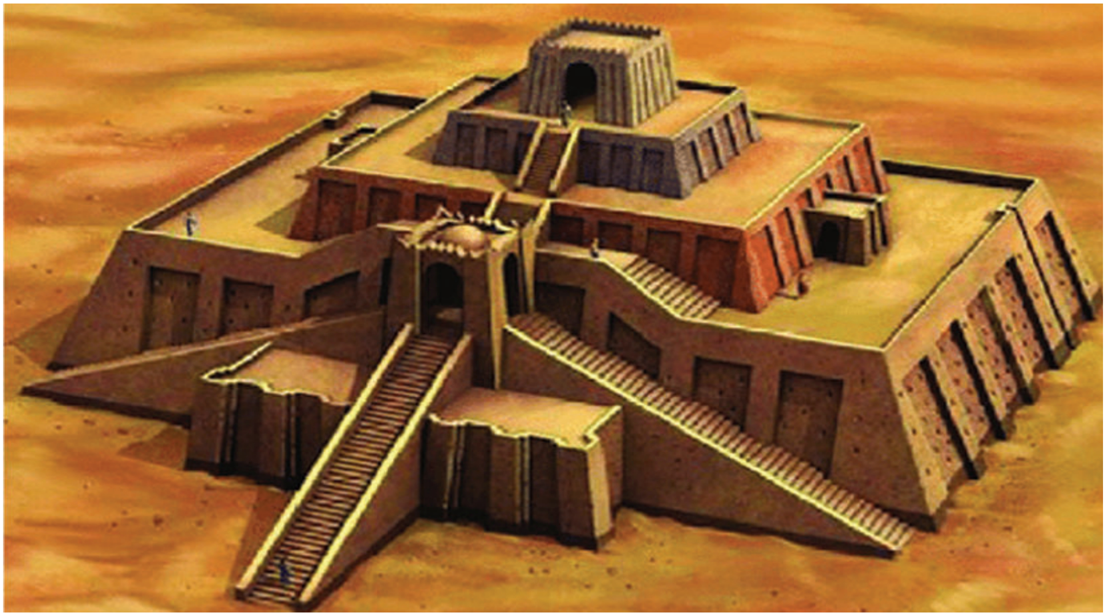

সুমেরীয়দের প্রতিটি নগরকেন্দ্রে একটি নগরদেবতার নামে উৎসর্গ করা মন্দির ছিল। এই মন্দিরগুলোকে জিগুরাত বলা হতো। উর নগরের জিগুরাতটি তখন দেখতে কেমন ছিল? সেই মন্দিরের কাল্পনিক ছবি। কপিরাইট : জ্যঁ ক্লদগোলভিন (https://jeanclaudegolvin.com/en/project/middle-east/

ইতিহাসে মিশরীয়দের মতোই সুমেরীয় এবং ব্যাবিলনীয় সভ্যতায় গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকীৎসাশাস্ত্রে বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়েছিল। সুমেরীয়রাই প্রথম '৭ দিনে এক সপ্তাহ' এবং '২৪ ঘন্টায় দিন'-এর নিয়ম প্রবর্তন করে। সভ্যতায় ব্যাবিলনীয়দের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে আইনের ক্ষেত্রে। হাম্মুরাবী নামে ব্যাবিলনীয় একজন যোদ্ধা ও সংগঠক স্থানীয় রীতিনীতি এবং প্রথাপদ্ধতির পরিবর্তে একটি সর্বজনস্বীকৃত বিধিবদ্ধ আইন সংকলন ও প্রণয়ন করেন। হাম্মুরাবীর আইনের ধারায় বিয়ে, ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিবার, সম্পত্তি, কৃষি, দাস ক্রয়-বিক্রয় সহ প্রায় সকল প্রকার অপরাধের মীমাংসা সম্পর্কীত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

প্রাচীন গ্রিসে সমাজ ও সংস্কৃতি

পৃথিবীর অন্যান্য অধিকাংশ সভ্যতা গড়ে উঠেছিল নদীকে আশ্রয় করে। গ্রিক সভ্যতা ছিল সেই ধারায় একটি ব্যতিক্রমী উদাহরণ। গ্রিক সভ্যতা গড়ে ওঠার পেছনে নদীর চেয়ে সমুদ্রের অবদান ছিল বেশি। গ্রিক সভ্যতার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল পর্বত এবং সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপপুঞ্জ। অনেকগুলো ছোটো ছোটো দ্বীপের সমন্বয়ে অপেক্ষাকৃত অনুর্বর পার্বত্য অঞ্চলে আনুমানিক ১২০০ সাধারণ পূর্বাব্দে সভ্যতাটির যাত্রা শুরু হয় এবং ৬০০ সাধারণ অব্দের দিকে এসে পূর্ণমাত্রায় বিকাশ লাভ করে। অনেকগুলো ছোটো ছোটো নগর নিয়ে এই সভ্যতা বিকশিত হয়েছিল। গ্রিসের প্রধান নগর ছিল এথেন্স। গণতন্ত্রের সূতিকাগার হিসাবে এথেন্সের নাম ইতিহাসের পাতায় বিশেষভাবে লিখিত হয়ে আছে।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

প্রাচীন মিশর এবং মেসোপটেমিয়ার মতো গ্রিসেও শ্রেণি বিভক্ত সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। গ্রিক সমাজ মূলত অভিজাত এবং শোষিত এই দুই শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। অভিজাতরা ছিল সকল সম্পদ এবং প্রশাসনিক সুবিধার অধিকারী। দাস এবং শ্রমিকেরা তাঁদের হাতে শোষিত ও নির্যাতিত হতো। কৃষি এবং বাণিজ্য ছিল গ্রিকদের অর্থনীতির মূল ভিত্তি। গম ও যব ছিল তাঁদের প্রধান কৃষিপণ্য। তবে অধিকাংশ ভূমি অনুর্বর হওয়ায় বাইরে থেকে খাদ্য আমদানি করতে হতো। কৃষকেরা তাই অধিকাংশ সময়ে দারিদ্র্যের মধ্যে জীবনযাপন করত। সম্পদের মূল মালিকানা থাকত অভিজাত শাসক ও বণিকদের হাতে।

সে সময়ের অন্যতম প্রধান নগর-রাষ্ট্র এথেন্সের নগরের মূল কেন্দ্র বা অ্যাক্রোপলিসের বর্তমান আলোকচিত্র (Source: history৪kids.co)

এথেনিয়ান অ্যাক্রোপলিস: দেবী এথেনার পার্থেনন মন্দির (Source: history4kids.co)
গ্রিস সভ্যতার আরেকটি নগর-রাষ্ট্র ক্রিটের সেই সময়ের চিত্র কল্পনা করা হয়েছে।

সমুদ্রকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছিল গ্রিক সভ্যতা। বিভিন্ন দ্বীপ এবং নগরগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্য জাহাজ নির্মাণে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছিল গ্রিকরা। নৌযুদ্ধেও তারা ছিল প্রায় অপরাজেয়। বিভিন্ন প্রতিবেশী রাজ্যে আক্রমণ করতে তারা যুদ্ধ জাহাজ ব্যবহার করত। আবার গ্রিক নগর রাষ্ট্রগুলোর মধ্যেও প্রায়ই যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগে যেত। নিচে গ্রিকদের কয়েকটি যুদ্ধ জাহাজ এবং গ্রিকদের সঙ্গে পারসিকদের যুদ্ধের কাল্পনিক চিত্র দেওয়া হয়েছে। ছবিগুলো দেখে তোমরা সেই সময়ের গ্রিকদের জাহাজ নির্মাণের দক্ষতা এবং যুদ্ধকালীন সময়ে ব্যবহৃত অস্ত্র ও বর্ম সম্পর্কে ধারণা পাবে।

নৌযুদ্ধ

গ্রিক সভ্যতার ইতিহাসের কোনো কাহিনিই পুরোপুরি বোঝা যাবে না যদি সমুদ্রের সঙ্গে গ্রিকদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আমরা না জানি। দ্বীপরাষ্ট্র হিসেবে বিভিন্ন দ্বীপের মধ্যে যোগাযোগ আর যুদ্ধের জন্য গ্রিকরা নৌযুদ্ধের বিভিন্ন জাহাজ ও কৌশল আবিষ্কার করেছিল। অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগের জন্যও তারা বিভিন্ন ধরনের সমুদ্রগামী জাহাজ ব্যবহার করত। জাহাজ নির্মাণ ও চালনায় গ্রিকরা অত্যন্ত দক্ষ ছিল। জাহাজকে ট্রিয়েম বলা হতো। বিভিন্ন লিখিত সূত্রে জানা যায় যে, তারা বিভিন্ন জাহাজের ভিন্ন ভিন্ন নাম দিত। বেশির ভাগ নামই দেবতা-দেবী, স্থান, প্রাণী, বস্তু বা ধারণার (যেমন: স্বাধীনতা, গৌরব, সাহস ইত্যাদি) নামে হতো।

যুদ্ধজাহাজের বহর

অনুশীলনী

প্রাচীন গ্রিস ও আমাদের দেশের কাঠের জাহাজের পার্থক্য খুঁজে বের করো। মিল অমিল লেখ।

বড়ো জাহাজ ও নৌকা মিলিয়ে যুদ্ধের জন্য তৈরি করা নৌবহর

মালবাহী বাণিজ্যিক জাহাজ

গ্রিকদের ধর্মীয় জীবন ছিল বহু দেব-দেবীতে পূর্ণ। প্রতিটি নগরের পৃথক দেবতা ছিল। তবে তাঁদের প্রধান দেবতা ছিল জিউস। জিউজ ছিল বজ্র, বৃষ্টি এবং আকাশের দেবতা।

স্থাপত্য, ভাস্কর্য, সাহিত্য, দর্শন, নাট্যকলা, খেলাধুলা, রাজনীতি এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় গ্রিক সভ্যতার অবদান সমকালীন অন্য সকল সভ্যতাকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তোমাদের জেনে রাখা দরকার যে, ইতিহাসের জনক হিসাবে পরিচিত হেরোডোটাসের জন্ম গ্রিসে। গ্রিক ও পারসিক যুদ্ধের ঘটনাকে অবলম্বন করে তিনিই প্রথম ইতিহাস-সংক্রান্ত বই রচনা করেন। ইতিহাস চর্চায় সঠিক উৎস অনুসন্ধান এবং ঘটনার বর্ণনায় নিরপেক্ষ থাকার কথা বলেন। সক্রেটিস, প্লেটো ও এরিস্টটলের মতো খ্যাতিমান দার্শনিক এবং পিথাগোরাসের মতো প্রতিভাবান গণিতবিদের জন্ম হয়েছিল প্রাচীন গ্রিসে। গ্রিকরাই প্রথম পৃথিবীর মানচিত্র অংকন করে। বলা হয়ে থাকে, গ্রিক সভ্যতা শুধু ইউরোপকে নয়, পুরো পৃথিবীকেই জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য ও দর্শনের জ্ঞান দিয়ে ইতিহাস রচনা করেছে।

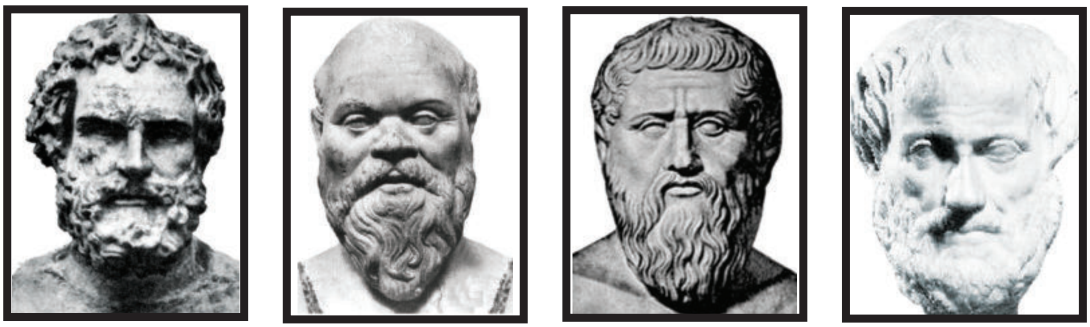

সেই সময় জ্ঞান ও বিজ্ঞানের চর্চা হতো গ্রিসের বিভিন্ন নগর-রাষ্ট্রে। অনেক গ্রিক চিন্তাবিদের প্রভাব গণিত-দর্শন-বিজ্ঞান-জ্যোতির্বিজ্ঞান-চিকীৎসাবিজ্ঞানে পড়েছে। তারা চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। এমনই চারজন চিন্তাবিদের ভাস্কর্যের ছবি এখানে রয়েছে। বাঁম থেকে ডানে: থেলিস (প্রাক্ সাধারণ ৬২৩-৫৪৫ অব্দ); সক্রেটিস (প্রাক্ সাধারণ ৪৭০-৩৯৯ অব্দ); প্লেটো (প্রাক্ সাধারণ ৪২৭-৩৪৭ অব্দ) অ্যারিস্টটল (প্রাক্ সাধারণ ৩৮৪-৩২২ অব্দ);

প্রাচীন মিশর, মেসোপটেমিয়া ও গ্রিক সভ্যতার সমাজব্যবস্থা নিয়ে দলগত আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন পেশার মানুষের অবস্থান ও ভূমিকা নির্ণয় করে নিচের ছকটি পূরণ করি।

	বিভিন্ন পেশার মানুষের অবস্থান	ভূমিকা
প্রাচীন মিশরীয় সমাজ		
গ্রিক সভ্যতা		
মেসোপটেমিয়া সভ্যতা		

বিভিন্ন সময়	বিভিন্ন সমাজ	রাজনৈতিক অবস্থা
পঞ্চম শতক		
সপ্তম শতক		
দশম শতক		

রেনেসাঁ: পুনর্জাগরণের কাল

রেনেসাঁ একটি ফরাসি শব্দ। এর অর্থ হচ্ছে পুনর্জাগরণ বা নবজাগরণ। ইতিহাসে ঘটে যাওয়া অন্যতম প্রধান ঘটনা এই রেনেসাঁ। রেনেসাঁর প্রভাবে আজও পৃথিবীর মানুষ যৌক্তিক এবং বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পথে হেঁটে চলেছে। ১৪৯৩ সালে বা সাধারণ অব্দে তুরস্কের শাসকগণ রোমান সাম্রাজ্যের পশ্চিম দিকের কেন্দ্র কনস্টান্টিনোপল দখল করে নেন। কনস্টান্টিনোপলের পণ্ডিত, শিল্পী এবং চিন্তকগণ তখন ইতালিতে গিয়ে আশ্রয় নেন। ইতালির উপদ্বীপগুলোতেও অনেক শিল্পী, পণ্ডিত ও চিন্তকেরা নতুন চিন্তার বিকাশ ঘটাচ্ছিলেন। কনস্টান্টিনোপল থেকে আগত পণ্ডিত ও শিল্পীদের সঙ্গে ইতালির পণ্ডিতদের জ্ঞান ও দর্শনের মিলন হয়। এর ফলে শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, সমাজ ও সংস্কৃতির সকল ক্ষেত্রে নবজাগরণ বা নতুন চিন্তার ক্ষেত্র তৈরি হয়। ইতিহাসে এই ঘটনাটিকেই রেনেসাঁ বা নবজাগরণের কাল বলে অভিহিত করা হয়।

ইউরোপে খ্রিস্টধর্ম বিস্তারের পর থেকে প্রায় এক হাজার বছরের জন্য ইউরোপের সমাজ, সংস্কৃতি, রাষ্ট্র- সকল কিছুর ওপর ধর্মের একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শিল্প, সাহিত্য, দর্শনের ক্ষেত্রেও স্থবিরতা নেমে আসে। এর ফলে ইহজাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় ভাঁটা পড়ে এবং প্রাচীন গ্রিসের স্বর্ণযুগের বিজ্ঞান, দর্শন ও অন্যান্য জ্ঞানের সঙ্গে ইউরোপের সংযোগ ছিন্ন হয়ে যায়। পনের শতকে বোকাচ্চিও, পেত্রার্ক প্রমুখ মানবতাবাদী সাহিত্যিকগণ ধর্মীয় প্রভাবকে পাশ কাটিয়ে নতুন ধারার চিন্তাভাবনার চর্চা করছিলেন।

এই সংযোগ পুনরায় স্থাপিত হয়েছে মূলত অনুবাদের মাধ্যমে। অনুবাদ হয়েছিল প্রাচীন গ্রিক থেকে প্রথমে আরবিতে। তারপর ল্যাটিন ভাষায়। এ কাজে যুক্ত হয়েছিলেন অসংখ্য মুসলিম ও ইহুদি পন্ডিত ব্যক্তি। এক সময় আরব থেকে উত্তর আফ্রিকা ও পারস্য থেকে মধ্য এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত মুসলিম সাম্রাজ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় জোয়ার এসেছিল। এসময় মুসলিম জ্ঞান সাধনায় প্রাচীন গ্রিসের গ্রন্থরাজির সন্ধান কাজ ও অনুবাদ শুরু হয়। এই সংযোগ ইতালির উদীয়মান জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে সাড়া জাগায়। ইতালীয় রেঁনেসা শিল্প ও সাহিত্যে জাগরণ ও বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়েছে।

ইতালির শিক্ষাকেন্দ্রগুলো কেবল ধর্মশিক্ষার রীতি বাতিল করে পার্থিব জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন শেখাতে শুরু করে। রেনেসাঁ যুগে এমন কয়েকজন বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, চিন্তক ও শিল্পীর আগমন ঘটে যাঁরা শুধু ইউরোপ নয়, সমগ্র মানব সভ্যতার ইতিহাসকে তাঁদের চিন্তা ও কর্ম দিয়ে প্রভাবিত করে গিয়েছেন। জ্ঞান ও আলোর পথে অগ্রসর হতে সাহায্য করেছেন। রেনেসাঁ যুগের দু'জন বিখ্যাত বিজ্ঞানী হলেন, কোপার্নিকাস এবং গ্যালিলিও। প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ মনে করত, পৃথিবী হচ্ছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু। চন্দ্র, সূর্যসহ সকল গ্রহ-নক্ষত্র পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। প্রাচীন বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থেও এই কথা বলা হয়েছে। রেনেসাঁ যুগের বিজ্ঞানীরা এই ধারণাকে ভ্রান্ত বলে প্রমাণ করেন এবং পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে ইতিহাসের এই সত্য আবিষ্কার করেন। রেনেসাঁ যুগের দু'জন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী হলেন, লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি এবং মাইকেল এঞ্জেলো। লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চিকে এখনো সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পীদের একজন বলে বিবেচনা করা হয়।

উপরে ছবিতে বাঁম দিকে রেনেসাঁ যুগের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি।
বামে ভিঞ্চির আঁকা বিখ্যাত চিত্রকর্ম 'মোনালিসা'

রেনেসাঁ যুগের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে জাতিরাষ্ট্রের উত্থান। পনেরো শতক থেকেই ইউরোপের বিভিন্ন শক্তিশালী রাজশক্তির হাত ধরে জাতিরাষ্ট্রের উত্থান ঘটে। জাতিরাষ্ট্রের রাজাগণ বাণিজ্য বিস্তারে সহায়তা করেন। স্পেন, পর্তুগাল, ইংল্যান্ড প্রভৃতি দেশের নাবিকেরা সমুদ্রযাত্রায় যে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন তার ওপর ভিত্তি করেই আবারও জাহাজ যোগে দক্ষিণ এশিয়া এবং ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপনের উদ্যোগ নেন। ১৪৯৮ সালে পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো-দা-গামা আফ্রিকার দক্ষিণ উপকূল হয়ে ইউরোপ থেকে ভারতে আসার জলপথ আবিষ্কার করেন। অন্যদিকে ইতালির নাবিক কলম্বাস স্পেনের রাণী ইসাবেলার কাছ থেকে অর্থসহায়তা নিয়ে ভারতে আসার নতুন জলপথ আবিষ্কার করতে গিয়ে ১৪৯২ সালে আমেরিকা মহাদেশে পৌঁছে যান। ইউরোপ এবং এশিয়ার মানুষের কাছে আমেরিকা মহাদেশ সম্পর্কে তখন অবধি কোনো তথ্যই ছিল না। আটলান্টিক মহাসাগরের অগাধ জলরাশি মধ্যখানে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কলম্বাসের দেখানো পথ ধরেই স্পেনীয়রা আমেরিকার নির্দিষ্ট কিছু অংশে সাম্রাজ্য স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এরপর একে একে পর্তুগিজ এবং ইংরেজ নাবিক এবং বণিকেরাও নতুন মহাদেশটিতে অভিযান পরিচালনা করে নিজেদের দখল প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালায়। অল্প দিনের মধ্যেই আমেরিকার স্থানীয় আদি অধিবাসীদের বিরাট সংখ্যক মানুষকে যুদ্ধে পরাজিত ও বিতাড়িত করে ইউরোপীয় শক্তিগুলো নতুন মহাদেশের ভূমি এবং সোনারুপা দখল করে ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা চালু করে।

শুধু আমেরিকায় নয়, জলপথ আবিষ্কারের এই সূত্র ধরেই এ সময় ভারতীয় উপমহাদেশ সহ সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশেও ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর কলোনি বা ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। মূলত বিভিন্ন ধরনের খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদ এবং নতুন ভূমির ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্যই ইউরোপের রাজশক্তিগুলো এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা মহাদেশের বিস্তৃত এলাকাজুড়ে ঔপনিবেশিক শাসনের সূচনা করে। এসবভৌগোলিক আবিষ্কার এবং উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার ফলে ভিন্ন ভিন্ন দেশ এবং মহাদেশের মানুষের মধ্যে সংযোগ ঘটে। এই সংযোগ ধীরে ধীরে সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও প্রভাব বিস্তার করে। আমেরিকা, আফ্রিকা, এশিয়ার দেশগুলোতে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা, দর্শন, স্থাপত্যরীতি প্রবেশ করে। সামাজিক নানান প্রথা, বিশ্বাস এবং আচার-অনুষ্ঠানেও ইউরোপীয় রীতিনীতির প্রচলন হতে দেখা যায়।

শিল্পবিপ্লব

ইতিহাসের বিভিন্ন কালপর্বে ঘটে যাওয়া যেসব ঘটনাবলি মানুষের জীবনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছে শিল্পবিপ্লব সেগুলোর মধ্যে অন্যতম। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লব শুরু হয় । কৃষি এবং শিল্পক্ষেত্রে মানুষের পরিবর্তে যন্ত্রের ব্যবহার শুরু হয় এই বিপ্লবের মধ্য দিয়ে। আদিকাল থেকেই মানুষ নিজের শ্রম দিয়ে সকল কাজ করত। চাষ ও মালামাল পরিবহণে পশু এবং পালতোলা জাহাজ ব্যবহার করত। কিন্তু শিল্পবিপ্লবের সময় মানুষ প্রথম এই শ্রমক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে যন্ত্রের ব্যবহার শুরু করে। এই সময় ইংল্যান্ডে বাষ্পচালিত স্টীম ইঞ্জিন আবিষ্কৃত হয়। এই ইঞ্জিনকে কাজে লাগিয়ে নির্মিত হয় বড়ো বড়ো ফ্যাক্টরি ও শিল্প কারখানা। ফলে উৎপাদনক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা হয়। শুধু শিল্প নয়, কৃষিক্ষেত্রেও যন্ত্রের ব্যবহার শুরু হয় এই শিল্পবিপ্লবের সময় হতেই। কৃষিক্ষেত্রে সার প্রয়োগ, যন্ত্রের মাধ্যমে বীজ বপন, উন্নতমানের পশু এবং খাদ্যশস্য পৃথক করে নতুন প্রজননপদ্ধতি আবিষ্কার, খামার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পশুপালন প্রভৃতি আধুনিক প্রক্রিয়া যুক্ত হয় কৃষিক্ষেত্রে। ফলে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সঙ্গে তাল মিলিয়ে খাদ্য উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হয়। এশিয়া এবং আফ্রিকায় ইংল্যান্ডের উপনিবেশ থাকায় শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল তারা এসবউপনিবেশ থেকে সংগ্রহ করত। আবার শিল্পবিপ্লবের ফলে যে প্রভূত পণ্য উৎপাদিত হচ্ছিল সেগুলো বিক্রি করার ক্ষেত্রও ছিল উপনিবেশগুলো। শিল্পবিপ্লবের সূচনা ইংল্যান্ডে হলেও ধীরে ধীরে তা ইউরোপসহ পৃথিবীর

অন্যান্য অনেক দেশেই ছড়িয়ে যেতে শুরু করে। এর ফলে শিল্পকে উপজীব্য করে বড়ো বড়ো আধুনিক নগর গড়ে উঠতে শুরু করে।

নৌকা, জাহাজ, রেলগাড়ি, মোটরগাড়ি প্রভৃতি যানবাহনেও প্রথমে বাষ্পচালিত এরপর তেল ও বিদ্যুৎ চালিত ইঞ্জিন বসানো হয়। এরফলে সভ্যতার বিকাশে নতুন এক গতির সঞ্চার হয়।

মানব সভ্যতা খুব দ্রুতই যন্ত্র ও প্রযুক্তি নির্ভর জীবনব্যবস্থার দিকে ধাবিত হয়। বর্তমান পৃথিবীতে মানুষের জীবনের সঙ্গে এই যন্ত্র ও প্রযুক্তির তৈরি হয়েছে অকাট্য এক সম্পর্ক। কৃষি, শিল্প, বিনোদন, পরিবহণ, নির্মাণ প্রভৃতি প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই এখন যন্ত্রপ্রযুক্তির রয়েছে অবাধ ব্যবহার। এই শিল্পবিপ্লবের ঢেউ ভারতীয় উপমহাদেশেও ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে। বাংলা অঞ্চল এবং বাংলাদেশেও এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লব

বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে যে বিপ্লবের শুরু হয়েছিল বিদ্যুৎ শক্তির আবিষ্কারের ফলে তা আরও একধাপ এগিয়ে যায়। যাকে বলা হয় দ্বিতীয় শিল্প বিপ্লব। উনিশ শতকের মধ্যভাগে শুরু হয় তৃতীয় শিল্প বিপ্লব। এই বিপ্লবের প্রধান অবদান হচ্ছে, কম্পিউটার এবং ইন্টারনেটের ব্যবহার। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের যুগকে ডিজিটাল প্রযুক্তি বা তথ্যপ্রযুক্তির যুগও বলা হয়ে থাকে। তথ্য প্রযুক্তির সঙ্গে কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার শুরু হওয়া সঙ্গে সঙ্গে মানব সভ্যতা চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের যুগে প্রবেশ করেছে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের শুরু হয়েছে গত শতাব্দীর শেষ দশকে। অল্প দিনের মধ্যেই তা মানব সভ্যতার নানান ক্ষেত্রে নিয়ে এসেছে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন। ভার্চুয়াল রিয়েলিটি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন যন্ত্রপাতি, চালকবিহীন গাড়ি, ড্রোন, কৃত্রিম উপগ্রহ, ন্যানোপ্রযুক্তি, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং প্রভৃতি হচ্ছে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উন্নয়নের ফলে যন্ত্রের সহায়তায় জিনপ্রকৌশল থেকে শুরু করে মহাবিশ্বের নানান প্রান্তে অভিযান পরিচালনা করছে। ইতিহাসের সকল অভিজ্ঞতাকে ধারণ করে বর্তমানে চতুর্থ শিল্পবিপ্লব মানুষকে পরিকল্পিতভাবে সামনের দিকে পরিচালিত করছে। জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক উন্নতির ফলে মানুষ এখন নানান বৈচিত্র্যের মধ্যেও একতার সূত্র খুঁজতে শুরু করেছে। সমগ্র বিশ্বের নানান প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা নানান ধরনের সমাজ ও সংস্কৃতি, স্বতন্ত্র জীবনধারার গল্প ইন্টারনেটের মাধ্যমে অডিও, ভিডিওসহ নানান বিন্যাসে চিত্রায়িত ও ধারণকৃত হয়ে ইন্টারনেটের মাধ্যমে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। ফলে মানুষ নিজের সমাজ ও সংস্কৃতি লালন করার পাশাপাশি ভিন্ন ভূমি, ভিন্ন ভিন্ন ধারার সামাজিক প্রথা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে একজন অন্যজনের সংস্কৃতির পুরোটা অথবা অংশবিশেষ গ্রহণও করছে।

এভাবেই বৈচিত্র্যের মধ্যে স্থাপিত হচ্ছে ঐক্য, বৈশ্বিক পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বজনীন ঐক্য। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসকারী মানুষের সমাজ ও সংস্কৃতি গঠন ও রুপান্তরের অভিজ্ঞতা এখন সহজেই সকল মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব হচ্ছে। সমাজ-সংস্কৃতির প্রবাহমানতা এবং গতিশীলতা এখন বেড়েছে। বিজ্ঞজনেরা বলেন, গোটা পৃথিবীটাই এখন একটা গ্রামে পরিণত হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধের সময়ে এলাকায় সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন এবং এলাকার মানুষের অবস্থান ও ভূমিকার ওপর প্রভাব অনুসন্ধান

আমরা এই শিখন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জানতে পেরেছি যে যেকোনো সময়ে যেকোনো ধরনের সামাজিক/ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন সেই এলাকার মানুষের অবস্থান ও ভূমিকার ওপরে প্রভাব ফেলে। এখন আমরা সেই ধারণাকে কাজে লাগিয়ে মুক্তিযুদ্ধের সমসাময়িক সময়ে আমার এলাকায় সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের কী কী পরিবর্তন হয়েছিল এবং তখন এলাকার মানুষের অবস্থান ও ভূমিকা কেমন ছিলো তা অনুসন্ধান করে বের করব।

- প্রথমে আমরা অনুসন্ধানের জন্য একটি প্রশ্নমালা তৈরি করবো। নিচে একটি নমুনা দেওয়া আছে। এটির মতো করে তারা দলে বসে আলোচনা করে আমাদের প্রশ্নমালা চূড়ান্ত করব।

প্রশ্নমালা

১. মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমাদের এলাকার মানুষের পেশার কী কোনো পরিবর্তন হয়েছিল? হলে কেন?

২. মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমাদের এলাকায় অবকাঠামোর কোনো পরিবর্তন হয়েছিল কী? হলে কী ধরনের পরিবর্তন ও কেন?

৩. মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমাদের এলাকা পরিচালনার জন্য কোনো রাজনৈতিক বদল হয়েছিল কী? হলে এ পরিবর্তন মানুষের ওপর কেমন প্রভাব ফেলেছিলো?

৪.

৫.

৬.

৭.

৮.

এরপর প্রশ্নমালা ব্যবহার করে নিজ পরিবার ও এলাকার বয়স্ক মানুষদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে দলীয়ভাবে প্রতিবেদন/ পোস্টার তৈরি করে উপস্থাপন করব।

সুরক্ষিত রাখি প্রকৃতি ও মানুষের বন্ধন

সৃষ্টির শুরু থেকেই মানব সভ্যতা ও প্রকৃতির বন্ধন অবিচ্ছেদ্য। প্রাচীনকাল থেকেই আমরা বসবাস থেকে শুরু করে সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করে চলেছি; কখনো সরাসরি আবার কখনো বা তার পরিবর্তিত রূপে। প্রতিদিনের প্রয়োজনে প্রকৃতিকে ব্যবহার করে চলেছি অবিরাম। আমরা আমাদের বেঁচে থাকার সকল উপাদানই পাই প্রকৃতি থেকে। কিন্তু প্রকৃতির উপাদানের এই অবিরাম ব্যবহার কী কোনো বদল ঘটাচ্ছে আমাদের চারপাশের পরিবেশের? তাই যদি হয়, তাহলে তা কী আমাদের জন্য কোন ধরনের বিপদ ডেকে আনতে পারে? এই বিপদ এড়াবার জন্য আমরা প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার বন্ধ করে দিতেও পারছি না, বন্ধ করে দিয়ে বাঁচার উপায় নেই। যে সম্পদ ব্যবহারে প্রকৃতির ক্ষতি নেই সেগুলো ব্যবহারের উপায় আমরা খুঁজে বের করতে পারি। এই উপায় খুঁজে বের করার কাজ সহজ নয় মোটেই। এর জন্য আমাদের প্রকৃতিকে আমরা আরও নিবিড়ভাবে দেখব, জানতে হবে প্রকৃতি ও মানুষের মিথস্ক্রিয়া।

আমরা আমাদের নিচের কাজগুলো করে প্রকৃতিকে ভালোভাবে দেখার ও বোঝার চেষ্টা করব। জেনে নেবো প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্কের সাতকাহন।

- প্রথমে আমরা যে ছবিগুলো দেখছি, সেগুলো সম্পর্কে নিচের ছকে কিছু বাক্য লিখব। বাক্যগুলো হবে এটি কী? কোথায় বা কীভাবে আছে? কীভাবে আমাদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত? এবং এটি হারিয়ে গেলে বা নষ্ট হলে আমরা কী কী সমস্যার সম্মুখীন হতে পারি?

ছবি	বাক্য

- উপরের কাজটি করে প্রকৃতির সকল কিছুর সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক যে কতটা নিবিড় তার কিছুটা বুঝতে পারা গেল। এবার আমরা শিক্ষকের সহায়তায় আমাদের আশেপাশে উদ্ভিদ ও প্রাণীর সন্নিবেশ আছে এমন একটি জায়গা সরাসরি গিয়ে দেখে আসবো। এই পর্যবেক্ষণ থেকে প্রাপ্ত তথ্য দিয়ে আমরা নিচের ছকটি পূরণ করব।

পর্যবেক্ষণকৃত প্রতিবেশের সঙ্গে মানুষের কার্যাবলির প্রভাব

স্থানের ছবি ও নাম	মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক আছে	সমস্যা চিহ্নিতকরণ	সংরক্ষণে করণীয়

- পর্যবেক্ষণ শেষে আমরা আমাদের প্রাপ্ত ফলাফল আমাদের বন্ধুদের ও শিক্ষকের সঙ্গে বিনিময় করব।

বিভিন্ন প্রকার বায়োম সম্পর্কে অনুসন্ধান ও মডেল তৈরি

- আমরা আমাদের পূর্ববর্তী কাজগুলোর মাধ্যমে আমাদের আশপাশের প্রতিবেশ দেখেছি। এসব প্রতিবেশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের কিছুটা জেনেছি। পৃথিবীজুড়েই রয়েছে এরকম অনেক ধরনের প্রতিবেশ। যেসব স্থানের জলবায়ু, উদ্ভিদ ও প্রাণীও আলাদা রকমের, বাংলায় এসব স্থানকে বলে জীবাঞ্চল, ইংরেজিতে বলে বায়োম (Biome)। এসব জীবাঞ্চলগুলোর জলবায়ু কেমন, কেমন ভাবে সেখানে উদ্ভিদ ও প্রাণীর বিন্যাস ঘটেছে এবং সেসব স্থানের ভারসাম্য যদি নষ্ট হয়ে যায় বা যেভাবে আছে সেভাবে আর না থাকে, তাহলে আমাদের জীবনে তার কী ধরনের প্রভাব পড়তে পারে সে বিষয় তোমাদের জানতে হবে। এসব জানা হলে আমরা প্রকৃতি ধ্বংস না করে প্রকৃতি ব্যবহারের কথা ভাবতে পারব। এসব বিষয় অনুসন্ধান করে আমরা বের করব জীবাঞ্চলগুলোর সঙ্গে মানুষ ও প্রকৃতির মিথস্ক্রিয়া।
- এ কাজটি করার জন্য আমরা প্রথমে পৃথিবীর একটি মানচিত্র দেখব, পরে আমরা মানচিত্রে প্রদর্শিত স্থানগুলো গ্লোব বা পৃথিবীর মানচিত্রের সাহায্যে খুঁজে বের করে আমাদের বইয়ে দেওয়া ছকে সেগুলো লিখব।

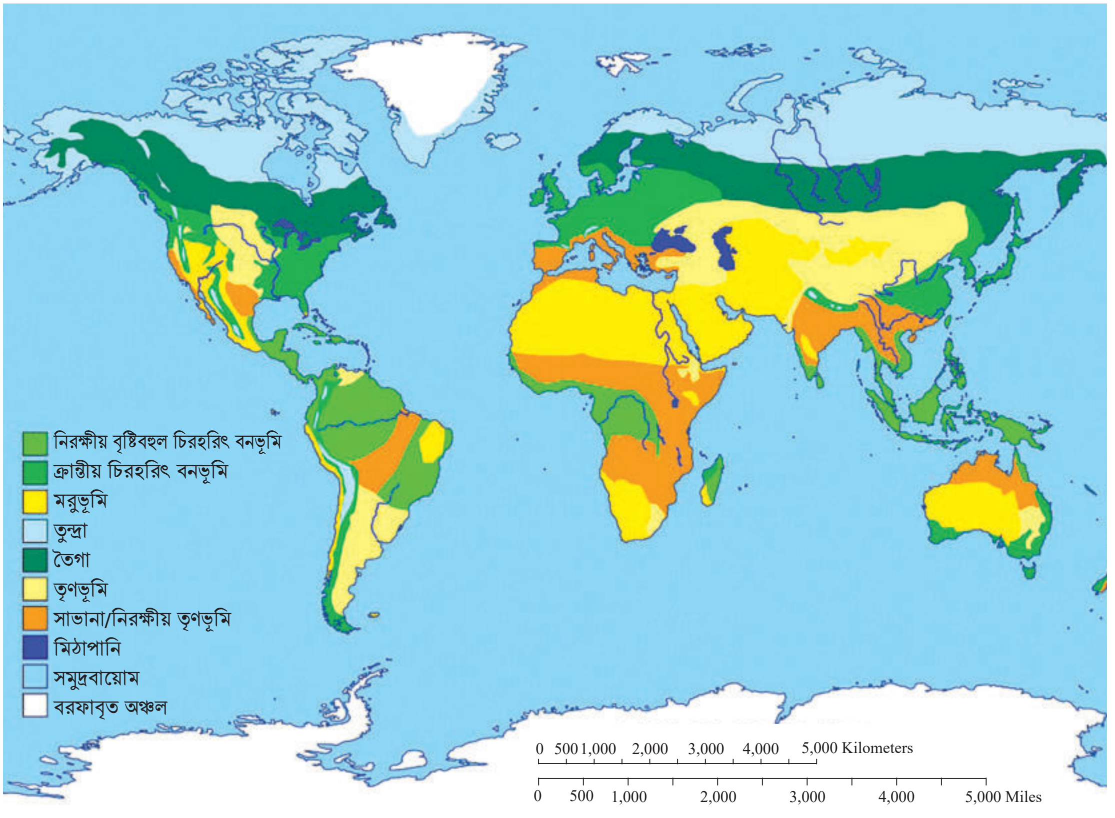

মানচিত্রে প্রদর্শিত স্থানের নাম	পৃথিবীর মানচিত্রে অবস্থান

- এবার আমরা এসব বায়োম সম্পর্কে আরেকটু ভালোভাবে জেনে নেব। যেকোনো বিষয় সম্পর্কে জানার গভীরে যেতে বিষয়টি নিয়ে অনুসন্ধান করতে হবে। সেজন্য আমরা দলে ভাগ হয়ে প্রতিটি দল একটি করে বায়োম নিয়ে অনুসন্ধান করব। এই অনুসন্ধান কাজটি আমরা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান পদ্ধতির ধাপ মেনে করবো। অনুসন্ধানের জন্য আমরা প্রথমে একটি প্রশ্নমালা তৈরি করব। প্রশ্নমালাটি আমরা নিচের মতো করে তৈরি করতে পারি, আবার এর সাহায্য নিয়ে অন্যরকম ভাবেও করতে পারি।

বায়োম নিয়ে অনুসন্ধান

১. বায়োমটি কোথায় কোথায় আছে?
২. সেখানে কোন ধরনের জলবায়ু বিদ্যমান?
৩. কী কী ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণীর সন্নিবেশ দেখা যায়?
৪. উক্ত বায়োমটি পৃথিবীর জন্য কী কী সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে?
৫. উক্ত বায়োমটির জলবায়ু ও অন্যান্য সমাবেশের পরিবর্তন হলে কী কী সমস্যা দেখা দিতে পারে?
৬.
৭.
৮.

- এই অনুসন্ধান কাজের জন্য আমাদের যে যে তথ্য লাগবে, তা আমরা আমাদের বইয়ের শেষে যে অনুসন্ধানী পাঠ অংশ থেকে নিতে পারি অথবা ইন্টারনেটের সাহায্যও নিতে পারি।
- অনুসন্ধানের কাজ শেষ হলে আমরা আমাদের নিজ নিজ দলের অনুসন্ধান থেকে প্রাপ্ত ফলাফল বায়োমের মডেল আকারে উপস্থাপন করব এবং প্রতিটি প্রতিবেদন লেখার নিয়ম মেনে একটি প্রতিবেদন লিখে শিক্ষকের কাছে জমা দেবো।

বায়োম মডেল

বৈশ্বিকভাবে বাংলাদেশের বিদ্যমান প্রাকৃতিক সম্পদের (বনভূমি) পরিবর্তন এবং এর ফলে সৃষ্ট ঝুঁকী অনুসন্ধান

আমরা তো দেখলাম, আমরা আমাদের চারপাশের পরিবেশের ওপর কতটা নির্ভরশীল, আর এই পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখছে বনভূমি। আমাদের বাঁচতে হলে যেমন প্রকৃতিকে প্রয়োজন, তেমনি প্রকৃতির টিকে থাকার জন্য দরকার বনভূমি। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশসহ পুরো পৃথিবীতেই বনভূমির সংখ্যা উল্লেখযোগ্য আকারে কমে যাচ্ছে। এবারে আমরা জানবো, বনভূমি কোথায় কোথায় কমে যাচ্ছে কিংবা তার বর্তমান অবস্থা কী। এর জন্য প্রথমে আমাদের জানতে হবে পৃথিবীর কোথায় কোথায় বনভূমি রয়েছে এবং সেসব কী নামে পরিচিত। আমরা পরবর্তী কয়েকটি কাজের মাধ্যমে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন বনভূমি কোথায় অবস্থিত এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেসব বনভূমির কী ধরনের পরিবর্তন এসেছে তা অনুসন্ধান করে বের করি।

- প্রথমে আমরা পৃথিবীর মানচিত্র বা একটি গ্লোবের সাহায্যে পৃথিবীর বিখ্যাত বনভূমিগুলো কোনো কোনো দেশে আছে এবং তারা কোন মহাদেশের অন্তর্গত তা খুঁজে বের করব;তারপরে নিচের ছকটি পূরণ করব।

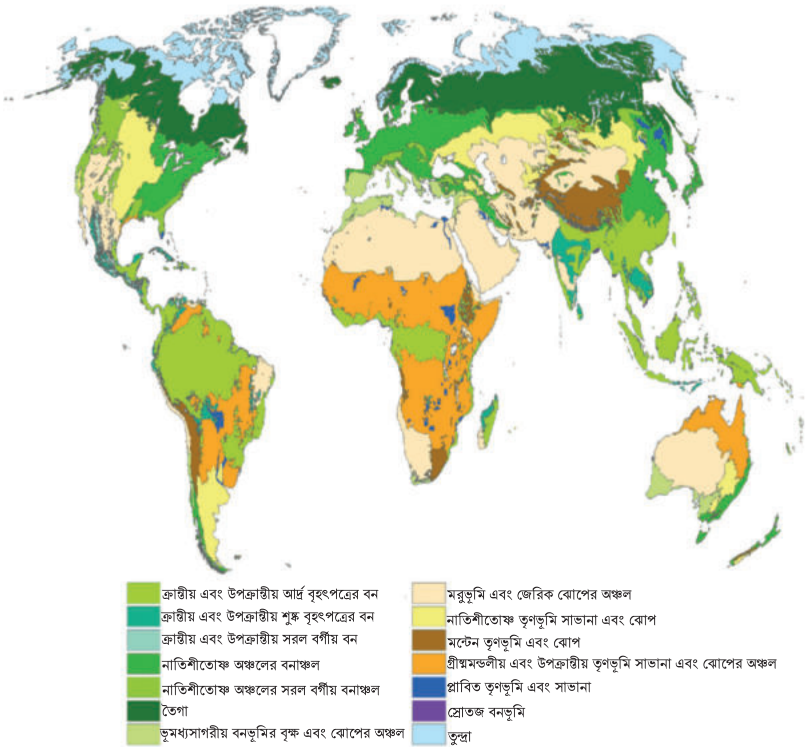

বনভূমির নাম	মহাদেশ ও দেশের নাম

- এই পৃথিবীর অনেকগুলো বনভূমির কথা আমরা জানলাম, দেখলাম সেগুলোর নামের বৈচিত্র্য। এখন আমরা জানব এই বনভূমিগুলো কী অবস্থায় আছে। এ জন্য আমরা পৃথিবীর মানচিত্রের সাহায্যে বনভূমিগুলোর ২০০০ সাল এবং ২০২০ সালের অবস্থার পরিবর্তনের তুলনা করব।

পৃথিবীর মানচিত্রে বন আচ্ছাদিত অঞ্চল ২০০০ ও ২০২০ সালের তুলনামূলক আলোচনা	

বাংলাদেশের বনভূমি:

- এবার আমরা চোখ রাখব আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির বনাঞ্চলের দিকে । অনুসন্ধান করে বের করব বনজ সম্পদের বর্তমান অবস্থা; খুঁজে বের করব বাংলাদেশের প্রকৃতিকে বাঁচানোর উপায়। তাহলেই আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশকে বাঁচানোর কথা আমরা ভাবতে পারব। এভাবে সারা পৃথিবীর মানুষ নিজ নিজ মাতৃভূমির দিকে ফিরে তাকালে সারা পৃথিবীর প্রকৃতি ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা পাবে।

অনুশীলনী

প্রথমে আমরা বাংলাদেশের মানচিত্রের সাহায্যে বাংলাদেশের প্রধান প্রধান বন আচ্ছাদিত এলাকার অবস্থান দেখবো এবং তারপর বাংলাদেশের একটি খালি মানচিত্রে বিভিন্ন রঙ ব্যবহার করে বনভূমিগুলোর অবস্থান চিহ্নিত করব।

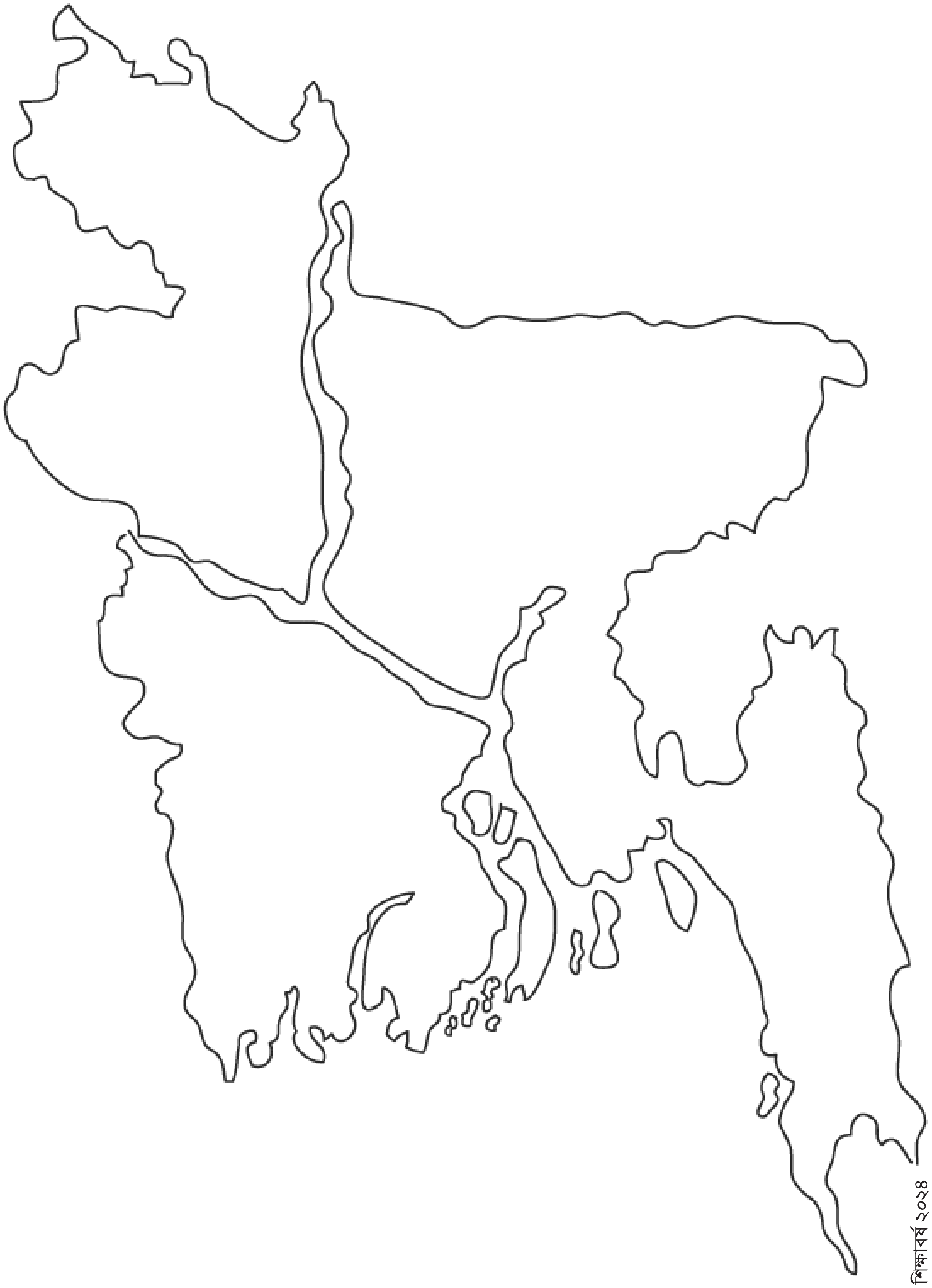

- এবারে আমরা যেসব বনভূমির নাম ও অবস্থান জানলাম, সময়ের সঙ্গে সেসবের পরিবর্তনের ধরন দেখব।

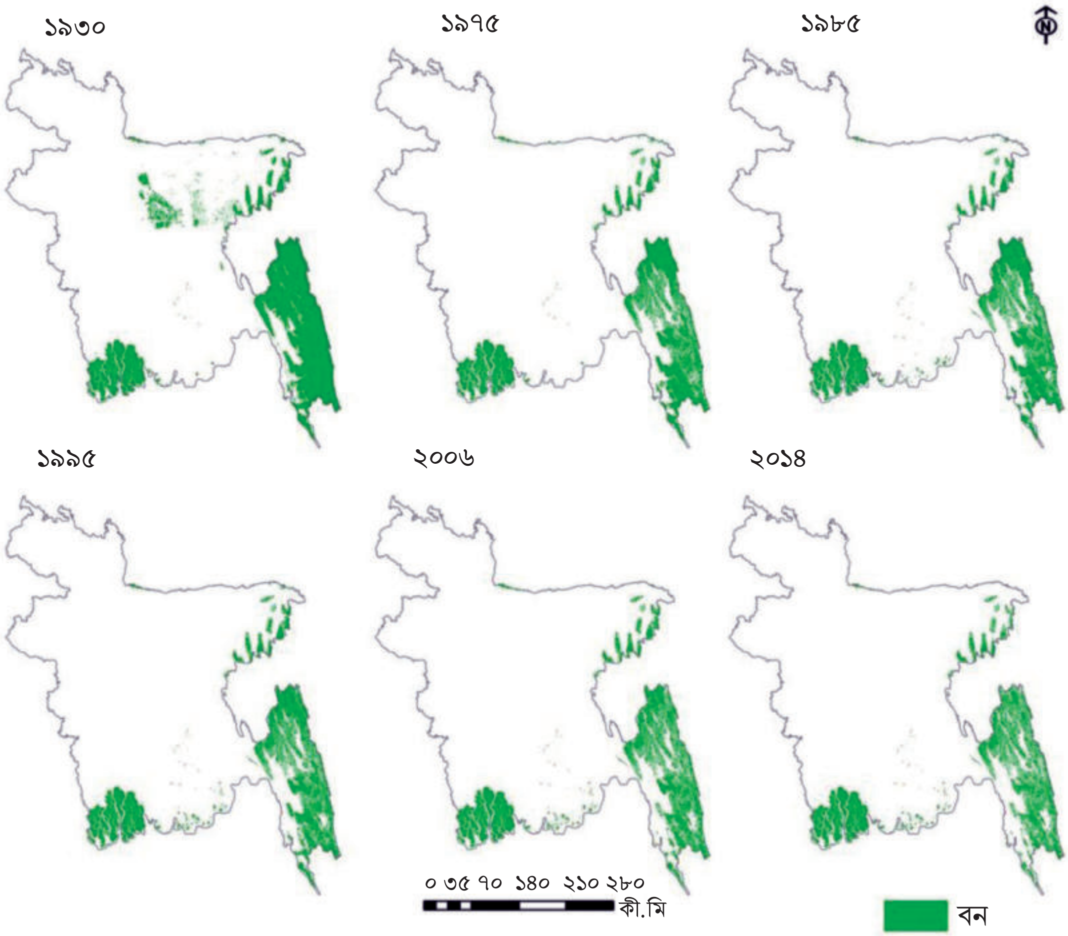

- উপরে বাংলাদেশের বনভূমির দিন দিন কমে যাওয়া দেখলাম। এর ফল যে ভালো নয়, তা তো তোমরা জানোই। কিন্তু এর ফলে ঠিক কোনো কোনো ধরনের বিপদে আমরা পড়তে পারি তা জানতে হলে বা বিপদের মাত্রা নির্ধারণ করতে হলে আমাদের আরও গভীরভাবে জানতে হবে। আর এর জন্য এবার আমরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুসন্ধান করব।
- আমরা এই অনুসন্ধানের কাজটি দলীয়ভাবে করব। আর এর বিষয় হবে –

ক. বাংলাদেশের বনভূমির কী কী পরিবর্তন হয়েছে?

খ. পরিবর্তনের কারণগুলো কী কী?

গ. পরিবর্তনের ফলাফল কী হতে পারে?

ঘ. প্রকৃতির টেকসই সংরক্ষণে কী কী ভূমিকা নেওয়া যেতে পারেন?

- এই অনুসন্ধান কাজের তথ্য আমরা পাব অনুসন্ধানী পাঠ অংশে বা ইন্টারনেটের সাহায্যও নেওয়া যেতে পারে।
- অনুসন্ধানের কাজ করার সময় আমরা নিচের ছকে প্রদত্ত সূচকগুলো মনে রেখে করব ।
- অনুসন্ধান পরবর্তী ফলাফল পোস্টারের মাধ্যমে অথবা নাটক আকারে উপস্থাপন করব।

বনভূমির নাম ও অবস্থান	বর্তমানে কী কী পরিবর্তন হয়েছে	পরিবর্তনের কারণসমূহ	এসব পরিবর্তন আমাদের জীবনে কোন কোন প্রভাব ফেলতে পারে/ ফলাফল	টেকসই উন্নয়নে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও আমাদের করণীয়

আমরা আমাদের পূর্ববর্তী কাজের মাধ্যমে এটা বুঝতে পারলাম যে মানুষ দিন দিন প্রকৃতির একটা ছোটো অংশ হয়েও অবিরত প্রকৃতিকে ধ্বংস করে চলছে, নষ্ট হয়ে যাচ্ছে প্রাকৃতিক ভারসাম্য। এর ফল যে কতটা মারাত্মক তা ক্রমবর্ধমান প্রাকৃতিক দুর্যোগ আমাদের মনে করিয়ে দেয়। এখন আমরা পরবর্তী কাজগুলোর মাধ্যমে পৃথিবীব্যাপী ও বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া কিছু প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে একটু খোঁজখবর নিতে পারি।

- প্রথমে আমরা ষষ্ঠ শ্রেণিতে যে ভূমিরূপের অভিধান তৈরি করেছিলাম, সেই কথা মনে করার চেষ্টা করি। কেউ ভুলে গিয়ে থাকলে পুরানো বই জোগাড় করে দেখে নিতে পারবে। এখন আমরা আমরা প্রতিটিতে ষষ্ঠ শ্রেণির মতো একটি অভিধান তৈরি করব। তবে সেটি হবে আমাদের দুর্যোগ অভিধান। কাজটি করার জন্য আমরা একটি ডায়েরি বানাব, পরে আমরা যে যে দুর্যোগ সম্পর্কে জেনেছি ,তার প্রতিটির একটি করে ছবি এবং সেটি সম্পর্কে কয়েকটি লাইন লিখব।

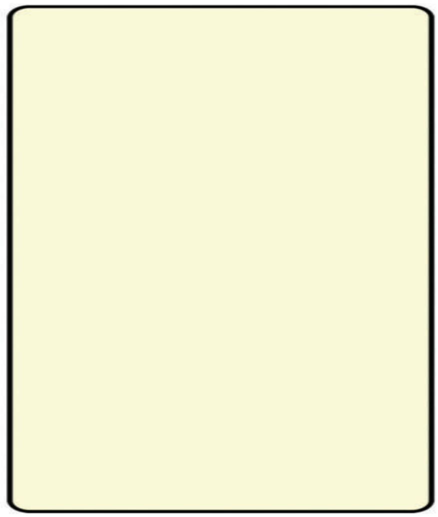

দুর্যোগ অভিধান

- আমাদের অভিধান বানানো হলে আমরা আমাদের বন্ধুদের সঙ্গেও তা বিনিময় করব।

- এরপর আমরা দলে ভাগ হয়ে প্রকল্পভিত্তিক কাজের মাধ্যমে আমাদের এলাকায় কোন কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়, এ সকল দুর্যোগের কারণে আমাদের কোন কোন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় এবং এটি প্রতিরোধ করতে টেকসই ব্যবস্থাপনা কী কী হতে পারে তা অনুসন্ধান করে বের করব। এই অনুসন্ধানের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য আমরা আমাদের পরিবার বা এলাকায় মানুষদের কাছ থেকে নিতে পারব।

- আমরা আমাদের ফলাফলগুলো নিয়ে একটি পত্রিকা তৈরি করব। আমাদের পত্রিকার শিরোনাম হবে আমাদের সংবাদপত্র: দুর্যোগ সংখ্যা।

আমাদের সংবাদপত্র

দুর্যোগ সংখ্যা

টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে কার্যকর ভূমিকা পালন

আমরা জানি আমরা বাঁচার জন্য প্রকৃতির ওপর কতটা নির্ভরশীল। অনেকগুলো কাজের মাধ্যমে আরও জানলাম প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্ক কতটা নিবিড়। কিন্তু আমরা কেবল প্রকৃতি থেকে নিচ্ছি, কিন্তু কিছুই ফিরিয়ে দেওয়ার কথা ভাবছি না। আমরা যদি প্রকৃতিকে সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার না করি, যদি এভাবে চলতে থাকে, তাহলে একদিন প্রকৃতির আমাদেরকে দেওয়ার ক্ষমতা নিঃশেষ হবে যাবে। তাহলে আমরা প্রকৃতি ঠিক রেখে আমাদের

প্রয়োজন মেটানোর পরিকল্পনা করব। আর এর নাম হলো টেকসই উন্নয়ন। এই পদ্ধতির উন্নয়নের মাধ্যমেই আমরা আমাদের এই বন্ধন আরও সুদৃঢ় করতে পারব। তাহলে আমাদেরও উচিত আমাদের নিজস্ব পরিসরে টেকসই উন্নয়নের চর্চা করা, তাই না? এ কাজগুলো আমরা আমাদের সক্রিয় নাগরিক ক্লাব ও প্রকৃতি সংরক্ষণ ক্লাবের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করব।কিন্তু আমরা এখনো ছোটো, তাই আমরা আমাদের এসব কাজে এলাকার মানুষের সহযোগিতা নেবো।

চলো, তাহলে আমরা কী কী কাজ করতে পারি, তার একটি তালিকা দলে বসে চূড়ান্ত করে ফেলি।
১.
২.
৩.
৪.
৫.

এলাকায় সম্পদের টেকসই ব্যবহারমূলক কাজ:

১. বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে পচনশীল ও অপচনশীল এই দুই ধরনের বর্জ্য আলাদা করে সংগ্রহ করার জন্য ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভায় অনুরোধ পত্র প্রেরণ ও বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ।

২. এলাকায় পুকুর, খাল বা অন্যান্য পানির উৎস যা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তা পুনরায় ব্যবহার যোগ্য করে তোলার জন্য ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভায় অনুরোধপত্র প্রেরণ এবং বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ।

৩. এলাকায় ও নিজের আবাসনে পানি, গ্যাস, বিদ্যুৎসহ সব ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারে টেকসই ব্যবস্থাপনা গ্রহণ।

৪. নালা পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য এলাকাবাসীকে সচেতন করা।

৫. সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

সবশেষে এটা আমাদের মনে রাখতে হবে জলবায়ুজনিত দুর্যোগের কারণে বাংলাদেশের সামনে অপেক্ষা করছে অনেক বড়ো চ্যালেঞ্জ। আর এই সকল চ্যালেঞ্জ তখনই মোকাবিলা করতে পারব যখন আমরা টেকসইভাবে সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং দুর্যোগ মোকাবিলা করতে সক্ষম হব। আর এই কাজে আমরা সফল হব তোমাদের মতো ভবিষ্যৎ নাগরিকদের মাধ্যমে, তোমরাই গড়ে তুলবে জলবায়ু পরিবর্তনে অভিঘাত-সহিষ্ণু নিরাপদ সমৃদ্ধ বদ্বীপ।

সুরক্ষিত রাখি প্রকৃতি ও মানুষের বন্ধন: অনুসন্ধানী অংশ

তুন্দ্রা বায়োম

আমাদের আবাসভূমি এ পৃথিবী এমন এক অনন্য গ্রহ, যেখানে বিভিন্ন পরিবেশে নানা ধরনের জীবের সন্নিবেশ ঘটেছে। বিশাল সমুদ্র থেকে সুউচ্চ পর্বত পর্যন্ত সমগ্র পৃথিবীর উদ্ভিদ ও প্রাণী তাঁদের পরিবেশের সঙ্গে একটি বিস্ময়কর সমন্বয়ের মাধ্যমে একে অন্যের পরিপূরক হিসাবে কাজ করছে। পৃথিবীর কোনো একটি অঞ্চলে বিশেষ ধরনের জলবায়ু ও মৃত্তিকায় বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণী নিয়ে গঠিত স্বতন্ত্র ভৌগোলিক এলাকাকে বায়োম বলা হয়ে থাকে। বায়োমকে বাংলায় জীবভূমি বা জীবাঞ্চলও বলা যেতে পারে। প্রাণী বা উদ্ভিদের আবাসস্থলের (Habitat) থেকে বড়ো পরিসরে জলবায়ু, ভূ-প্রকৃতি, মৃত্তিকা ইত্যাদিসহ বিবেচনায় নিয়ে বায়োমকে চিন্তা করা হয়। এই বৈচিত্র্যময় বায়োমগুলো বাস্তুতন্ত্র (Ecosystem) বজায় রাখে এবং বিভিন্ন প্রজাতিকে ধারণ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই অংশে আমরা বায়োমের আকর্ষণীয় জগৎকে জানব এবং এর অস্তিত্বের সৌন্দর্য ও গুরুত্ব অনুধাবন করব।

১. তুন্দ্রা (Tundra): তুন্দ্রা বায়োম হলো এমন অঞ্চল, যেখানে তাপমাত্রা খুব কম, শীতকাল দীর্ঘ এবং জীবের উৎপাদনকাল সংক্ষিপ্ত। এখানকার মাটি ঠান্ডা এবং অপেক্ষাকৃত কম উর্বর, ছোটো আকারের খুব অল্প গাছপালা জন্মায়। বৃষ্টিপাত খুবই অল্প, কিন্তু প্রায়ই প্রবল বায়ুপ্রবাহ হতে দেখা যায়। মানব বসতিহীন তুন্দ্রা অঞ্চলকে এর বৈশিষ্ট্যের কারণে মেরু মরুভূমিও বলা হয়ে থাকে। বরফ আবৃত আর্কটিক অঞ্চলের নিচেই তুন্দ্রা বায়োম অবস্থিত যা উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ এবং এশিয়ার সাইবেরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত। আলাস্কা এবং কানাডার প্রায় অর্ধেক অংশ তুন্দ্রা বায়োমের অন্তর্গত। আর্কটিক তুন্দ্রা অঞ্চলে স্থায়ীভাবে হিমায়িত মাটির স্তর দেখা যায়

যাকে Permafrost বলা হয়। এখানে বসবাসকারী প্রাণীদের ত্বকের নিচে পুরু চর্বির স্তর থাকে এবং গায়ের বর্ণ সাধারণত তুষারের মতোই সাদা হয়, যা তাঁদেরকে অভিযোজনে সহায়তা করে। মেরুভাল্লুক, বল্গা হরিণ, আর্কটিক শিয়াল, সামুদ্রিক সিংহ, বিভিন্ন ধরনের সিল ইত্যাদি বলিষ্ঠ প্রাণী প্রজাতি এই কঠিন পরিবেশে টিকে থাকতে পারে। পরিযায়ী পাখি যাঁরা শীতকালে দক্ষিণে চলে যায় তাঁদেরকেও এ তুন্দ্রা অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায়। আপাতদৃষ্টিতে যদিও তুন্দ্রা অঞ্চলকে বৃক্ষহীন মনে হয় তবে এখানে স্বল্পস্থায়ী গ্রীষ্মকালীন আবহাওয়ায় ফুল ফোটে এবং দ্রুত বৃদ্ধি হয় এমন লোমশ ডালপালার ক্ষুদ্র আকারের উদ্ভিদ, যেমন:তুলা, লাইকেন, এমাপোলা, বেরি ইত্যাদি দেখা যায়। এই বায়োম বৈচিত্র্যপূর্ণ উদ্ভিদ ও প্রাণীর সমাবেশ ঘটিয়ে জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ করেছে। তবে বিশ্বজুড়ে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে এ অঞ্চলেও পরিবেশের পরিবর্তন হচ্ছে। বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন তুন্দ্রা অঞ্চলের বরফ আগামী কিছুদিনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে গলে যেতে পারে। তাতে এখানকার উদ্ভিদ ও প্রাণীর বংশবিস্তার ও স্বাভাবিক জীবন ব্যাহত হবে। যথাযথ পরিবেশ না পাওয়ার কারণে অনেক প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। আবার গলে যাওয়া বরফ থেকে যে পানি তৈরি হবে তা সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি করবে। এতে আমাদের দেশের মতো সমুদ্র উপকূলীয় সমতল ভূমির দেশ সমূহে নানারকম সমস্যা, যেমন: নিম্নভূমি তলিয়ে যাওয়া, লবণাক্ত এলাকার বিস্তৃতি এবং কৃষিকাজ ব্যাহত হয়ে খাদ্য উৎপাদন হ্রাসের ঘটনা ঘটতে পারে। আমাদের দেশের মতো ঘনবসতিপূর্ণ দেশে উপকূলীয় অঞ্চলের কিছু অংশ তলিয়ে গেলে সেখানকার ব্যাপকসংখ্যক লোকজনের জলবায়ু-উদ্বাস্তু হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে।

২. তৈগা বায়োম (Taiga Biome): তৈগা (Taiga) একটি রাশিয়ান শব্দ, যার অর্থ হল সরলবর্গীয় অরণ্য বা পাইন বন। উত্তর গোলার্ধে তুন্দ্রা অঞ্চলের দক্ষিণে অবস্থিত উত্তর আমেরিকা ও ইউরেশিয়া, বিশেষভাবে কানাডা এবং রাশিয়ার সুবিস্তৃত সরলবর্গীয় অরণ্য অঞ্চলই হলো তৈগা। তুন্দ্রা বায়োমের যেখানে শেষ তার দক্ষিণে তৈগা বায়োম শুরু যা কর্কটক্রান্তি রেখার উত্তরে ৫০ থেকে ৭০ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশের মাঝখানে ছড়িয়ে আছে। এটি রাশিয়া, কানাডা, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র (মূলত আলাস্কা অঞ্চল), সুইডেন, ফিনল্যান্ড, নরওয়ে, এস্টোনিয়া, ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য (মূলত স্কটিশ উচ্চভূমি অঞ্চল), আইসল্যান্ড, কাজাখস্তান (উত্তরাংশ), মঙ্গোলিয়া (উত্তরাংশ), জাপান (হোক্কাইডো দ্বীপ) প্রভৃতি দেশে বিস্তৃত রয়েছে। ইংরেজিতে Boreal Forest বা Snow Forest নামে পরিচিত। এই বায়োমের প্রধান উদ্ভিদ প্রজাতিগুল হলো পাইন, বার্চ, লার্চ, এল্ডার, উইলো, পপলার, ওক, ম্যাপল, স্প্রুস, ফার প্রভৃতি। তৈগা বায়োমের প্রধান প্রাণী প্রজাতিগুল হলো বাদামী ভালুক, কালো ভালুক, সাইবেরিয়ান বাঘ, নেকড়ে, বগ্লা হরিণ, লাল শিয়াল, ভোঁদড়, নেউল, বিভিন্ন প্রজাতির পাখি প্রভৃতি। এ বায়োমের সরলবর্গীয় অরণ্য বা পাইন বনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এধরনের গাছের পাতাগুলো ফলা আকৃতির এবং উপর দিকে খাড়া থাকে। এগুলোর ডালপালা ছড়ায় না বিশেষ, সোজা ওঠে যায় বলে এগুলো সরল বর্গের গাছ বা সরলবর্গীয় বৃক্ষ। এর ফলে শীতকালে এর ওপরে পড়া তুষার বা বরফ সহজেই মাটিতে ঝরে যায়। এ বায়োমে সারাবছরই তুষারপাত বা বৃষ্টি লক্ষ্য করা যায়। সাধারণত বছরের শীতকালের ছয় মাস এখানে নিরবচ্ছিন্নভাবে যে তুষারপাত হয় তার গড় উচ্চতা ৫০ থেকে ১০০ সে.মি. হয়ে থাকে। দুই থেকে তিন মাস স্থায়ী গ্রীষ্মকালে এই বায়োমে গড়ে ৭৫ সে.মি. এর মতো বৃষ্টিপাত হয়। তুন্দ্রার মতো তৈগা বায়োমও জলবায়ু পরিবর্তন এবং মানুষের আগ্রাসী মনোভাবের শিকার হচ্ছে।

৩. নিরক্ষীয় ও ক্রান্তীয় চিরহরিৎ বনাঞ্চল (Tropical Rainforest): এই বায়োম হলো সতেজ এবং প্রাণবন্ত বাস্তুতন্ত্র যা প্রচুর বৃষ্টিপাত এবং ঘন গাছপালা সমৃদ্ধ। এক সময়ে পৃথিবীর সমগ্র ভূভাগের প্রায় ১৪ শতাংশ জুড়ে এ বনভূমি থাকলেও তা এখন কমে প্রায় ৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। বিষুবরেখার উত্তর বা দক্ষিণে ১০ ডিগ্রি অক্ষাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত নিরক্ষীয় চিরহরিৎ বনাঞ্চল বৈচিত্র্যময় উদ্ভিদ এবং প্রাণী প্রজাতির আবাসস্থল।

মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা, পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকা, দক্ষিণ- পূর্ব এশিয়া ইন্দো মালয়েশিয়া অঞ্চল, নিউগিনির দ্বীপসমূহ এবং অস্ট্রেলিয়ায় এই বায়োম ছড়িয়ে আছে। নিরক্ষীয় চিরহরিৎ বনের গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত হল আমাজন বনাঞ্চল যা অক্সিজেন উৎপাদনে বিশেষ ভূমিকা রাখে। এ কারণে এটি 'পৃথিবীর ফুসফুস' হিসাবে পরিচিত। এটি বিশ্বের বায়ুমন্ডলের কার্বন শোষণ ও জলবায়ু নিয়ন্ত্রণে অবদান রাখছে। এছাড়াও এটি অসংখ্য প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণীর আবাস স্থল, যার অনেকগুলো এখনো আবিষ্কৃত হয়নি বলে মনে করা হয়। নিরক্ষীয় ও ক্রান্তীয় চিরহরিৎ বনাঞ্চলের উদ্ভিদগুলো দ্রুত বৃদ্ধিপায় এবং গাছপালা খুব ঘন থাকায় সেগুলোর মধ্যে সূর্যের আলো পাওয়ার জন্য একধরনের প্রতিযোগিতা দেখা যায়। এ ধরনের বনভূমির কিছু এলাকায় ঘন বৃক্ষরাজির কারণে সূর্যালোক মাটির কাছে পৌঁছায় না। এ বনভূমির মাটি বৃষ্টির কারণে বেশিরভাগ সময় আর্দ্র এবং স্যাঁতস্যাঁতে থাকে। এখানকার গড় তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এবং দিন-রাতের তাপমাত্রার ব্যবধান খুবই কম। এ অঞ্চলে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ২০০ সে.মি. এর বেশি। তবে নিরক্ষরেখা থেকে দূরত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমতে থাকে। এখানকার গাছের পাতাগুলো বেশ বড়ো এবং প্রশস্ত হয় এবং সারাবছর ধরে সবুজ থাকে। একারণেই এ বনভূমিকে চিরসবুজ বন বলা হয়। এই বায়োমে প্রধানত তিন ধরনের উদ্ভিদ দেখা যায়। যথা: বৃক্ষ, লতানো বা আরওহী উদ্ভিদ এবং পরজীবী বা পরগাছাজাতীয় উদ্ভিদ।

এ ধরনের বনে বৃক্ষপ্রজাতির মধ্যে যথেষ্ট বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। প্রধান বৃক্ষের মধ্যে রয়েছে রোজউড, রাবার, আবলুস, মেহগনি, চাপালিস, গর্জন ইত্যাদি। লতানো বা আরওহী উদ্ভিদের মধ্যে আছে ফার্ন, লিয়ানাস। পরজীবী ও আরওহী উদ্ভিদের মধ্যে রয়েছে অর্কীড, মস, লিচেন, শৈবাল ইত্যাদি। অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত ও উষ্ণতার কারণে এই বায়োমে উদ্ভিদের দ্রুত বৃদ্ধি হয় বলে প্রাণীদের খাদ্যের জন্য অন্যত্র যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। এ বনের ভূমিতে অবস্থানকারী প্রাণীদের মধ্যে আছে হরিণ, হনুমান, কটিমুন্ডিসের মতো প্রাণী। শিম্পাঞ্জী, বাইসন, হাতি, চিতাবাঘ, গরিলার মতো প্রাণীরা এ বনের ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে সহজেই চলাচল করতে পারে। এ বনে রাতের বেলায় সক্রিয় প্রাণীর মধ্যে আছে অপসাম, আর্মাডিলো, জাগুয়ার, পেঁচা ইত্যাদি। এ বনে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বৈচিত্র্যপূর্ণ পাখির সমাবেশ দেখা যায়। পাখির মধ্যে বাজপাখি, সুইফ্ট, কুরাসোস্, টিনামুস, হামিং, বাদুড়, পতঙ্গভুক ময়ূর, বিভিন্ন প্রজাতির মোরগ, দীর্ঘ ঠোঁটের টোকান, লম্বা লেজওয়ালা টিয়া, বারবেট, কটিঙ্গা, বিলবার্ড ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। নিরক্ষীয় চিরহরিৎ বায়োমের প্রাথমিক পর্যায়ে উৎপাদন সর্বাধিক যা পৃথিবীর সমগ্র উদ্ভিদের প্রাথমিক উৎপাদনের (সূর্যালোক ব্যবহার করে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় খাদ্য উৎপাদন) প্রায় ৪০ শতাংশ। তবে বিশ্ব জুড়েই মানুষের নির্বিচার বৃক্ষ নিধনের শিকার এ বনভূমিও। অনেক দেশে এ বনভূমি ধ্বংস করে কৃষিজমিতে রুপান্তর করা হয়েছে। যার ফলে বনভূমির উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে, বন্যপ্রাণী, পাখি তাঁদের বাসভূমি হারিয়েছে। এতে আমাদের জন্য বেশ কিছু কৃষিজমি বাড়লেও পরিবেশগত নানা ঝুঁকীর সৃষ্টি হয়েছে। পাহাড়ি এলাকার বনভূমিতে বৃক্ষ নিধনের ফলে সেখানে ভূমিক্ষয় ও ভূমিধসের মতো প্রাকৃতিক দূর্যোগের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া বনভূমি ধ্বংসের কারণে জীববৈচিত্র্যও ঝুঁকীর সম্মুখীন হচ্ছে।

তবে অনেক রাষ্ট্রই এ ব্যাপারে নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে বনভূমির বিনাশ মোকাবিলায় কাজ করছে।

৪. মরুভূমি (Desert): চিরহরিৎ বনাঞ্চলের সতেজ ও প্রাণবন্ত পরিবেশের বিপরীতে মরুভূমি হলো শুষ্ক বায়োম যা সবচেয়ে কম বৃষ্টিপাত এবং রাত-দিনের তাপমাত্রার অনেক বেশি তারতম্যের জন্য পরিচিত। এ ধরনের বায়োমে বার্ষিক বৃষ্টিপাত ২০-পঁচিশে সে.মি. থেকে বেশি নয়। নিরক্ষীয় অঞ্চল থেকে বায়ু আরওহণ প্রক্রিয়ায় জলীয়বাষ্প হারিয়ে মরু অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হওয়ায় এখানকার বাতাস অত্যন্ত শুষ্ক থাকে। আর জলীয়বাষ্প কম থাকায় সূর্যরশ্মি সরাসরি ভূমিতে পড়ে দিনের বেলায় অতিদ্রুত তাপমাত্রা বাড়িয়ে দেয়। আবার

বাতাসে আর্দ্রতা কম এবং আকাশে মেঘের উপস্থিতি না থাকায় রাতের বেলায় ভূপৃষ্ঠ দ্রুত তাপ হারিয়ে শীতল হয়ে যায়। মরুভূমিগুলো বিস্তীর্ণ বালিয়াড়ি নিয়ে গঠিত এক অনন্য ভূমিরূপ ধারন করে। এক সময়ে এসব মরূভূমিতে বড়ো বড়ো পাথর ছিল যা দিনের তাপ আর রাতের শীতল আবহাওয়ার কারণে যথাক্রমে প্রসারণ ও সংকোচনের মাধ্যমে ভেঙে ক্রমে বালির সৃষ্টি হয়। এখানে স্থায়ী বা সাময়িক কোনো জলাশয় বা জলধারা দেখা যায়না।

আপাতদৃষ্টিতে মরু বায়োমের প্রকৃতি চরম ভাবাপন্ন হওয়া সত্ত্বেও এখানে অনন্যভাবে অভিযোজিত গাছপালা এবং প্রাণী রয়েছে। তবে মরু বায়োমে উদ্ভিদ বা প্রাণীর বৈচিত্র্য অন্য বায়োমের চেয়ে তুলনামূলকভাবে কম। মরুতে যেসব উদ্ভিদ জন্মায় সেগুলো মূলত জেরোফাইটিক শ্রেণির যেগুলো শুষ্ক আবহাওয়ায় টিকে থাকতে পারে। শক্ত ঘাস, কাঁটাযুক্ত ও লম্বা শিকড়যুক্ত ঝোপঝাড়, যেমন ক্যাকটাস, খেজুর ইত্যাদি মরুভূমির পরিচিত উদ্ভিদ। স্বল্পস্থায়ী আর্দ্র ঋতুতে কিছু ঘাস জাতীয় উদ্ভিদের ফুল ফুটতে দেখা যায়। প্রাণীদের আকার তুলনামূলকভাবে ছোটো এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এগুলো নিশাচর। মরুভূমির কীটপতঙ্গের মধ্যে রয়েছে বিচ্ছু, মাকড়সা এবং অন্যান্য পোকামাকড়। টিকটিকী, গিলা দানব, রেটেল স্নেক ইত্যাদি বেশ কিছু সরীসৃপ এ পরিবেশে অভিযোজিত হয়েছে। স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে উট, ক্যাঙ্গারু, সাদা লেজের হরিণ, পাহাড়ি ভেড়া, খরগোশ, ইঁদুর, শিয়াল, ব্যাজার অন্যতম। পাখির মধ্যে ক্যাকটাস-কাঠঠোকরা, দাঁড়কাক, গর্ত করা প্যাঁচা, টার্কী, শকুন, সুইফ্ট, গিলা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো মরুভূমি সাহারা যা আফ্রিকা মহাদেশে অবস্থিত। এটা লক্ষনীয় যে, মরুভূমির উদ্ভিদ ও প্রাণীগুলো পৃথিবীর জীববৈচিত্র্যের অনন্য নিদর্শন। এদের উপস্থিতি প্রকৃতির ভারসাম্যের জন্য অত্যাবশ্যক। মানুষের নানা কর্মকান্ডের মাধ্যমে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে যাতে এসব জীবের বংশবৃদ্ধি এবং স্বাভাবিক জীবন ব্যাহত না হয়, সেজন্য মানুষকেই উদ্যোগ নিতে হবে।

পৃথিবীর স্থল ও সমুদ্র ভাগে বিদ্যমান বায়োমসমূহের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ প্রাণীদের বিস্তরণ

৫. তৃণভূমি (Grasslands): তৃণভূমি বায়োম বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে ঘাস বা তৃণ এবং অল্প কিছু বৃক্ষ দ্বারা আবৃত। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় এবং নাতিশীতোষ্ণ উভয় অঞ্চলেই তৃণভূমি রয়েছে। এগুলো অনেক বৈচিত্র্যময় বাস্তুসংস্থানকে ধারণ করে। তৃণভূমির বায়োমকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়, যথা: (ক) ক্রান্তীয় তৃণভূমি বা সাভানা (Tropical Grassland or Savanna) এবং (খ) নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি (Temperate Grassland)।

(ক) সাভানা তৃণভূমি উভয় গোলার্ধের ১০ থেকে ২০ ডিগ্রি অক্ষাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। সারা বছর তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের উপরে থাকে। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ২৫-৭৫ সে.মি.। বৃষ্টিপাতের ৮০-৯০ শতাংশ গ্রীষ্মকালেই সংঘটিত হয়। বিস্তৃত পরিসরে সাভানা তৃণভূমির মধ্যে ক্রান্তীয় তৃণভূমি ও ক্রান্তীয় ঝোপঝাড় অন্তর্ভুক্ত। পূর্ব আফ্রিকা ও সাহারার দক্ষিণাংশ, দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, মাদাগাস্কার দ্বীপ, মধ্য ও উত্তর আমেরিকায় সাভানা তৃণভূমি রয়েছে। সাভানা তৃণভূমি অঞ্চলে তিনটি ঋতু পরিলক্ষিত হয়, যথা: শুষ্ক শীতকাল, শুষ্ক গ্রীষ্মকাল এবং আর্দ্র গ্রীষ্মকাল। এখানে আর্দ্র গ্রীষ্মকালে বিভিন্ন আকৃতির উজ্জ্বল সবুজ বা রুপালি রঙের তৃণ জন্মায় যা শুষ্ক শীত বা শুষ্ক গ্রীষ্মকালে বাদামি ধূসর রং ধারন করে এবং নুয়ে পড়ে। এই তৃণভূমিতে মাঝে মাঝে বিক্ষিপ্তভাবে অল্প কিছু বৃক্ষ দেখতে পাওয়া যায়। শুষ্ক মৌসুমে বৃক্ষগুলোর পাতা ঝরে পড়ে বা ধূসর বর্ণ ধারণ করে। সাভানা তৃণভূমির ভূমিস্তরটিতে প্রধানত তৃণ ও বীরুৎ জাতীয় গাছ দেখা যায় যাদের উচ্চতা ৮০ সে.মি. থেকে ৩.৫ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। তবে আফ্রিকার তৃণভূমিতে ৫ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত তৃণ দেখতে পাওয়া যায়। প্রধান তৃণপ্রজাতির মধ্যে রয়েছে পাস্পালাম, প্যানিকাম, স্কীমিসিয়া ইত্যাদি। এছাড়া গুল্ম ও কাঁটা জাতীয় কিছু উদ্ভিদ, পাইন, ইউক্যালিপ্টাসও দেখা যায়। সাভানা বায়োমের প্রাণীদের ব্যাপারে সকল শ্রেণির মানুষের বিশেষ কৌতূহল রয়েছে। আফ্রিকার সাভানা তৃণভূমিতে সবচেয়ে বেশি তৃণভোজী স্তন্যপায়ী প্রাণী দেখা যায়। এসবের মধ্যে আছে মহিষ, জেব্রা, জিরাফ, সিংহ, চিতা, হাতি, অ্যান্টিলোপ, জলহস্তী, গ্যাজেল ইত্যাদি। অস্ট্রেলিয়ার সাভানায় ক্যাঙ্গারু বাস করে। সাভানা তৃণভূমি বিভিন্ন প্রজাতির পাখির অভয়ারণ্য। এসব পাখির মধ্যে টুকান, তোতাপাখি, ফিঞ্চ, ঘুঘু, মাছরাঙা, টিয়া, উটপাখি, এমু অন্যতম। অমেরুদন্ডী প্রাণীদের মধ্যে রয়েছে মাছি, পঙ্গাপাল, উই, পিপীলিকা, বিছা, আরশোলা, ফড়িং ইত্যাদি।

(খ) নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমিতে সাভানা তৃণভূমির মতো বড়ো গাছ দেখা যায়না। এ তৃণভূমি মূলত মহাদেশীয় অঞ্চলের সেইসব এলাকাতে দেখা যায় যেখানে পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে কম বৃষ্টি হয়। পৃথিবী জুড়েই এ তৃণভূমি বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে রয়েছে। ইউরেশিয়ান স্তেপ, দক্ষিণ আমেরিকার পম্পাস, উত্তর আমিরিকার প্রেইরি, নিউজিল্যান্ডের ক্যান্টাবেরি পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য তৃণভূমি বায়োম। এই বায়োমে গ্রীষ্মকালীন গড় তাপমাত্রা ২০-২৩ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এবং শীতকালীন গড় তাপমাত্রা ৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের কাছাকাছি। এখানে গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত পঁচিশে০ থেকে ৬৫০ সে.মি.। ইউরেশিয়ান স্তেপে টার্ফ, ট্রিফোলিয়াম, স্টিপা এবং জেরোফাইটের মতো কাঁটা জাতীয় ঘাস জন্মায়। প্রাণীদের মধ্যে আছে সাইগা অ্যান্টিলোপ, মঙ্গোলিয়ান গ্যাজেলস, বুনো ঘোড়া, ইগল, বাজপাখি, রোডেন্ট। উত্তর আমেরিকার প্রেইরি তৃণভূমিতে ব্লুয়েস্টেম, সুইচ, নিডল, জুন, বাফেলো প্রজাতির ঘাস দেখতে পাওয়া যায়। প্রাণীর মধ্যে আছে বাইসন, রোডেন্ট, নেকড়ে, শিয়াল, ইগল, বাজপাখি। দক্ষিণ আমেরিকার পম্পাস তৃণভূমিতে ব্রীজা, পাসপালুম, লুনিয়াম প্রভৃতি ঘাস দেখা যায়। এখানকার পম্পা হরিণ, ভিসকা রোডেন্ট, বক, হাঁস প্রাণীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। আফ্রিকার তৃণভূমিতে অ্যান্টিলোপ, হায়েনা, শিয়াল, লেপার্ড, জেব্রা, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি প্রাণীর বিচরণ দেখা যায়। অস্ট্রেলিয়ার তৃণভূমিতে ক্যাঙ্গারু, ওয়াল্লারুস, মেষ, এমু রয়েছে।

তৃণভূমি বায়োম কৃষিকাজ এবং গবাদিপশুর চারণভূমি হিসাবে অপরিহার্য। আবার এসব বায়োমে জীববৈচিত্র্যের এক অনন্য সমাবেশ ঘটেছে। তবে মানুষের অবিবেচিত কর্মকান্ডের কারণে এসব বায়োমের প্রাকৃতিক ভারসাম্য ভীষণভাবে বিনষ্ট হচ্ছে। তৃণাঞ্চল পুড়িয়ে মানুষ অনেক স্থান কৃষিজমিতে রূপান্তর করেছে। বহু বছর ধরে এভাবে তৃণভূমি পুড়িয়ে কৃষি বা অন্যান্য কাজে ব্যবহারের ফলে তৃণভূমি অনেক সংকুচিত হয়েছে এবং সেসব স্থানের উদ্ভিদ ও প্রাণীরা ঝুঁকীতে পড়েছে।

৬. সামুদ্রিক বায়োম (Marine Biomes): তোমরা তো জানো, পৃথিবী গ্রহটিতে স্থলভাগের চেয়ে জলভাগ অনেক বেশি। বিশাল মহাসাগর এবং সাগর গুলো নিয়ে গঠিত সামুদ্রিক বায়োম পৃথিবীপৃষ্ঠের শতকরা ৭০ ভাগ দখল করে আছে। এটি একটি জটিল এবং বৈচিত্র্যময় বাস্তুতন্ত্র, যা বিভিন্ন ধরনের রহস্যময় সামুদ্রিক জীব, যেমন: বিচিত্রসব মাছ, তিমি, প্রবাল প্রাচীর এবং অগণিত অন্যান্য জীবসমূহকে ধারণ করছে। সমুদ্রের পানি লবণাক্ত হওয়ায় সামুদ্রিক বায়োমের জীবদের লবণাক্ত পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজিত হতে হয়। এই বায়োম আঞ্চলিক জলবায়ুর ধরন দিয়ে তেমন একটা প্রভাবিত নয় বরং বিভিন্ন এলাকার জলবায়ুর ধরনকে মহাসাগরগুলো নিয়ন্ত্রণ বা প্রভাবিত করতে পারে। পৃথিবীর মহাসাগগুলোর বাইরেও অন্যান্য সাগর ও উপসাগরও এ বায়োমের অন্তর্ভুক্ত।

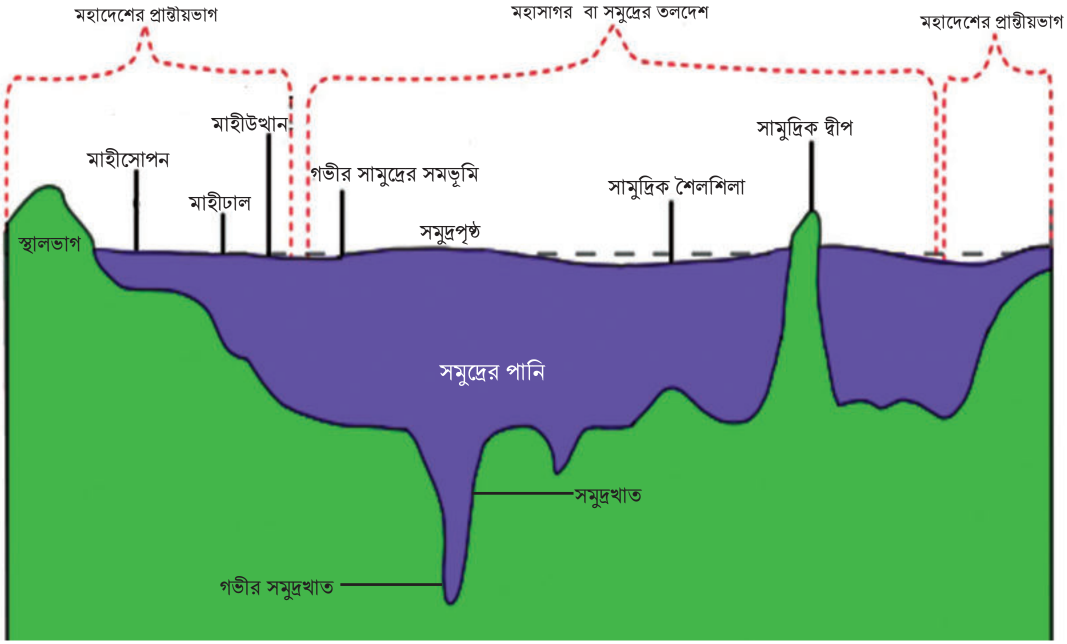

সমুদ্র এবং সংলগ্ন স্থলভাগ, দ্বীপের গঠনগত কাঠামো

স্থলভাগে অবস্থিত লবণাক্ত পানির হ্রদ সমূহে সামুদ্রিক বায়োমের বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়, যেমন: কাস্পিয়ান হ্রদ, জর্ডান ও ইজরায়েলের মধ্যবর্তী মৃতসাগর, ইরানের উরমিয়া হ্রদ ইত্যাদি। সামুদ্রিক বায়োমকে উল্লম্ব ভাবে তিনটি স্তরে ভাগ করা যায়। যথা: পর্যাপ্ত সূর্যালোক পাওয়া উপরের স্তর (Euphotic zone) যার গভীরতা প্রায় ২০০ মিটার পর্যন্ত হতে পারে, এর পরের অপেক্ষাকৃত কম সূর্যালোক পাওয়া স্তর (Dysphotic Zone) এবং সবার নিচে সূর্যালোক পৌঁছায়না এমন স্তর (Aphotic zone)। সূর্যালোক প্রাপ্তির তারতম্য অনুযায়ী জীবের ধরন ও বিস্তরণ নির্ধারিত হয়। তবে পর্যাপ্ত সূর্যালোক পাওয়া উপরের ইউফোটিক স্তরে সমুদ্র বায়োমের প্রায়

৯০ শতাংশ জীবের বসবাস। সামুদ্রিক বায়োমকে তাঁদের অবস্থানের ভিত্তিতে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: মহাসাগরীয় বায়োম, প্রবাল প্রাচীরের বায়োম এবং মোহনার বায়োম। এসব বায়োমের পরিবেশ, বিদ্যমান উদ্ভিদ, প্রাণী বা অণুজীবের মধ্যে পার্থক্য ও বৈচিত্র্য রয়েছে। সামুদ্রিক বায়োমকে বোঝার সুবিধার জন্য আমরা চিত্র থেকে সাগরের গঠন দেখে নেব।

সমুদ্র বায়োমের লবণ-সহিষ্ণু উদ্ভিদকে হ্যালোফাইট (Halophytes) বলা হয়। সমুদ্রের লবণ-সহিষ্ণু উদ্ভিদ গুলো বর্ষজীবী বা বহুবর্ষজীবী। এখানে ঘাস, ঝোপঝাড়সহ বিভিন্ন প্রজাতির ফুল হয়ে থাকে। জৈবিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে সমুদ্র বায়োমের উদ্ভিদগুলোকে প্রধানত সি-গ্রাস, কেল্প, সারগাসাম, ফাইটোপ্লাংটন এবং লাল শৈবাল এই পাঁচ শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। মজার বিষয় হচ্ছে, সামুদ্রিক উদ্ভিদ জগৎ অনেক বেশি বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং সংখ্যায় অনেক বেশি হলেও এখানে জন্মানো ৯৯ শতাংশ উদ্ভিদের জন্য লবণাক্ত সমুদ্র প্রাণঘাতী হিসেবে কাজ করে। আর মাত্র ১ শতাংশ উদ্ভিদ লবণাক্ত পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজিত হয়ে টিকে থাকে।

সমুদ্র বায়োমের প্রাণীরা এতবেশি বৈচিত্র্যময় যে ছয়টি প্রধান প্রাণী শ্রেণিরই এখানে উপস্থিতি দেখা যায়। একমাত্র ব্যতিক্রম সম্ভবত উভচর প্রাণীরা, যাদের একটি অংশ সরাসরি সমুদ্রের লবণাক্ত পানিতে বাস না করে বরং অপেক্ষাকৃত কম লোনা পানিতে বসবাস করে। অমেরুদন্ডী প্রাণীর মধ্যে রয়েছে স্পঞ্জ, শামুক, ঝিনুক, নানা ধরনের কীটপতঙ্গ, জেলিফিশ। সরীসৃপ প্রজাতির মধ্যে আছে সমুদ্র কচ্ছপ, সমুদ্র সাপ, লোনা পানির কুমির। এছাড়াও রয়েছে প্রায় ২০,০০০ এর অধিক প্রজাতির বিভিন্ন ধরনের মাছ। স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে আছে নীল তিমি, সীল, সামুদ্রিক ভোঁদড়, মেরু ভাল্লুক, ডলফিন, সী লায়ন ইত্যাদি। ডাম্বো অক্টোপাস, ভ্যাম্পায়ার স্কুইডস, অ্যাংলারফিশ, জম্বি ওয়ার্মস ইত্যাদি সামুদ্রিক বায়োমের কিছু ভয়ানক প্রাণী। প্রায় ৩৫০ প্রজাতির বিভিন্ন ধরনের পাখি সমুদ্র বায়োমের গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ, যদিও সেগুলো খুব বেশি সময় সমুদ্রে কাটায়না। সমুদ্রের বৈরি পরিবেশে অভিযোজনের জন্য সমুদ্র বায়োমের উদ্ভিদ ও প্রাণীগুলো বিশেষ বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। যেমন অনেক উদ্ভিদের বিশেষ ধরনের শক্ত মূল রয়েছে যার মাধ্যমে এগুলো পাথর বা শক্ত কিছুর সঙ্গে লেগে থাকতে পারে এবং তীব্র স্রোতেও স্থানচ্যুত হয়না। প্রাণীরাও আলো, তাপ, খাদ্য এবং পানির চাপের ব্যাপক তারতম্যের মধ্যেও টিকে থাকতে পারে। তাই সামুদ্রিক বায়োম সকল দিক দিয়েই বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হওয়ায় এখানকার জীবগুলো পৃথিবীর মূল্যবান সম্পদ।

সামুদ্রিক বায়োম পৃথিবীতে অক্সিজেনের ভারসাম্য বজায় রাখা, জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ এবং মানবজাতির জন্য খাদ্য এবং সম্পদের উৎস হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে যে সমগ্র পৃথিবীর সাগর-মহাসাগরের মাত্র ত্রয়োদশ শতাংশ তার স্বাভাবিক ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে, আর বাকী অংশ মানবসৃষ্ট নানা কারণ, যেমন: প্লাস্টিক দূষণ, অতিরিক্ত মাছ আহরণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়ো ঝুঁকী সৃষ্টি করেছে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব। এছাড়া রাসায়নিক দূষণ, শব্দদূষণ ইত্যাদি সামুদ্রিক বায়োমের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করছে। ইতিমধ্যেই বেশ কিছু মাছের প্রজাতি বিলুপ্তির ঝুঁকীতে রয়েছে যেমন:অ্যালবাকোর টুনা, আটলান্টিক কড, হ্যালিবাট, স্যালমন, সমুদ্রের ঝিনুক ইত্যাদি। যেহেতু এই সমুদ্র আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার সঙ্গে জড়িত এবং পৃথিবীজুড়ে প্রায় ৮০০ মিলিয়ন মানুষ মাছ ধরে আয় এবং জীবিকার জন্য সমুদ্রের ওপর নির্ভরশীল, তাই আমাদের এই সমুদ্র বায়োমের জীববৈচিত্র্য, রক্ষায় জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ ও তার বাস্তবায়ন করা জরুরি।

তবে উল্লিখিত বায়োমসগুলোর বাইরে স্বাদু পানির বায়োমের কথা বলা যেতে পারে। স্বাদু পানির বায়োম পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে বিস্তৃত, যার ফলে এই বায়োমে স্থান ভেদে জলবায়ুর ভিন্নতা রয়েছে। পুকুর, খাল-বিল, ডোবা, নদ-নদী গুলো মূলত স্বাদু পানির বায়োমের অংশ। স্বাদু পানির বায়োমেও নানা ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণী দেখতে পাওয়া যায়। তবে স্বাদু পানির বায়োম মানুষ ও প্রাণীদের জন্য প্রয়োজনীয় মিঠা পানির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস। এছাড়া এ বায়োমে প্রচুর পরিমাণে মিঠা পানির মাছ পাওয়া যায় যা বাংলাদেশের মতো অনেক দেশের জন্য প্রাণীজ আমিষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসাবে কাজ করে।

উল্লিখিত বায়োমগুলো পৃথিবীতে জীবনের বৈচিত্র্য এবং ভারসাম্যের প্রমাণ। এটি আমাদের বুঝতে হবে যে, পৃথিবীটা শুধু মানুষের জন্য নয় আর মানুষ এককভাবে কখনো টিকে থাকতেও পারবে না। কারণ, মানুষ তার বেঁচে থাকার সমস্ত উপাদান তার আশপাশের জীব ও জড় পরিবেশ থেকে সংগ্রহ করে। অন্যান্য জীব ও মানুষ পরস্পরের সমৃদ্ধি এবং সুন্দর ও পরিপূর্ণ ভাবে বাঁচার সহযোগী। পৃথিবীতে বিদ্যমান বায়োমগুলো মূলত মানুষ, অন্যান্য জীব ও প্রকৃতির মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতাকে ফুটিয়ে তোলে। প্রাকৃতিক বা মনুষ্য সৃষ্ট যেকোনো কারণেই হোক না কেন, যদি বায়োমসগুলো প্রাকৃতিক পরিবেশের কোনো পরিবর্তন হয় তাহলে তা মানুষের সামাজিক জীবনকে প্রভাবিত করে। আবার মানুষ যদি তার বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণের জন্য তার সামাজিক জীবনে পরিবর্তন আনে, যেমন: খাদ্যাভ্যাস, শিল্পায়ন ও অবকাঠামো সৃষ্টি, ভূমি ব্যবহার ইত্যাদিতে, তবে প্রকৃতিতে তার সরাসরি প্রভাব পড়ে। আর তাই এই অমূল্য বায়োম ও বিদ্যমান বাস্তুসংস্থানগুলোকে অনুধাবন করা ও সেই অনুযায়ী সেগুলোকে রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব। ব্যক্তি পর্যায়ে একক প্রচেষ্টার চাইতে সবার সমন্বিতভাবে অংশগ্রহণে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার মাধ্যমেই আমরা আমাদের এই প্রিয় পৃথিবীকে আজ এবং আগামীর জন্য সব জীবের বাস উপযোগী করে রাখতে পারি।

সমুদ্র সম্পদ এবং বাংলাদেশের সুনীল অর্থনীতির সম্ভাবনা:

সামুদ্রিকসম্পদ বলতে পৃথিবীর সাগর, মহাসাগর এবং এর উপকূলীয় এলাকাগুলো জৈব-অজৈব সম্পদের বিশাল ভান্ডারকে বোঝায়। এই সম্পদ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা আমরা সমুদ্র বায়োম বিষয়ে পড়ার সময় পেয়েছি। এসব সম্পদ যে পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব টিকীয়ে রাখতে এবং তার নানাবিধ প্রয়োজন মেটাতে বড়ো ভূমিকা পালন করে তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। খাদ্যনিরাপত্তা, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সমুদ্র এবং তা থেকে সংগৃহীত সম্পদের ভূমিকা অপরিসীম। এই অংশে আমরা মূলত সামুদ্রিক সম্পদের গুরুত্ব, এর প্রকারভেদ, বাংলাদেশে সামুদ্রিক সম্পদের ধরন ও সম্ভাবনা এবং এর টেকসই ব্যবস্থাপনায় বাধাসমূহ বুঝতে চেষ্টা করব।

আমরা জানি, পৃথিবীর উপরিভাগের ৭০ ভাগ মহাসাগর যা এক সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যময় সামুদ্রিক সম্পদের আবাসস্থল। এসব সম্পদকে মূলত জীবন্ত (জৈব) এবং নির্জীব (অজৈব) এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

জীবন্ত সামুদ্রিক সম্পদ:

(ক) মৎস সম্পদ: সমুদ্র মাছসহ অন্যান্য সামুদ্রিক খাবারের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উৎস। বিশ্বজুড়ে সমুদ্র লক্ষ লক্ষ মানুষের খাদ্য ও জীবিকার জোগান দেয়। এই প্রাকৃতিক সম্পদ মৎস্য খাত বাংলাদেশের সুনীল অর্থনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উপকূলীয় এবং অভ্যন্তরীণ জলাশয় এই উভয় উৎস থেকে সংগৃহীত মাছের ওপর নির্ভর করে আমাদের দেশে সমৃদ্ধ মৎস্য শিল্প গড়ে উঠেছে সামুদ্রিক মৎস্য খাত বিপুল সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থান ও আয়ের উৎস যা খাদ্যনিরাপত্তা ও রপ্তানি আয়েও অবদান রাখছে।

(খ) অ্যাকুয়াকালচার: অ্যাকুয়াকালচার, যা মৎস্য চাষ নামেও পরিচিত। নিয়ন্ত্রিত জলজ পরিবেশে মাছ, শেলফিস ও জলজ উদ্ভিদ চাষের সঙ্গে এটি সম্পর্কীত। এটি সিফুডের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস এবং প্রোটিনের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটাতে সাহায্য করে। বাংলাদেশের সুনীল অর্থনীতির একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো মাছ চাষ। পুকুর, ঘের এবং উপকূলীয় এলাকার কৃষিজমিতে বাঁধ দিয়ে সমুদ্রের পানি ধরে রেখে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ, কাঁকড়া এবং বাগদা চিংড়ি চাষের মাধ্যমে দেশে অ্যাকুয়াকালচারে উল্লেখযোগ্য বিকাশ হয়েছে। অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটাতে, রপ্তানি আয় বাড়াতে এবং প্রাকৃতিক মাছের মজুদের ওপর চাপ কমাতে অ্যাকুয়াকালচার অবদান রাখছে।

(গ) সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য: মহাসাগরসমূহ সামুদ্রিক বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণীর বিস্তৃত সমাহারে সমৃদ্ধ। এর মধ্যে রয়েছে স্তন্যপায়ী, সরীসৃপ, পাখি এবং অমেরুদন্ডী প্রাণীর এক বিশাল সম্ভার। এই প্রজাতিসমূহ বাস্তুতন্ত্রের কার্যকারিতা, পুষ্টিপ্রবাহ এবং বিনোদনমূলক কার্যক্রম যেমন পর্যটন ও ডুবুরিদের কাজে (Diving) অবদান রাখে। এছাড়া বিভিন্ন সামুদ্রিক উদ্ভিদ ও শৈবালেরও পুষ্টিগুণ রয়েছে। এ নিয়ে বিজ্ঞানীরা কাজ করছেন।

নির্জীব সামুদ্রিক সম্পদ:

(ক) খনিজ এবং জ্বালানি: সমুদ্রের তলদেশে মূল্যবান খনিজ পদার্থ রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে ম্যাঙ্গানিজ নডিউলস, কোবাল্টসমৃদ্ধ ক্রাস্ট এবং তলদেশের খনিজ ও শিলার আকরিক আধার (Hydrothermal Vent deposits)। সমুদ্র উপকূল থেকে দূরবর্তী গভীর সমুদ্রে তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস এবং নবায়নযোগ্য শক্তির (যেমন: বায়ু ও জোয়ারের শক্তি) গুরুত্বপূর্ণ উৎস। নবায়নযোগ্য শক্তি, বিশেষ করে সমুদ্রতীরবর্তী বায়ু, ঢেউ এবং জলোচ্ছ্বাসের শক্তি সুনীল অর্থনীতির আরেকটি সম্ভাবনাময় খাত। দেশের জ্বালানি খাতের উৎসকে বহুমুখী করতে এবং জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরতা কমাতে বায়ু বা সমুদ্রের ঢেউ এর শক্তি ব্যবহার করার সম্ভাবনা অনুসন্ধান করা হচ্ছে। আমাদের উপকূলীয় অঞ্চল ও সমুদ্রতীর থেকে লম্বালম্বি ভাবে ২০০ নটিক্যাল (১ নটিক্যাল মাইল= ১,৮৫২ মিটার) দূরবর্তী এলাকা পর্যন্ত বাংলাদেশের একচেটিয়ে অর্থনৈতিক অঞ্চল (Exclusive Economic Zone)। এতে বাংলাদেশের একচ্ছত্র মালিকানা রয়েছে। এখানে প্রাকৃতিক গ্যাস, তেল ইত্যাদির অনুসন্ধান করা হচ্ছে। তবে এ ধরনের জ্বালানি অনুসন্ধান এবং উত্তোলনের জন্য ব্যাপক বিনিয়োগ প্রয়োজন।

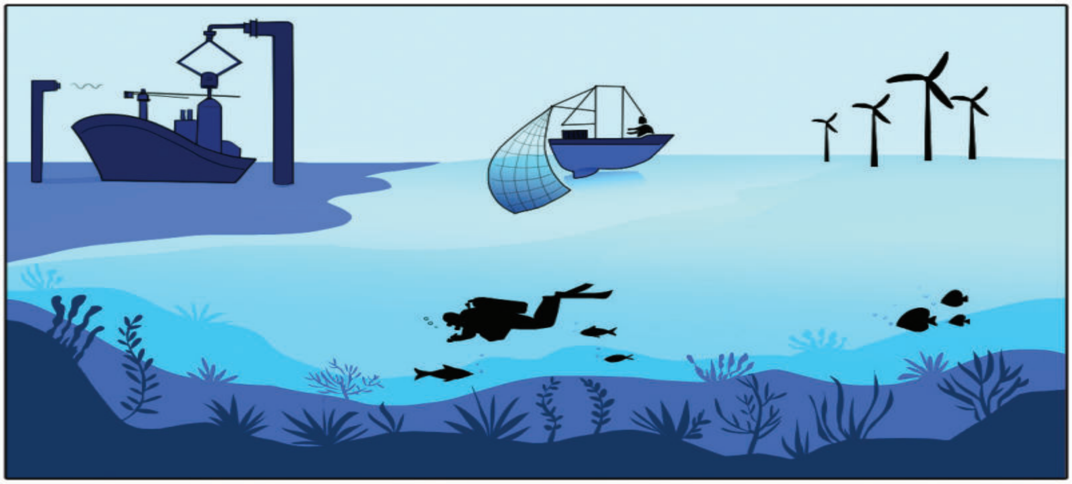

সমুদ্র সম্পদের উপর মানুষের নির্ভরশীলতার ধরণ

(খ) বালি ও নুড়ি: উপকূলীয় অঞ্চলগুলোতে প্রচুর পরিমাণে বালি ও নুড়ি জমা হয়। এগুলো নির্মাণশিল্প, যেমন: ভবন নির্মান সামগ্রী হিসাবে ও সমুদ্রতট সংরক্ষণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের কক্সবাজার থেকে টেকনাফ পর্যন্ত দীর্ঘ সমুদ্রসৈকতে পাওয়া যায় কালো রঙের খনিজ বালু, যা মূলত ভারী খনিজ পদার্থ। এসব কালো রঙের বালুতে জিরকন, ইলমেনাইট, ম্যাগনেটাইট, গার্নেট, রিউটাইল, লিওকনিক্স, কায়ানাইট, মোনাজাইট এর মতো মূল্যবান ভারী খনিজ রয়েছে। এসব খনিজ পদার্থ শিল্পে ব্যবহার এবং বিদেশে রপ্তানির জন্য সম্ভাবনাময়।

(গ) পর্যটন: বঙ্গোপসাগরের কোল ঘেঁষে বাংলাদেশের উপকূলীয় তটরেখা প্রায় ৭১০ কীলোমিটার দীর্ঘ। তাই এই দীর্ঘ তটরেখা ধরে পর্যটন ও বিনোদন নতুন অর্থনৈতিক খাত হিসাবে বিবেচিত। পর্যটন সম্ভাবনাময় উপকূলীয় এলাকার মধ্যে রয়েছে চট্টগ্রাম, কক্সবাজারের বিশ্বের দীর্ঘতম প্রাকৃতিক বালুকাময় সমুদ্র সৈকত ও এর সংলগ্ন এলাকা এবং সেন্টমার্টিন দ্বীপ, যা দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয় পর্যটকদের আকর্ষণ করে। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত একমাত্র ম্যানগ্রোভ বন হলো সুন্দরবন যা ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ। এটি সাইক্লোন ও জলোচ্ছ্বাসের মতো বিপদ থেকে আমাদের রক্ষার কাজ করে। আবার পর্যটকদের জন্যও এটি আকর্ষণীয় স্থান। সুন্দরবনের পূর্বদিকে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলায় অবস্থিত কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত দেশি-বিদেশি পর্যটকদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। সামুদ্রিক পরিবহন ও সরবরাহ, সামুদ্রিক পরিষেবা, জাহাজ নির্মাণ এবং উপকূলীয় শিল্প কার্যক্রমও বাংলাদেশের সুনীল অর্থনীতির অন্তর্ভুক্ত। বন্দর এবং টার্মিনালগুলো আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে সহজতর করে, একই সঙ্গে জাহাজ নির্মাণ শিল্প কর্মসংস্থান এবং রপ্তানি আয়ে অবদান রাখে।

সামুদ্রিক সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা সেগুলোর দীর্ঘমেয়াদী যোগান নিশ্চিত করতে পারে। তবে এই টেকসই ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যেসব প্রতিবন্ধকতা রয়েছে সেগুলো হলো:

১. অতিরিক্ত মাছ ধরা এবং নিঃশেষকরণ: অতিরিক্ত মাছ ধরা, অবৈধভাবে মাছ ধরা এবং মাছ ধরার ধ্বংসাত্মক কৌশল ব্যবহারের ফলে যেমন মাছের মজুদ হ্রাস পাচ্ছে, তেমনি ভাবে সেগুলো প্রজননও ব্যাহত হচ্ছে। এতে সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য এবং জীববৈচিত্র্য হুমকীর সম্মুখীন হচ্ছে। সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনার জন্য নিয়ন্ত্রণ, নিয়মিত পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োজনে যথাযথ আইন প্রণয়ন ও তার প্রয়োগ জরুরি।

২. আবাসস্থল ধ্বংস এবং দূষণ: সমুদ্রের তলদেশ থেকে মাছ ধরা, উপকূল এলাকায় নানা উন্নয়নমূলক কার্যক্রম চালানো এবং রাসায়নিক ও প্লাস্টিক দূষণের মতো কর্মকান্ডে সামুদ্রিক মাছ ও অন্যান্য উদ্ভিদ-প্রাণীদের আবাসস্থল ধ্বংস, বাস্তুতন্ত্রের পরিবর্তন এবং তাঁদের স্বাভাবিক প্রজনন ও বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে। সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য বিপন্ন আবাসস্থল রক্ষা, সমুদ্রের স্থানিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও সব ধরনের দূষণ হ্রাস করা অত্যন্ত জরুরি।

৩. জলবায়ু পরিবর্তন: মহাসাগরসমূহে জলবায়ু পরিবর্তনের ব্যাপক প্রভাব দেখা যাচ্ছে। এসবের মধ্যে আছে সমুদ্রের পানির তাপমাত্রা বৃদ্ধি, অম্লতার বৃদ্ধি এবং সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি । এই পরিবর্তনগুলো সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। প্রজাতির বণ্টন ও সংখ্যায় পরিবর্তন ঘটছে। এতে পরিবেশের স্বাভাবিক প্রক্রিয়াগুলো ব্যাহত হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাবগুলো কমিয়ে আনার জন্য গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাস করা এবং সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ ও তার বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।

৪. সমুদ্র ব্যবস্থাপনা এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা: সমুদ্রসম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রয়োজন কারণ, মহাসাগরগুলো নানা দেশের সঙ্গে সংযুক্ত এবং সবার সম্মিলিত সম্পদ। কোনো একক দেশের মাধ্যমে এর ব্যবস্থাপনা সম্ভব নয়। তাছাড়া এতে রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সম্পদ নিয়ে দ্বন্দ্ব বা বিরোধ দেখা দিতে পারে। তাই আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং আঞ্চলিক সহযোগিতার মতো কার্যকর শাসনকাঠামো অতিরিক্ত বা অবৈধ মাছ ধরা, দূষণ ও চোরাচালান রোধ এবং সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য রক্ষায় কাজ করতে পারে।

সামুদ্রিক সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে সংরক্ষিত সামুদ্রিক এলাকা নির্ধারণ, টেকসই মৎস্য আহরণ ও চাষ, সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা, সামুদ্রিক দূষণ কমানোর উদ্যোগ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবগুলো চিহ্নিতকরণ ও প্রশমিত করা। অর্থনৈতিক উন্নতি, দারিদ্র্য হ্রাস এবং টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সামুদ্রিক সম্পদ ও সুনীল অর্থনীতির যে উল্লেখযোগ্য সম্ভাবনা রয়েছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমাদের মতো ঘনবসতিপূর্ণ দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর প্রয়োজন শুধু স্থলভাগের সম্পদ দিয়ে পূরণ করা সম্ভব নয়। টেকসই উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। সরকার সহনশীল মৎস্য আহরণ নিশ্চিতে, ঝুঁকীপূর্ণ সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্র রক্ষা এবং টেকসই অ্যাকুয়াকালচারের উন্নয়নে নীতি ও প্রবিধান বাস্তবায়ন করছে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার এবং বর্জ্য নিঃসরণে কঠোর বিধি-বিধান প্রয়োগের মাধ্যমে দূষণ কমানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। উপকূলীয় ক্ষয় ও ভাঙন মোকাবিলা, টেকসই ভূমি ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং উপকূলীয় বাস্তুতন্ত্র রক্ষার জন্য সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরি করা হচ্ছে। সব মিলিয়ে বাংলাদেশের সামুদ্রিক সম্পদ এবং সুনীল অর্থনীতি অর্থনৈতিক উন্নয়ন, জীবিকা এবং পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য উল্লেখযোগ্য সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

বাংলাদেশের বনজ সম্পদ এবং এর টেকসই ব্যবস্থাপনা

বন হলো পৃথিবীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ, যা মানুষ এবং পরিবেশের জন্য অনেক প্রয়োজনীয় উপাদানের যোগান দেয়। বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য বজায় রাখা, জীববৈচিত্র্যকে রক্ষা করা, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রশমিত করা এবং বিভিন্ন পণ্য ও সেবার জন্য বনভূমি অপরিহার্য। এই অংশে আমরা প্রাকৃতিক সম্পদ হিসাবে বনের তাৎপর্য এবং বনভূমির টেকসই ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সম্পর্কীত চ্যালেঞ্জগুলো জানব। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) এর ২০২২ সালের তথ্য মতে পৃথিবীর সমগ্র স্থলভাগের প্রায় শতকরা ৩১ ভাগ জুড়ে বনভূমি রয়েছে এবং উদ্ভিদ, পাণী জগৎ ও বাস্তুতন্ত্র ভেদে এসব বনভূমি খুবই বৈচিত্র্যময়। পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় রাখতে এবং এই গ্রহের কার্যকলাপ সচল রাখতে বনভূমি নানা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নিচে বনের উল্লেখযোগ্য গুরুত্বসমূহ আলোচনা করা হলো।

১. জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ: বন হলো প্রাণী এবং উদ্ভিদ প্রজাতির বিস্তীর্ণ আবাস। এসব প্রজাতির মধ্যে অনেকে আজ বিপন্ন। অনেক প্রজাতি আছে যাঁরা নির্দিষ্ট অঞ্চলের উদ্ভিদ বা প্রাণী হিসাবে পরিচিত (endemic)। বনভূমিসমূহ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষায় অবদান রাখে। তারা অসংখ্য জীবের জন্য আবাসস্থল, খাবারের উৎস এবং আশ্রয়স্থল হিসাবে কাজ করে। বন না থাকলে পৃথিবীতে বিদ্যমান জীববৈচিত্র্য টিকীয়ে রাখা সম্ভব হতো না।

২. কার্বন শোষণ এবং জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ: বায়ুমন্ডলের কার্বন চক্রে বন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বনের বৃক্ষরাজি সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণ করে এবং গাছ ও মাটিতে কার্বন সংরক্ষণ করে। তারা কার্বন সিঙ্ক হিসাবে কাজ করে, বায়ুমন্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাসের ঘনত্ব হ্রাস করে এবং স্থানীয় ও আঞ্চলিক জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ করে। জলবায়ু পরিবর্তনকে প্রশমিত করতে বনের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি।

৩. কাঠ এবং অ-কাঠ জাতীয় পণ্যের যোগান: বন হলো কাঠের একটি উল্লেখযোগ্য উৎস, যা নির্মাণসামগ্রী, আসবাবপত্র এবং শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার হয়। উপরন্তু, বন বিস্তৃত পরিসরে অকাষ্ঠ-জাতীয় পণ্য যেমন ফল, বাদাম, ঔষধি গাছ, ফাইবার, রজন এবং প্রাকৃতিক রঙের সরবরাহ করে থাকে। এসব পণ্যের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং ঔষধি মূল্য অপরিসীম।

৪. জলাভূমি সুরক্ষা এবং পানির সরবরাহ ও গুণ নিয়ন্ত্রণ: বনভূমি পানির প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে, মাটির ক্ষয় রোধ করে, পানির গুণমান বজায় রাখে এবং ভূগর্ভস্থ পানির উৎস পূরণ করে পানি ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বন পানির প্রাকৃতিক ফিল্টার হিসাবে কাজ করে। এছাড়া বন পলল এবং বিভিন্ন দূষককে ধরে রাখে এবং মানুষ ও পরিবেশের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিত করে।

কার্বন সিঙ্ক হলো এমন কিছু যা বায়ুমন্ডলে যতটুকু কার্বনডাই-অক্সাইড ছেড়ে দেয়, তার থেকে বেশি পরিমাণে শোষণ করে নিজের মধ্যে ধরে রাখতে পারে। বনভূমি, সমুদ্র এবং মাটি পৃথিবীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ কার্বন সিঙ্ক হিসেবে কাজ করে।

৫. বিনোদন এবং সাংস্কৃতিক মূল্য: বনভূমি মানুষের জন্য নির্মল বিনোদনমূলক কর্মকান্ডের সুযোগ সৃষ্টি করে। যেমন: হাইকীং, ক্যাম্পিং, বন্য প্রাণী পর্যবেক্ষণ এবং প্রকৃতি পর্যটন ইত্যাদি। বন অনেক সম্প্রদায়ের জন্য সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক তাৎপর্য বহন করে, ঐতিহ্যগত আচার-অনুষ্ঠান এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পটভূমি হিসেবে ভূমিকা পালন করে।

এসবের বাইরেও বনভূমি আমাদের প্রাকৃতিক দুর্যোগে সুরক্ষা দিয়ে থাকে। ২০০৭ সালে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে আঘাত হানা ভয়াবহ ঝড় সিডরের কথা তোমরা নিশ্চয়ই জান। সুন্দরবন সে সময় ঐ অঞ্চলের মানুষের জীবন ও সম্পদ বহুলাংশে রক্ষা করেছিল। সুন্দরবন না থাকলে ক্ষয়-ক্ষতি আরও ব্যাপক হতে পারত। বিভিন্ন সময়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগে বন আমাদের এভাবেই রক্ষা করে আসছে।

সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশের বনজ সম্পদও দেশের অর্থনীতি, পরিবেশ এবং মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজন মেটাতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি ছোটো দেশ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশে বৈচিত্র্যময় বনভূমির বাস্তুতন্ত্র রয়েছে যা মানুষকে বিভিন্ন সুবিধা ও সেবা প্রদান করে থাকে এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ভূমিকা রাখছে। চা ও রাবার বাগানসহ বাংলাদেশের মোট বনভুমির পরিমাণ প্রায় ২৬ লাখ হেক্টর যা দেশের মোট আয়তনের ১৭.৪ শতাংশ। বাংলাদেশের বৈচিত্র্যময় বনভূমিকে মূলত তিন ভাগে ভাগ করা যায়:

১. গ্রীষ্মমণ্ডলীয় চিরসবুজ এবং অর্ধ-চিরসবুজ বন: এই বনভূমিগুলো দেশের পার্বত্য অঞ্চলে, বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং বাংলাদেশের পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব অংশে পাওয়া যায়। এগুলো ঘন গাছপালায় আচ্ছাদিত, যার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের বৃক্ষ, গুল্ম এবং লতা। এ বনের উল্লেখযোগ্য বৃক্ষের মধ্যে আছে সেগুন, গর্জন, মেহগনি, গামারি, জারুল, চাঁপালিশ, শিমুল, কড়ই ইত্যাদি।

এই বনে বিভিন্ন প্রজাতির বাঁশ দেখা যায়, যেমন:মূলী, মিতিংগা, ভুলু, ওরাহ। এক সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের বনভূমি থেকে আহরিত বাঁশের ওপর ভিত্তি করে চন্দ্রঘোনার কর্ণফুলী পেপার মিল প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই বনে প্রাকৃতিকভাবে গড়ে ওঠা বৃক্ষরাজির পাশাপাশি বাণিজ্যিকভাবে রাবার গাছের চাষ করা হচ্ছে। তবে এ রাবার চাষের পরিবেশগত ফলাফল ও অর্থনৈতিক দিক বিবেচনায় এখনো ততটা সফল বলা চলে না। এই বনগুলো হাতি, হরিণ, শূকর, শজারু এবং বিভিন্ন প্রজাতির বানরসহ অসংখ্য প্রজাতির বন্য প্রাণীর আবাসস্থল। তবে এ বনভূমিতে মানুষের বিচরণ বৃদ্ধি এবং কৃত্রিম বনায়ন দিন দিন প্রাণীদের বাসস্থান এবং বংশবৃদ্ধি হুমকীর মুখে ফেলে দিয়েছে।

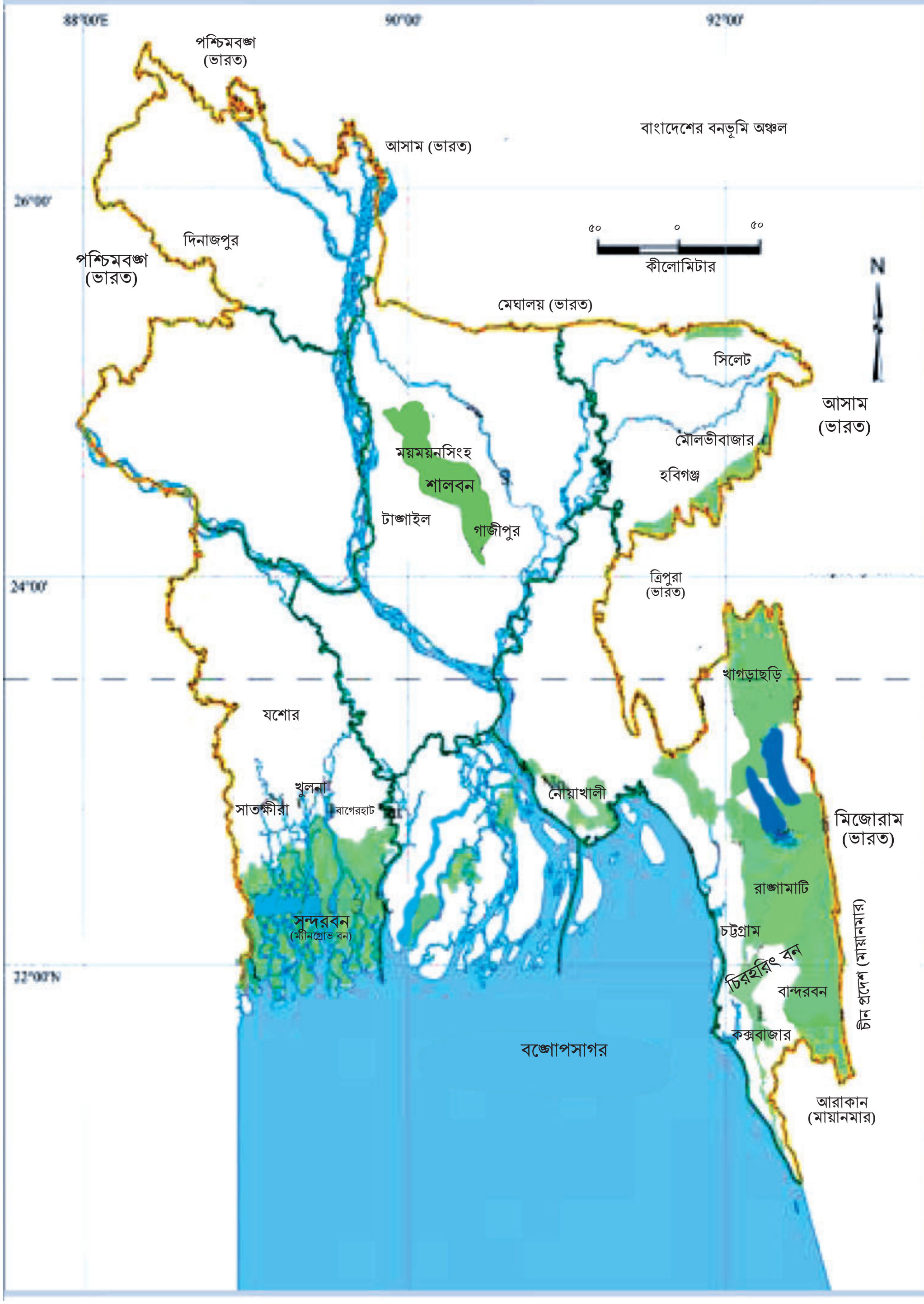

বাংলাদেশের বনাঞ্চল সমূহ (শালবন, চিরহরিৎ বন, ম্যানগ্রোভ বন)

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

২. ম্যানগ্রোভ বন: সুন্দরবন, বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন এবং ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ (৫২২ তম বিশ্ব ঐতিহ্য)। এই লোনা পানির বন বাংলাদেশের বনজ সম্পদের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এটি দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত এবং এর অনন্য জীববৈচিত্র্য এবং পরিবেশগত গুরুত্বের জন্য বিখ্যাত। খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলার দক্ষিণাংশ জুড়ে এই বন বিস্তৃত। এই বন সমুদ্রের তীরে হওয়ায় জোয়ারের পানিতে প্রতিদিন প্লাবিত হয় এবং মাটি সিক্ত ও কর্দমাক্ত থাকে। এ বনের সুন্দরী গাছে বিশেষ ধরনের শ্বাসমূল রয়েছে যা মাটির উপর ওঠে এসে উদ্ভিদকে অক্সিজেন নিতে সাহায্য করে। এ ধরনের শ্বাসমূলকে ইংরেজিতে Pneumatophore বলে। সুন্দরী, গেওয়া, গরান, পশুর, গোলপাতা, কেওড়া, ধুন্দুল, বাইন ইত্যাদি এ বনের উল্লেখযোগ্য বৃক্ষ। এ বন থেকে আসবাবপত্র, গৃহনির্মাণ, যানবাহন তৈরির উপযোগী কাঠ, ঘরের ছাওনি ও বেড়া তৈরির জন্য গোলপাতা সহ পেন্সিল, দিয়াশলাই, নিউজপ্রিন্ট তৈরির কাঁচামাল পাওয়া যায়। লবণাক্ত পানিতে প্লাবিত এ বনে মাছ, মধু, মোম, শামুক-ঝিনুক ইত্যাদি পাওয়া যায়। বর্তমানে সুন্দরবনে প্রায় ১২০ প্রজাতির মাছ পাওয়া যায়। এছাড়া কাঁকড়া, চিংড়ি, কাছিম, কুমির, ডলফিন, হাঙর, ভোঁদড় রয়েছে এখানে। প্রাণীদের মধ্যে বিখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগার, চিত্রা হরিণ, শূকর, বানর, বনবিড়াল, বাঘরোল, গুইসাপ, অজগর দেখতে পাওয়া যায়। পাখপাখালির মধ্যে বক, পানকৌড়ি, ধনেশ, লাল কাক, শঙ্খচিল, মাছরাঙা, ঘুঘু ইত্যাদির বিচরণ দেখা যায়।

৩. শাল বন: বাংলাদেশের মধ্য ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল, বিশেষ করে টাঙ্গাইলের মধুপুর, গাজীপুর, ময়মনসিংহ, শেরপুর, নেত্রকোনা এবং সিলেট অঞ্চলে শালবন দেখা যায়। এই বনগুলোতে শালগাছের উপস্থিতি সর্বাধিক বলেই এরকম নামকরণ। এটি মূলত ক্রান্তীয় পতনশীল বৃক্ষের বন। দিনাজপুর, রংপুর এবং নওগাঁ জেলাতেও এ বনের সামান্য অংশ দেখতে পাওয়া যায়। এ বনে কাঠ উৎপাদনকারী গাছের মধ্যে আছে গজারি, কড়ই, মনকাটা, সেগুন, হিজল, হরীতকী ইত্যাদি। এছাড়া আমলকী, বেল, জাম, তেঁতুল, কাঁঠাল, বৈরাগীলতা, বহেরা, ধূতরা ইত্যাদি গাছ দেখতে পাওয়া যায়। এ বন একসময় চিতাবাঘ, ভাল্লুক, হরিণের মতো প্রাণীর জন্য বিখ্যাত থাকলেও এখন এগুলো দেখা যায়না। তবে হনুমান, বানর, শিয়াল, গুঁইসাপ ইত্যাদি প্রাণী এবং বেশকিছু পাখ-পাখালি এ বনে এখনো দেখতে পাওয়া যায়।

আমরা জানি, মানুষ ও প্রকৃতির ভারসাম্যপূর্ণ বসবাস এবং তাঁদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য যে কোনো দেশের মোট আয়তনের পঁচিশে ভাগ বনভূমি থাকা প্রয়োজন। কিন্তু বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে বনভূমির পরিমাণ প্রতিনিয়ত হ্রাস পাচ্ছে। এর পেছনে যেসব কারণ প্রধান তা হলো—

১. বন উজাড় এবং অবৈধ গাছ কাটা: জনসংখ্যা বৃদ্ধি, কৃষি জমির সম্প্রসারণ এবং অবৈধ গাছ কাটার মাধ্যমে বন উজাড় দেশের বনাঞ্চলের জন্য সবচেয়ে বড়ো হুমকী। এর ফলে বনভূমি বিনাশের পাশাপাশি বন্য প্রাণীর বাসস্থানের ক্ষতি, মাটির ক্ষয় এবং মূল্যবান বাস্তুতন্ত্রের অবক্ষয় ঘটে।

২. দখল ও ভূমির রূপান্তর: কৃষি, বসতি এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য প্রায়ই বনাঞ্চল দখল করা হয়। বনভূমির এই রূপান্তর বনের বাস্তুতন্ত্রের বিস্তার এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য সমন্বয়ে ব্যাঘাত ঘটায়।

৩. বন্য প্রাণী শিকার এবং এর অবৈধ ব্যবসা: অনিয়ন্ত্রিত শিকার এবং বন্য প্রাণীর অবৈধ ব্যবসা বাঘ, হাতি ও বানরসহ বিপন্ন প্রজাতির জন্য হুমকী হয়ে উঠেছে এই কর্মকাণ্ডগুলো বাস্তুতন্ত্রকে বিপর্যস্ত করে এবং সংরক্ষণের প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করে।

উল্লিখিত চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা এবং বনজ সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ বাস্তবায়ন করেছে এবং করছে:

১. সংরক্ষিত এলাকা নির্ধারণ: সরকার জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদ ও প্রাণীর আবাসস্থল সুরক্ষিত করার জন্য জাতীয় উদ্যান, বন্য প্রাণী অভয়ারণ্য এবং প্রকৃতি সংরক্ষণসহ বিভিন্ন সংরক্ষিত বনায়ন প্রতিষ্ঠা করেছে।

২. কমিউনিটি-ভিত্তিক বন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা: বন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন সময় স্থানীয় সম্প্রদায় এবং আদিবাসী গোষ্ঠীর সম্পৃক্ততা কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া, সম্পদের টেকসই ব্যবহার এবং বন পুনরুদ্ধারে এই সহযোগিতামূলক উদ্যোগ স্থানীয় সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করেছে এবং বনজ সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনার সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

৩. পুনঃবনায়ন এবং বনায়ন: ক্ষয়প্রাপ্ত বনাঞ্চল পুনরুদ্ধার এবং বনায়ন কর্মসূচি প্রসারের প্রচেষ্টা চলছে। এই উদ্যোগগুলোর মধ্যে রয়েছে বৃক্ষ রোপণ, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং স্থানীয় সম্প্রদায়কে তাঁদের সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য প্রণোদনা প্রদান করা।

৪. আইনের প্রয়োগ শক্তিশালীকরণ: সরকার অবৈধ গাছ কাটা, বন্য প্রাণী শিকার এবং বন্য প্রাণীর অবৈধ ব্যবসার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে শক্তিশালী করার পদক্ষেপ নিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে কঠোরভাবে বিধিবিধান এবং জরিমানা বাস্তবায়ন, নজরদারি বাড়ানো এবং বন সংরক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি।

টেকসই বন ব্যবস্থাপনা:

টেকসই বন ব্যবস্থাপনা বলতে সঠিক সময়ে নির্বাচিত গাছ কাটা, নিয়ন্ত্রিতভাবে ফসল সংগ্রহ এবং বাস্তুতন্ত্রভিত্তিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বনজ সম্পদের যৌক্তিক ও দায়িত্বশীল ব্যবহারকে বোঝায়। এর লক্ষ্য হল জীববৈচিত্র্য রক্ষা ও বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য নিশ্চিত করা। মোট কথা হলো, বনজ সম্পদকে এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে যাতে বনের উৎপাদনশীলতা ও স্থায়িত্ব ভবিষ্যতে হ্রাস না পেয়ে বরং ক্ষয়-ক্ষতি কাটিয়ে বনজ সম্পদ আরও বেশি সমৃদ্ধ হতে পারে। টেকসই বন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বনের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত মান বজায় রাখা এবং বৃদ্ধি করা হয়। টেকসই বন ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহারের জন্য জাতীয় আইন, নীতি, কৌশল, আন্তর্জাতিক চুক্তি ও কনভেনশন রয়েছে। বাংলাদেশ সরকার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১) এবং অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (২০২১-২০পঁচিশে) অধীনে দেশের বন ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বনের ওপর চাপ কমাতে বননির্ভর মানুষের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, দখলকৃত বন পুনরুদ্ধার, বন্য প্রাণী ও বিপন্ন প্রজাতির সংরক্ষণ, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর নেতৃত্বে বন পাহারার ব্যবস্থা, জ্বালানি কাঠের পরিবর্তে বিকল্প জ্বালানি সরবরাহ, উন্নত ভূমি ব্যবহার নীতি বাস্তবায়ন, বনের অবক্ষয় মোকাবিলায় অংশীজনের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ানো এবং সর্বোপরি জনসচেতনতা বৃদ্ধি টেকসই বন ব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। স্থানীয় এবং আদিবাসী সম্প্রদায় যাঁরা জীবিকা ও সংস্কৃতি চর্চার জন্য বনভূমির ওপর নির্ভরশীল, তাঁদের অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

দুর্যোগ এবং টেকসই উন্নয়ন:

দুর্যোগ বলতে প্রাকৃতিক কারণে এবং মানুষের ক্রিয়াকলাপে সৃষ্ট চরম বা বিপর্যয়মূলক পরিস্থিতিকে বোঝায়। এরকম ঘটনায় মানুষের জীবন, অবকাঠামো এবং পরিবেশের উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হয়। দুর্যোগ প্রায়ই আকস্মিক এবং অপ্রত্যাশিত, মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে প্রাকৃতিক শক্তির কারণে ঘটে, যেমন: বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, সুনামি ইত্যাদি। আবার মানুষের ভুল, অসর্তকতা বা অপরিকল্পিত কাজের ফলেও এ ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে, যেমন:জলাবদ্ধতা, সামাজিক নৈরাজ্য, অপরিকল্পিত নির্মাণ বা উন্নয়ন, যুদ্ধ ইত্যাদি। অনেক সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগ মানুষের ভুল বা অপরিণামদর্শী কর্মকান্ডের কারণে ত্বরান্বিতও হতে পারে, যেমন:অপরিকল্পিতভাবে পাহাড় কাটলে বা নদীতে বাঁধ দিলে বা বালি তুললে ভূমিধস, নদীভাঙন, বন্যা হতে পারে।

যেকোনো দুর্যোগের ফলে গুরুতর আর্থসামাজিক এবং পরিবেশগত বিপর্যয় হতে পারে, যা মোকাবিলায় তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ এবং দীর্ঘমেয়াদি উদ্যোগ প্রয়োজন হয়। দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ও সৃষ্ট পরিস্থিতির ভয়াবহতা আক্রান্ত সমাজের সামর্থ্যের ওপর বহুলাংশে নির্ভর করে। সামর্থ্য হচ্ছে দুর্যোগ সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর দুর্যোগকালে বা দুর্যোগের পরে ইতিবাচক সাড়া দেবার সার্বিক সক্ষমতা। কোনো জনগোষ্ঠীর সামর্থ্যের সঙ্গে সেখানকার টেকসই উন্নয়ন ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কীত। বাংলাদেশ তার ভৌগোলিক অবস্থান, ভূমিরূপ এবং জলবায়ুর কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষেত্রে অত্যন্ত ঝুঁকীপূর্ণ একটি দেশ। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা নদী প্রণালীর ব-দ্বীপ এবং বঙ্গোপসাগরের সীমান্ত ঘেঁষে থাকায় বাংলাদেশ সারা বছরই বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হয়। বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে রয়েছে বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস, নদীভাঙন,বজ্রপাত, ভূমিধস, খরা ইত্যাদি। দুর্যোগের মতো ঘটনা দেশের মানুষ, অবকাঠামো এবং অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্যভাবে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। আমরা বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কে জানি। তবে নদীমাতৃক এই দেশের একটি নিরন্তর সমস্যা হলো নদীভাঙন।

নদীভাঙন: নদীভাঙন বাংলাদেশের একটি দীর্ঘস্থায়ী প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বিশেষ করে খরস্রোতা নদীগুলোর তীরে এটি বেশি ধ্বংসাত্মক হয়ে ওঠে। বর্ষাকালে নদীর তীব্র স্রোতোধারা তীরকে দ্রুত ক্ষয় করে, যার ফলে কৃষি জমি, বসতভিটা এবং অবকাঠামো নদীতে বিলীন হয়। নদীভাঙন ঐসব এলাকার জনগোষ্ঠীকে বাস্তুহারা করে এবং এর ফলে তাঁদের স্বাভাবিক জীবন ও জীবিকা হুমকীর মুখে পড়ে। নদী ভাঙনের শিকার জনগোষ্ঠী অনেক ক্ষেত্রে ভূমিহীন হয়ে পড়ে। আর বারবার এমন ঘটলে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসিত করা রাষ্ট্রের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। আমাদের দেশে পদ্মা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা অববাহিকায় প্রায় ১২০০ কী.মি. এলাকা জুড়ে ভাঙন অব্যাহত আছে। এছাড়া বর্ষাকালে যমুনা নদীসহ দেশের অন্যান্য নদীর পানিপ্রবাহের তীব্রতা বৃদ্ধির ফলে প্রতি বছরই বহু মানুষ তাঁদের জমি-জমা, ঘরবাড়ি নদী ভাঙনের মাধ্যমে হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে যায়। ফলে ঐসব এলাকার মানুষ দারিদ্রের দুষ্টচক্র থেকে বের হতে বাধার সম্মুখীন হয়।

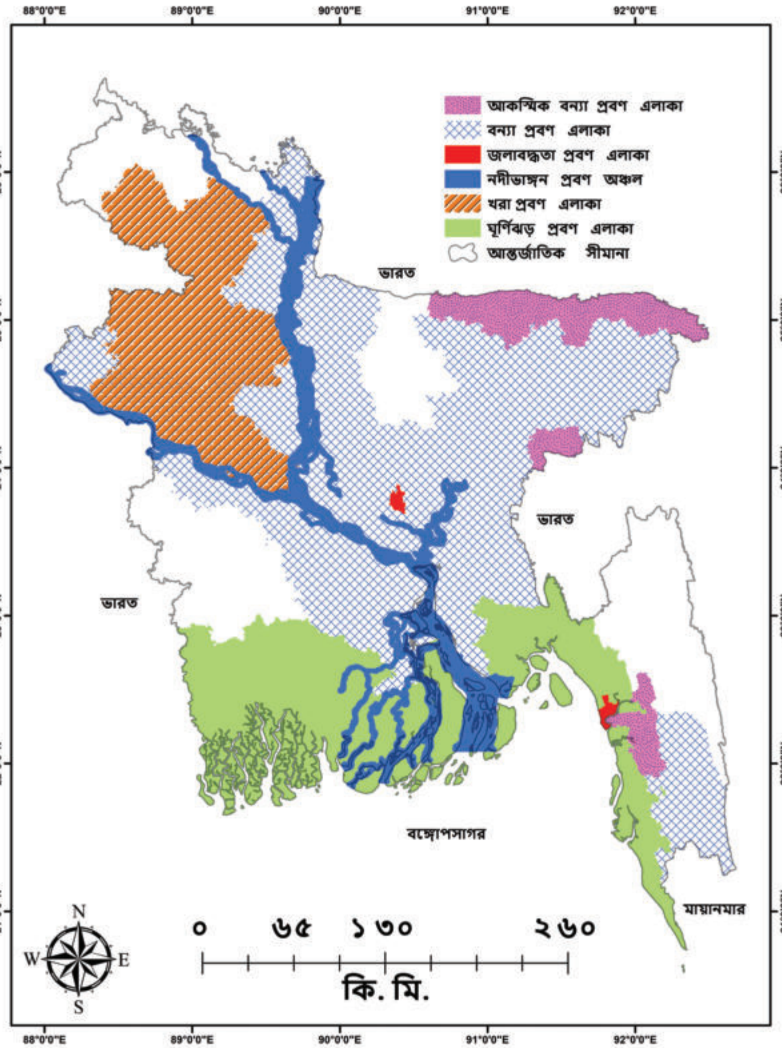

বাংলাদেশের প্রধান প্রধান প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ এলাকা

বজ্রপাত: পৃথিবীর অনেক দেশেই বজ্রপাতে মানুষের মৃত্যু ঘটে, তবে বাংলাদেশে মৃত্যুর হার ক্রমাগত বাড়ছে। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ২০২১ সালে বাংলাদেশে বজ্রপাতে ৩৬৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। আবার প্রতিবছর দেশে বজ্রপাত ১৫ শতাংশ হারে বাড়ছে। বনভূমি ও উঁচু বৃক্ষ উজাড়, তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও জলবায়ুর অন্যান্য নিয়ামকের পরিবর্তন বজ্রপাত বাড়ার মূল কারণ। আর ঘনবসতি, বজ্রপাতের মৌসুমে উন্মুক্ত স্থানে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড, আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুসরণ না করা, অসচেতনতা ইত্যাদি বাংলাদেশে বজ্রপাতে মৃত্যু বৃদ্ধির উল্লেখযোগ্য কারণ বলে মনে করা হয়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের হাওর এলাকায় বজ্রপাতে মৃত্যু বেশি পরিলক্ষিত হচ্ছে। বাংলাদেশ সরকার ২০১৬ সালে বজ্রপাতকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ হিসাবে ঘোষণা করে এটির কারণে জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনতে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগী হয়েছে।

জলাবদ্ধতা: সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশের নগর বা শহরগুলো বর্ষাকালে জলাবদ্ধতার মতো সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। বিশেষ করে ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরের বাসিন্দারা এ সমস্যায় সবচেয়ে বেশি ভুক্তভোগী। এর পেছনে দায়ী আমাদের অপরিকল্পিত অবকাঠামো উন্নয়ন, ত্রুটিপূর্ণ বর্জ্যব্যবস্থাপনা, প্লাস্টিক দূষণ, খাল-নালা ও অন্যান্য জলাশয়ের ভরাট ও দখল ইত্যাদি। তাই এ সমস্যা যে আমাদেরই সৃষ্ট তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। শহরের ড্রেন ও প্রাকৃতিক নালায় প্লাস্টিক বোতল, পলিথিন ও আবর্জনা ফেলার কারণে পানির স্বাভাবিক প্রবাহ আটকে যায় এবং অনেক স্থানে নালা সংকুচিত করার ফলে এ সমস্যা আরও প্রকট হয়েছে। যার ফলে একটু বৃষ্টি হলেই জলাবদ্ধতা তৈরি হচ্ছে। এ সমস্যা নিরসনে আমাদের সর্বাগ্রে প্রয়োজন নাগরিক সচেতনতা ও দায়িত্বশীল আচরণ। এছাড়া ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যকে বিবেচনায় নিয়ে পরিকল্পিত নগরায়ণ ও অবকাঠামো নির্মাণ এবং সার্বিকভাবে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার মাধ্যমে এ সমস্যাকে প্রশমিত করা সম্ভব।

ভূমিধস: ভূতাত্ত্বিক, ভৌগোলিক এবং মানবসৃষ্ট নানা কারণে ভূমিধসের মতো দুর্যোগ দেখা দেয়। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবন এলাকায় সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ভূমিধসের প্রকোপ বেড়েছে। এসব এলাকার পাহাড়গুলোর মাটিতে বেলে কণার আধিক্য দেখা যায়। ফলে ভারী বৃষ্টিপাতের সময় মাটির উপরেরঅংশ পানি ধারণ করে ভারী হয়ে উঠলে তা নিচের স্তরকে ছেড়ে দিয়ে প্রচন্ড বেগে নিচের দিকে নেমে আসে। আর পাহাড়ের পাদদেশে বসবাসরত মানুষ তখন এর নিচে চাপা পড়ে জান-মাল হারায়। সাম্প্রতিক সময়ে এ দুর্যোগে উল্লিখিত পাহাড়ি এলাকাগুলোতে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েছে। এ দুর্যোগের তীব্রতা বৃদ্ধির পেছনে মানবসৃষ্ট কারণও দায়ী, যেমন: নির্বিচার পাহাড় কেটে বসতি স্থাপন, রাস্তাঘাট ও কৃষিজমি সৃষ্টি, গাছ কেটে উজাড় করার ফলে মাটির ক্ষয় বৃদ্ধি পাওয়া ও ওপরের স্তর আলগা হয়ে যাওয়া। এছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বৃষ্টিপাতের বৈশিষ্ট্যে পরিবর্তন হচ্ছে, যেমন: অল্প সময়ে অধিক পরিমাণ বৃষ্টি, যার ফলে ভূমিধসের মতো দুর্যোগ বেড়েছে বলে মনে করা হয়।

খরা: খরা হলো দীর্ঘ সময় ধরে বৃষ্টিপাতের অস্বাভাবিক হ্রাস। খরার ফলে পানির অভাব, ফসলের ক্ষতি এবং পানির উৎসের ক্ষতি সাধিতা হয়। খরা কৃষি, খাদ্যনিরাপত্তা এবং জীবিকার ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে। মোটা দাগে খরাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়, যথা আবহাওয়ার শুষ্কতার ভিত্তিতে খরা এবং কৃষিকাজের জন্য মাটিতে আর্দ্রতার অভাবজনিত খরা। আমাদের দেশের উত্তরাংশ, বিশেষ করে বরেন্দ্র অঞ্চল খরাপ্রবণ এলাকা হিসাবে পরিচিত। এ অঞ্চলের রংপুর, দিনাজপুর, পাবনা, রাজশাহী, নাটোর, নওগাঁ, জয়পুরহাট, বগুড়া জেলা গুলোকে খরাপ্রবণ এলাকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বৃষ্টিপাতে পরিবর্তন এবং উজান থেকে আসা নদী গুলোর উৎসে বাঁধ দিয়ে শুষ্ক মৌসুমে পানিপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করার ফলে এ অঞ্চলে খরার প্রবণতা বাড়ছে বলে মনে করা হয়।

ভূমিকম্প: পৃথিবীর ভূত্বক থেকে হঠাৎ শক্তি নিঃসরণের ফলে ভূমি কাঁপতে থাকে, যার ফলে ভূমিকম্প হয়। এর ফলে ভবন ধস, ভূমিধস এবং ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ ঘটে। সাগরের তলদেশে ভূমিকম্প হলে তাতে সুনামি হতে পারে। বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিকভাবে এমন এলাকায় অবস্থিত যেখানে দুটো প্লেটের সংযোগস্থল রয়েছে যার নাম; ডাউকী ফল্ট। সিলেট থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে এ ফল্টের কারণে বাংলাদেশ ভূমিকম্পের ঝুঁকীতে রয়েছে। ভূমিকম্প হলে বাংলাদেশে ক্ষয়ক্ষতি ব্যাপক হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এর পেছনে কারণ হলো অপরিকল্পিতভাবে তৈরি ভবন, ভূমিকম্প প্রতিরোধী ভবন তৈরিতে উদাসীনতা, ভূমিকম্প নিয়ে সচেতনতা ও প্রস্তুতির অভাব। তাই ভূমিকম্পজনিত দুর্যোগ মোকাবিলায় জাতীয় ও ব্যক্তি পর্যায়ে আমাদের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি থাকা জরুরি।

উপরে উল্লিখিত দুর্যোগের বাইরেও লবণাক্ততার বিস্তৃতি, গ্রীষ্মকালে কালবৈশাখী বা টর্নেডো, নদী ও পানি দূষণ, বড়ো শহরগুলোতে অতিরিক্ত মাত্রায় বায়ুদূষণ, মাটিদূষণ, বড়ো বড়ো নগরগুলোরে তাপীয়-দ্বীপের সৃষ্টি ও দাবদাহ, ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়া, আর্সেনিক দূষণের মতো সমস্যাগুলো দিনে দিনে মানুষের কাছে ভয়াবহ বার্তা নিয়ে আসছে।

চিত্রে ডটেড লাইনের মাধ্যমে গ্রাম, উপশহর বা নগর কেন্দ্রের তাপীয় অবস্থার একটি তুলনামূলক ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। নগর কেন্দ্রের দিকে লাইনটি উঁচু হয়ে দ্বীপের আকৃতি লাভ করেছে, যাকে বলা হচ্ছে নগর-তাপীয়-দ্বীপ।

উন্নত দেশসগুলো বড়ো শহরগুলো বা অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশ গুলোর ঘনবসতিপূর্ণ অপরিকল্পিত শহরগুলোর মানুষ তাঁদের আশপাশের গ্রামাঞ্চলগুলো থেকে বেশি গরম অনুভব করে। পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল থেকে শহরগুলো এরকম অধিক উত্তপ্ত থাকাকে নগর-তাপীয়-দ্বীপ (Urban Heat Island) বলা হয়। শহরের পাকা দালান ও রাস্তাঘাট, শিল্পকারখানা, যানবাহন, অপরিকল্পিত উন্নয়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের জনিত কারণ নগর-তাপীয়-দ্বীপ সৃষ্টির জন্য দায়ী বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন প্রস্তুতি এবং তা ঘটলে দুর্গত মানুষদের প্রয়োজনে দ্রুত সাড়া দান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য বাংলাদেশ সরকার এবং কমিনিউনিটি পর্যায়ে নিম্নলিখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়:

১. আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা: সরকার ঘূর্ণিঝড়, বন্যা এবং অন্যান্য দুর্যোগ আঘাত হানার বিষয়ে সময়মতে তথ্য প্রদানের জন্য আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ এবং আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থার একটি বিস্তৃত নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে। এই ব্যবস্থাগুলো বিপন্ন জনগোষ্ঠীকে সরিয়ে নিতে এবং প্রাণহানি কমাতে সাহায্য করে।

২. দুর্যোগকালীন সাড়াদান এবং ত্রাণ: সরকার, বিভিন্ন সংস্থা এবং জনসাধারণের একযোগে সাড়া দেওয়ার প্রক্রিয়া চালু আছে। তারা অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযান, জরুরি চিকীৎসা সেবা, ত্রাণসামগ্রী বিতরণ এবং বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের জন্য অস্থায়ী আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন। দুর্যোগের সময় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেন যথাযথ ও সমন্বিত ভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারে, সেজন্য সরকার দুর্যোগের সময়ের জন্য স্থায়ী আদেশাবলী (SOD) প্রণয়ন করেছে।

৩. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং প্রস্তুতি: সরকারের জাতীয় নীতি ও কৌশলে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং প্রস্তুতির ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এর সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছে সক্ষমতা তৈরি, প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এবং সচেতনতামূলক প্রচারণা যাতে জনগণ এবং প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বাড়ানো যায়।

৪. জনসচেতনতা এবং শিক্ষা: সম্ভাব্য ঝুঁকী, নিরাপত্তাব্যবস্থা এবং উদ্ধারপ্রক্রিয়া সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা গেলে দুর্যোগ মোকাবিলার প্রস্তুতি এবং সাড়াদানের কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করা সম্ভব, এসব কাজের মধ্যে রয়েছে জনসচেতনতামূলক প্রচারণা, স্কুল প্রোগ্রাম এবং কমিউনিটি ড্রিল ইত্যাদি।

৫. টেকসই অবকাঠামো: প্রাকৃতিক দুর্যোগ সহ্য করতে পারে এমন টেকসই অবকাঠামো তৈরি করা অপরিহার্য। এর মধ্যে রয়েছে বিল্ডিং কোড এবং নির্ধারিত মান অন্তর্ভুক্ত করা, গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোকে শক্তিশালী করা এবং ভূমি-ব্যবহারের সঠিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন।

৬. পরিবেশ সংরক্ষণ: ম্যানগ্রোভ, জলাভূমি এবং বনের মতো প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্র রক্ষা ও সংরক্ষণ করা প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব প্রশমিত করতে সাহায্য করতে পারে। এই বাস্তুতন্ত্রগুলো প্রাকৃতিক সুরক্ষা ব্যবস্থার কাজ, ঝড়ের তীব্রতা হ্রাস, ক্ষয় রোধ এবং অন্যান্য বাস্তুতান্ত্রিক সেবা প্রদান করে। সিডর এবং আইলার মতো ঘূর্ণিঝড়ের সময়ে সুন্দরবন যেভাবে আমাদের ক্ষতি কমিয়ে দিয়েছে, তা পরিবেশ এবং বনভূমির গুরুত্বকে বিশেষ ভাবে তুলে ধরে।

৭. **কমিউনিটি-ভিত্তিক পদ্ধতি:** কমিউনিটি-ভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উদ্যোগের মধ্যে প্রাথমিক সতর্কীকরণ ব্যবস্থা, দুর্গত মানুষকে উদ্ধার পরিকল্পনা এবং স্থানীয় পর্যায়ের প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই উদ্যোগগুলো দুর্যোগ আক্রান্ত এলাকার মানুষকে প্রস্তুতি, সাড়াদান এবং পুনরুদ্ধারে সক্রিয় ভূমিকা নিতে সক্ষম করে তোলে।

টেকসই উন্নয়নের ভিত্তি হলো এমন একটি সাংগঠনিক উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়ন যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চাহিদা পূরণের সক্ষমতা অর্জনের সঙ্গে বর্তমানের চাহিদা পূরণের প্রচেষ্টা নেওয়া হয়। অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক-সাংস্কৃতিক উন্নয়ন, রাজনৈতিক উন্নয়ন এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পরিবেশ সুরক্ষা টেকসই উন্নয়েনর মূল তিনটি অনুষঙ্গ। টেকসই উন্নয়নকে প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হয়েছিল ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের শহর রিও ডি জেনেরিওতে অনুষ্ঠিত আর্থ সামিটে। দুর্যোগ ঝুঁকী হ্রাস সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। আবার সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নের নিশ্চিত করতে পারলেই মানুষের দুর্যোগ মোকাবিলার এবং দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে পুনর্বাসনের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে দুর্যোগের ঝুঁকী কমানোর জন্য পরিবেশ ব্যবস্থাপনা, ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, জরুরি প্রয়োজন ও সেবার সুরক্ষা, আন্তঃযোগাযোগ ও সহযোগিতা এবং আর্থিক সক্ষমতা নিশ্চিত করা হয়। এ বিষয়গুলোর যোগান নিশ্চিত করার মাধ্যমে দুর্যোগের জন্য আগামবার্তা, প্রস্তুতি, দুর্যোগকালীন সাড়া দেওয়া এবং দুর্যোগ পরবর্তী পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়।

সম্পদের উৎপাদন ও সমতার নীতি

এই শিখন অভিজ্ঞতায় আমরা প্রাত্যহিক জীবনের ব্যবহার্য কয়েকটি পণ্যের তালিকা তৈরি করব। এরপর এই সব পণ্য থেকে যেগুলো প্রয়োজনীয়, অতীব প্রয়োজনীয় ও কম প্রয়োজনীয় তা নির্ণয় করব। প্রয়োজনীয় ও অতীব প্রয়োজনীয় পণ্য বা দ্রব্যগুলোর বর্তমান ও একবছর আগের বাজার মূল্য নিকটস্থ কোনো বাজার পরিদর্শন করে জেনে নিব। এই পণ্য বা দ্রব্যের উৎপাদন, বণ্টন, ভোগ ও সংরক্ষণ প্রক্রিয়া আমরা অর্থনীতির কেন্দ্রীয় সমস্যার আলোকে সমাধান করব।

দলগত কাজ ১:

এখন চলো আমরা ৫-৬ জন নিয়ে একটি দল গঠন করে ফেলি। দলে আলোচনা করে আমরা প্রাত্যহিক জীবনের ব্যবহার্য কয়েকটি পণ্যের তালিকা তৈরি করি। এগুলোর মধ্যে কোনগুলো অতীব প্রয়োজনীয়, প্রয়োজনীয় ও কম প্রয়োজনীয় তা নির্ণয় করে নিচের ছকটি পূরণ করি।

পণ্য বা দ্রব্য নির্বাচন ছক

অতীব প্রয়োজনীয় দ্রব্য	প্রয়োজনীয় দ্রব্য	অপেক্ষাকৃত কম প্রয়োজনীয়

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

আমরা উপরোক্ত ছকগুলোর মধ্যে অতীব প্রয়োজনীয় ও প্রয়োজনীয় পণ্যগুলোর মূল্য বা দাম সম্পর্কীত একটি জরিপ পরিচালনা করব। নিকটস্থ কোনো বাজার পরিদর্শন করে পণ্য বা দ্রব্যের মূল্য বা দাম সম্পর্কীত তথ্য সংগ্রহ করব। আমরা দলে আলোচনা করে একটি জরিপ ফর্ম তৈরি করব। নিচে একটি নমুনা জরিপ ফর্ম দেওয়া হলো।

জরিপ ফর্ম		
স্থান:	বাজার/দোকানের নাম:	
পণ্যের নাম	পণ্যের মূল্য	
	বর্তমান মূল্য	এক বছর আগের মূল্য
১.		
২.		
৩.		
৪.		
৫.		

এরপর আমরা জরিপ ফর্মের তথ্য থেকে যেগুলোর মূল্য বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে সেগুলো নির্ধারণ করি। দলের কাজ শেষ হলে প্রতি দল থেকে ১-২ আমাদের দলের কাজ উপস্থাপন করি।

দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির সমস্যাটি কীভাবে অর্থনীতির কেন্দ্রীয় সমস্যার আলোকে সমাধান করা যায় সেটি নিয়ে আমরা কাজ করব। কিন্তু তার আগে অর্থনীতির কেন্দ্রীয় সমস্যা ও তার সমাধানের উপায় সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে। এই জন্য আমরা নিচের অংশটুকু পড়ে নিই।

অর্থনীতির কেন্দ্রীয় সমস্যা

আমরা আমাদের জীবনে অনেক বস্তু বা দ্রব্য পেতে চাই। ইচ্ছা থাকলেও আমরা অনেক সময় সেই বস্তু বা দ্রব্য পাই না বা ক্রয় করি না। চলো আমরা খুঁজে বের করি আমাদের জীবনে এমন কী কী আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। আমাদের কোন কোন দ্রব্যের অভাব রয়েছে। সবগুলো দ্রব্য কী আমরা একসঙ্গে পেতে পারি? কোন দ্রব্য পাওয়ার জন্য আমাদের আকাঙ্ক্ষা সবচেয়ে বেশি? কোন দ্রব্যগুলো দুষ্প্রাপ্য অর্থাৎ সহজে পাওয়া যায় না?

অনুশীলনী ১:

ক্রম	আকাঙ্ক্ষা বা অভাববোধ রয়েছে- দ্রব্যের নাম	এটি কী খুব প্রয়োজনীয়? (হ্যাঁ/না)	এটি কী দুষ্প্রাপ্য দ্রব্য? (হ্যাঁ/না)
১.			
২.			
৩.			
৪.			

মানুষ বা ভোক্তা সব অভাব বা আকাঙ্ক্ষা একত্রে পূরণ করতে পারে না তাই অসীম অভাবের মধ্যে থেকে তাকে বাছাই করতে হয় কোন অভাবটি আগে পূরণ করবে। এই বাছাই প্রক্রিয়াকে অর্থনীতিতে নির্বাচন (Choice) হিসাবে গণ্য করা হয়। ভোক্তা তাঁর অভাবগুলোর মধ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নির্বাচন করে থাকে কোন অভাবগুলো আগে পূরণ করবে। যে অভাবটি অপেক্ষাকৃত বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভোক্তা তা আগেই পূরণ করার চেষ্টা করে।

ভোক্তা যেমন তার সব অভাব একসঙ্গে পূরণ করতে পারে না ঠিক তেমনি উদ্যোক্তাও সব পণ্য বা সেবা একসঙ্গে উৎপাদন করতে পারে না। কারণ সম্পদ সীমিত ও ভোক্তার অসীম চাহিদা। সম্পদ হচ্ছে যে সব দ্রব্য বা পণ্য মানুষের অভাব পূরণ করে। কিন্তু এর যোগান অপ্রতুল। চলো সীমিত সম্পদ ও ভোক্তার অসীম চাহিদার সমস্যাটি আমরা সমাধান করার চেষ্টা করি। যেহেতু উদ্যোক্তার সম্পদ সীমিত এবং ভোক্তার আকাঙ্ক্ষা অসীম তাই উদ্যোক্তা কীভাবে সীমিত সম্পদে অধিক পরিমাণে ভোক্তাকে সন্তুষ্ট করতে পারবেন তা নিয়ে ভেবে নিচের ছকটি পূরণ করি।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

অনুশীলনী ২

ক্রম	কেন্দ্রীয় সমস্যা সমাধানে উদ্যোক্তার করণীয়

আমরা সবাই মিলে বেশ কিছু বিষয় লিখেছি। এই বিষয়গুলোর সঙ্গে আমরা অর্থনীতির কেন্দ্রীয় সমস্যাগুলোর হয়তো মিল খুঁজে পাব । তার আগে আমরা রূপকের গল্পটি পড়ে নিই এবং কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজি।

রূপক খুব সুন্দর ছবি আঁকতে পারে। তার আঁকা ছবি বন্ধু ও এলাকার মানুষের কাছে খুব জনপ্রিয়। বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে অনেকেই তাকে কার্ড, টি-শার্ট বা মগের ওপর ছবি এঁকে দিতে বলে। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ তাকে পারিশ্রমিকও দিয়ে থাকে।

পরিচিত অনেকেই রূপককে এই বছরের পহেলা বৈশাখে কার্ড তৈরি করে বিক্রি করার পরামর্শ দিয়েছে। পরিবারের সঙ্গে পরামর্শ করে রূপক সিদ্ধান্ত নিল পহেলা বৈশাখে কার্ড বানিয়ে বিক্রি করবে । তাই কার্ড তৈরি করার আগে কারা কারা কার্ড কীনতে পারে এমন একটি লিস্ট করল। তার এই পরিকল্পনার কথা শুনে বন্ধু, পরিচিত ও এলাকাবাসী মিলিয়ে প্রায় ১০০ জন তার কাছ থেকে কার্ড কেনার আগ্রহ দেখাল।

রূপকের কার্ড বানানোর জন্য যে কাগজ ও রঙ পেন্সিল দরকার সেগুলো ইতোমধ্যে শেষ হয়ে গেছে। তাই সে বাজারে গিয়ে কাগজ ও রঙ পেন্সিল কেনার সিদ্ধান্ত নিল।

রূপকের কাছে ১০০০ টাকা আছে। সেই টাকা নিয়ে বাজারে গিয়ে দেখলো কার্ড বানানোর জন্য ২ ধরনের কাগজ আছে। এক ধরনের প্রতিটি কাগজের মূল্য ১০ টাকা । আরেক ধরনের প্রতিটি কাগজের মূল্য ১২ টাকা। অন্যদিকে একটা বক্সে ১০টি রং পেন্সিল আছে তার দাম ১৫০ টাকা এবং আরেকটাতে ১৫টি রং পেন্সিল আছে যার দাম ২০০ টাকা। রূপক দেখল ১,০০০ টাকা দিয়ে ১০০ জনের জন্য কার্ড বানানো সম্ভব নয়। তাই তাকে কিছু বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সে অর্থনীতির কেন্দ্রীয় সমস্যার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিল।

আমরাও রূপকের সমস্যাটির সমাধান করার চেষ্টা করি।

অনুশীলনী ৩:

রূপক কী তৈরি করবে? কত পরিমাণে তৈরি করতে পারবে? (What to produce & how much?)	
রূপক কীভাবে বা কোন প্রক্রিয়ায় কার্ডগুলো তৈরি করবে? (How to produce?)	
রূপক তার পণ্য (কার্ড) কাদের জন্য তৈরি করবে? (For whom to produce?)	

চলো আমরা এখন অর্থনীতির কেন্দ্রীয় সমস্যা সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নিই। তাহলে এই প্রশ্নের উত্তর আমরা পেয়ে যাব।

অর্থনীতির কেন্দ্রীয় সমস্যা (Central Problem of an Economy)

একজন উৎপাদক (বা ব্যবসায়ী বা উদ্যোক্তা বা দেশ বা অর্থনীতি) সব প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও সেবা একসঙ্গে উৎপাদন করতে পারেন না। একজন ভোক্তা যেমন তাঁর সকল অভাব একত্রে পূরণ করতে পারেন না তেমনি একজন উদ্যোক্তাও সকল পণ্য ও সেবা একসঙ্গে উৎপাদন করতে পারেন না । যেহেতু একটি দেশের বা অর্থনীতির সম্পদ সীমিত বা অপর্যাপ্ত তাই ইচ্ছা করলেই আমরা সব জিনিস/ দ্রব্য-সেবা সামগ্রী উৎপাদন করতে পারি না। তখন আমাদের চিন্তা করতে হয়:

- ✓ কী দ্রব্য উৎপাদন করা হবে এবং কী পরিমাণে উৎপাদন করা হবে? (What to produce & how much?)
- ✓ কীভাবে উৎপাদন করা হবে? (How to produce?)
- ✓ কাদের জন্য উৎপাদন করা হবে ? (For whom to produce?)

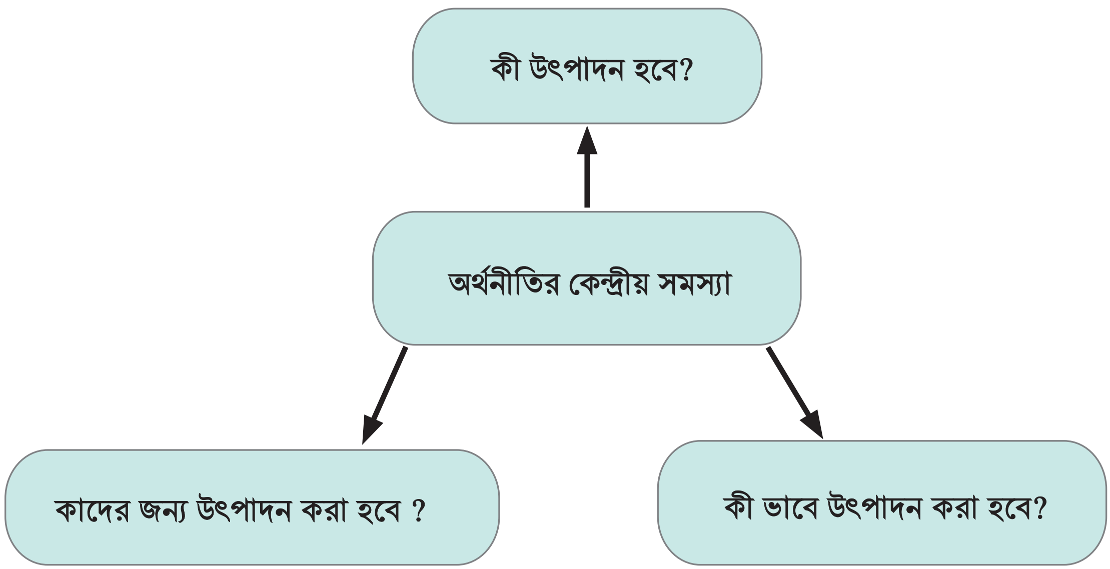

অর্থনীতির কেন্দ্রীয় সমস্যা

সম্পদের স্বল্পতা বা অপর্যাপ্ততাই হলো কেন্দ্রীয় সমস্যার মূল কারণ। আমরা কেন্দ্রীয় সমস্যাগুলো বিস্তারিত জানার চেষ্টা করব।

১। কী দ্রব্য উৎপাদন করা হবে? (What to produce?)

প্রতিটিটি অর্থনীতি বা সমাজকে অনেক গুলো সম্ভাব্য বিকল্প দ্রব্য ও সেবা থেকে কোন কোন দ্রব্য ও সেবা কতটুকু উৎপাদন করবে তার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। একটা দেশের অর্থনীতি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয় কোন কোন দ্রব্যগুলো আগে উৎপাদন করবে এবং কী পরিমাণে উৎপাদন করবে।

ধরো আমাদের মৌলিক চাহিদা অন্ন / খাদ্য , বস্ত্র, বাসস্থান ও শিক্ষা-চিকীৎসার অভাব আগে পূরণ করব না বিলাস দ্রব্য/ যুদ্ধাস্ত্র তৈরি করব । আমাদের সম্পদ যেহেতু সীমিত, তাই সব মৌলিক চাহিদাও একত্রে পূরণ করতে পারব না । তখন আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কোন দ্রব্য কী পরিমাণ উৎপাদন করব ।যেমনঃ আমাদের সরকারকে সিদ্ধান্ত নিতে হয় কোন কোন খাতে বাজেটের/ সম্পদের বেশি ব্যবহার করতে হয়। সরকারের যেহেতু সীমিত বাজেট বা সম্পদের স্বল্পতা রয়েছে তাই সরকার ইচ্ছে করলেও সব খাতে একত্রে বেশি বরাদ্দ বা ব্যয় করতে পারে না । তাই বিভিন্ন ধরনের বিকল্প সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

২। কীভাবে দ্রব্যগুলো উৎপাদন করা হবে? (How to produce?)

একজন উৎপাদককে বা সংগঠককে বা রাষ্ট্রকে সিদ্ধান্ত নিতে হয় কী উৎপাদন করা হবে ? এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর তাকে আবার ভাবতে হয় এই দ্রব্যগুলো কীভাবে বা কী প্রক্রিয়ায় উৎপাদন করা হবে? এক্ষেত্রে উৎপাদককে সিদ্ধান্ত নিতে হয় সে কী বেশি পরিমাণ শ্রম এবং কম পরিমাণ মূলধন বা কম পরিমাণ শ্রম লাগিয়ে বেশি পরিমাণ মূলধন ব্যবহার করে উৎপাদন করবে। আমরা যখন একটি কৃষি খামার পরিদর্শন করেছি তখন দেখেছি যে, শ্রমিকের ব্যবহার বেশি হচ্ছে যন্ত্রপাতির অর্থাৎ মূলধনের তুলনায়।

আবার যখন তৈরি পোশাক শিল্প কারখানায় পরিদর্শন করেছি তখন দেখেছি আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে কীভাবে উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে শ্রমের পরিবর্তে মূলধনের ব্যবহার বেশি হচ্ছে। এক্ষেত্রে একজন মালিককে সিদ্ধান্ত নিতে হয় তিনি কোন ধরনের উপকরণ কী পরিমাণে ব্যবহার করবেন ।

তবে সাধারণত যে দেশে প্রচুর সংখ্যাশ্রমিক পাওয়া যায় অর্থাৎ শ্রমঘন অর্থনীতির দেশ সেখানে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শ্রমের ব্যবহার বেশি দেখা যায়। অন্যদিকে যে সব দেশে মূলধনের প্রাচুর্য্য রয়েছে তারা উৎপাদনে কম পরিমাণ শ্রম এবং বেশি পরিমাণ মূলধন বা মূলধনী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে।

৩। কাদের জন্য উৎপাদন করা হবে? (For whom to produce?)

কাদের জন্য উৎপাদন করা হবে? এটিকে আমরা সহজে বলতে পারি যে, উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবা কারা ভোগ করবে অথবা কাদের মাঝে বণ্টিত হবে? উৎপাদনের উপকরণের মালিকরা কে কী পরিমাণ ভোগ করবে? কে বেশি পাবে অথবা কে কম পাবে? অর্থনীতিতে সবার মৌলিক চাহিদা পূরণ করা উচিত নাকী উচিৎ নয়?

উৎপাদিত পণ্যের বণ্টন কীভাবে হবে এবং কাদের মাঝে কতটুকু বণ্টন হবে, এই প্রশ্নের সমস্যার সম্মুখীন হয়। যে-কোনো দেশের/ অর্থনীতির কেন্দ্রীয় সমস্যা হল, অপর্যাপ্ত সম্পদের বণ্টন এবং চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবার সুষ্ঠু বিতরণ ব্যবস্থাপনা। আমরা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে যেমন সব অভাব/ আকাঙ্খা একসঙ্গে পূরণ করতে পারি না তেমনি একটি দেশের অর্থনীতিতেও সম্পদের স্বল্পতা থাকার কারণে সব দ্রব্য ও সেবা একত্রে উৎপাদন করতে পারে না । যার ফলে সমস্যা সৃষ্টি হয় যাকে আমরা অর্থনীতির কেন্দ্রীয় সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করেছি।

দলগত কাজ ২:

এখন আমরা পূর্বের মতো দলে বসি। এর আগে আমরা কিছু পণ্যের বাজার মূল্য বেশি তা নির্ধারণ করেছিলাম। মনে আছে? চলো, এখন এলাকার মানুষের জন্য সেই পণ্য বা দ্রব্যগুলোর উৎপাদন ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সমস্যার আলোকে বিবেচনা করি। তার আগে আমরা সপ্তম শ্রেণির 'সম্পদের কথা' শিখন অভিজ্ঞতা থেকে উৎপাদানের উপাদান/উপকরণ সম্পর্কে জানব। আমরা দলে আলোচনা করে আমাদের নির্ধারিত বেশি মূল্যের দ্রব্য বা পণ্য কী পরিমাণে উৎপাদন করা প্রয়োজন, কীভাবে উৎপাদন (উৎপাদনের উপাদান/উপকরণ) করা প্রয়োজন এবং কার জন্য (ভোক্তা কারা) উৎপাদন করা প্রয়োজন তার সম্ভাব্য পরিমাণ, উপায় ও ভোক্তা নির্ণয় করব। মনে রাখব, সম্ভাব্য ভোক্তা নির্বাচন করার সময় ভোক্তার আয় এবং উৎপাদকের উৎপাদনের উপকরণ চিহ্নিত করা প্রয়োজন। একটি নমুনা উত্তর দেওয়া হল।

অনুশীলনী ৩:

পণ্য (যে সব পণ্যের মূল্য বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে) (What to Produce)	কী পরিমাণে উৎপাদন (How much/many)	কীভাবে উৎপাদন (How to produce)	কার জন্য উৎপাদন (Whom to produce)
চাল	এলাকার পরিবারের সদস্য সংখ্যা গড়ে ৫ থেকে ৬ জন। প্রতি পরিবারে প্রতিদিন আনুমানিক ৩ কেজি চাল লাগে। এলাকায় প্রায় ১০০ টি পরিবারের জন্য দৈনিক আনুমানিক ৩০০ কেজি চাল লাগবে।	কৃষক ভূমি ও অর্থের মাধ্যমে বীজ, সার, কীটনাশক ইত্যাদি ক্রয় করবেন। তিনি শ্রমিক নিয়োগ দিবেন। তিনি স্থানীয় বাজারে তা বিক্রি করবেন। উৎপাদন বাড়ানোর জন্য কৃষককে আর্থিক সহায়তা দিলে তিনি উৎপাদনের উপকরণের সংখ্যাবৃদ্ধি করতে পারবেন। ফলে উৎপাদন বাড়বে।	এলাকার মানুষ

দলগত কাজ ৩:

আমরা আমাদের নির্ধারিত পণ্যগুলোর উৎপাদন প্রক্রিয়া ও ভোক্তা নির্ধারণ করেছি। এখন আমরা এগুলোর বণ্টন ও সংরক্ষণ প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করে নিচের ছকটি পূরণ করি। আমাদের সুবিধার জন্য একটি নমুনা উত্তর দেখানো হল।

পণ্য	বণ্টন প্রক্রিয়া	সংরক্ষণ
চাল	এলাকার সব পরিবারের কাছে চাল বণ্টন করার জন্য পরিবারগুলোর ক্রয় ক্ষমতা নির্ণয় করতে হবে। এই ক্রয় ক্ষমতার ভিত্তিতে চালের দাম নির্ধারিত হবে। এরপর স্থানীয় বাজারের মাধ্যমে ভোক্তার কাছে পৌঁছে দিতে হবে।	চাল সারা বছর সংরক্ষণ করার জন্য গুদাম ঘরের ব্যবস্থা ও পোকামাকড়ের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা।

এখন আমরা দলে আলোচনা করে দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধির ফলে সমাজে কী কী বৈষম্য দেখা দিতে পারে তা শনাক্ত করে লিখি।

দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধির ফলে সমাজে সৃষ্ট বৈষম্য

এখন আমরা বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে জেনে নিই।

১. পুঁজিবাদী বা ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা

এ অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণের মালিকানা, ভোগ, বণ্টন ইত্যাদি ব্যক্তি বা উদ্যোক্তার ওপর নির্ভর করে। অর্থাৎ ভোক্তা ও উৎপাদনকারীর মাধ্যমে সৃষ্ট বাজার ব্যবস্থা অনুযায়ী হয়। এখানে সরকার কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ করে না। কী উৎপাদন করবে এবং কী পরিমাণ উৎপাদন করবে তা নির্ভর করে বাজারে কোন দ্রব্যের/পণ্যের চাহিদা রয়েছে তার ওপর। বাজারে যদি কোনো একটি নির্দিষ্ট পণ্যের চাহিদা ব্যাপক থাকে এবং তার বিনিময়ে বিক্রেতা ভালো দাম পায় তাহলে বাজার অর্থব্যবস্থায় ঐ পণ্যের উৎপাদন বেশি হয়। এ কারণে এ ব্যবস্থাকে অনেক সময় বাজার অর্থনীতিও বলা হয়।

কীভাবে দ্রব্যটি উৎপাদিত হবে? বাজার অর্থব্যবস্থায় নিম্নরূপে এর সমাধান হয়:

উৎপাদনকারী/উদ্যোক্তা হিসাব করে দেখে, কোন প্রক্রিয়ায় উৎপাদন করলে তার উৎপাদন খরচ সর্বনিম্ন হয়। সেই উৎপাদন পদ্ধতিতে তারা উৎপাদন করে থাকে। যেমন: যে দেশ দরিদ্র ও জনসংখ্যা বেশি সেখানে কম মূল্যে শ্রম পাওয়া যাওয়ার সম্ভবনা বেশি। ফলে সেখানে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় কম পরিমাণে মূলধন বা আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়। কারণ সেখানে শ্রমিককে অল্প পরিমাণে মজুরি দিয়ে কম খরচে অধিক উৎপাদন করিয়ে নেওয়া যায়।

আবার যে দেশে/স্থানে শ্রমের মূল্য অধিক বা শ্রমিককে বেশি মজুরি দিতে হয় সে দেশে/স্থানে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বেশি পরিমাণে মূলধন বা আধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তির ব্যবহার বেশি হয় এবং কম পরিমাণ শ্রমিক ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ বাজার অর্থব্যবস্থায় উৎপাদক কী উৎপাদন করবেন এবং কীভাবে উৎপাদন করবেন এ দুই ক্ষেত্রেই স্বাধীনতা ভোগ করেন।

বর্তমানে খাঁটি/বিশুদ্ধ বাজার অর্থব্যবস্থা বা পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা বলতে তেমন কোনো দেশ নেই। কারণ ভোক্তার সুবিধার্থে প্রতিটি দেশকেই বাজারের ওপর কিছু না কিছু হস্তক্ষেপ করতে হয় বা সরকারের হাতে কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান রাখতে হয় জনকল্যাণ নিশ্চিত করতে। তাই বাস্তবে বিশুদ্ধ বাজার অর্থব্যবস্থা পাওয়া সত্যিই কঠিন। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানি, জাপান প্রভৃতি দেশে বাজার অর্থব্যবস্থা চালু রয়েছে। যাকে ধনতন্ত্র বা পুঁজিবাদ বলা হয়।

বাজার অর্থব্যবস্থায় একজন উৎপাদকের মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে নূন্যতম খরচে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন। এইজন্য উৎপাদন খরচ যতই কম পরিমাণে হবে ততই তার মুনাফা বাড়বে। উৎপাদন খরচ কমাতে হলে, উৎপাদক/উপকরণের মালিককে যথাসম্ভব কম মূল্য পরিশোধ করতে দেখা যায়। যেমন: একজন শ্রমিক দিনে উৎপাদনে যে পরিমাণে অবদান রাখেন বা উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে মূল্য সৃষ্টি করেন তাকে কিন্তু মজুরি হিসাবে খুবই কম পরিমাণ পরিশোধ করা হয়।

বাজার অর্থব্যবস্থায় ভোক্তা বিভিন্ন ধরনের পণ্য বা দ্রব্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ভোগ করেন। অর্থাৎ একজন ভোক্তা তার পছন্দ ও সামর্থ্য অনুযায়ী বাজার থেকে দ্রব্য ও সেবা সামগ্রী ক্রয় করতে পারেন। বাজার অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনে দক্ষতা অর্জিত হয়। অনেক ধরনের উদ্যোক্তা থাকার কারণে বাজারে এক ধরনের প্রতিযোগিতাও কাজ করে। এর ফলে উৎপাদকদের মাঝে মানসম্পন্ন দ্রব্য উৎপাদনে প্রতিযোগিতা দেখা দেয়। ফলে বাজার অর্থব্যবস্থায় কিছু সুফলও পাওয়া যায় । যার ফলে ভোক্তারা অনেক সময় উপকৃত।

২. সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা

কোন পদ্ধতিতে উৎপাদন করবে এবং কাদের মাঝে উৎপাদিত দ্রব্য বণ্টিত হবে সবকিছুই কেন্দ্রের/রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরিচালিত হবে। একে পরিকল্পিত বা নির্দেশনামূলক অর্থব্যবস্থাও বলা হয়।

সমাজে যাতে বৈষম্য প্রকট আকার ধারণ না করে এজন্য সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে ভূমি, শ্রম, মূলধন, কলকারখানা, গণপরিবহণ, বিদ্যুৎ কেন্দ্র, অন্যান্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক-বিমা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ইত্যাদি সব কিছুরই মালিকানা রাষ্ট্রের হাতে থাকে। রাষ্ট্র পরিকল্পনা অনুযায়ী উৎপাদনের পরিমাণ এবং সমাজের জন্য কী দ্রব্য প্রয়োজন সেই মোতাবেক সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। এই ক্ষেত্রে ব্যক্তি বা উদ্যোক্তার বা ভোক্তার কোনো ধরনের মতামত বা স্বাধীনতা থাকে না। রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত মোতাবেক সবাই যৌক্তিক বা নিয়ন্ত্রিত আচরণ করে। এই অর্থব্যবস্থায় সমাজের কল্যাণকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হয় যাতে শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। এখানে মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা প্রায় শূন্য বা অনুপস্থিত। মূল্য ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সরকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। কোনো ভোক্তা বা ব্যবসায়ী/উদ্যোক্তার দাম নিয়ন্ত্রণ করার সুযোগ নেই।

ধনতান্ত্রিক বা বাজার অর্থনীতিতে ব্যক্তিগত আয়ের মাধ্যমে কোনো ভোক্তা কী পরিমাণ ভোগ করবে তা নির্ভর করে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে যেহেতু উপকরণের বা সম্পদের মালিকানা থেকে কোনো ব্যক্তিগত আয় সৃষ্টি হয় না তাই ব্যক্তির ভোগের পরিমাণ এবং কোন দ্রব্য ও সেবা ভোগ করবে তা নির্ভর করে কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের ওপর। বর্তমানে উত্তর কোরিয়া একটি সর্বাধিক কেন্দ্রীভূত সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা। চীন ও কীউবায় আংশিক সমাজতন্ত্র চালু আছে।

তাত্ত্বিক সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে বণ্টননীতি হলো ‘প্রতিটিে অবদান রাখবে তাঁর যোগ্যতা অনুযায়ী এবং পাবে

তার প্রয়োজন অনুযায়ী'। তবে বাস্তবে দেখা যায়, এ অর্থনীতিতে প্রতিটি তার প্রাপ্য পায় উৎপাদন কাজে তার অবদান অনুযায়ী। এ অর্থনীতিতে সমাজের কেউই যাতে সম্পদের বণ্টন থেকে বিচ্যুত না হয়, তার জন্য রেশন কার্ডের মাধ্যমে আয় ও সম্পদ বণ্টন করা হয়।

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য

সমাজের এক একজন ব্যক্তি তার নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ পাবে এবং সে কাজের ধরন অনুযায়ী বা অবদান অনুযায়ী প্রকৃত পারিশ্রমিক পাবে।

৩. মিশ্র অর্থব্যবস্থা

বিশ্বে বর্তমানে পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক দু'টি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মিশ্রণ দেখা যায়। অর্থাৎ বাজার অর্থনীতি যেমন প্রচলিত রয়েছে পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা ও সরকারের নজরদারিও পরিলক্ষিত হচ্ছে। যে অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় উভয় মালিকানাই বিদ্যমান এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যক্তিগত উদ্যোগে বাজারপ্রক্রিয়া এবং রাষ্ট্রীয় কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে পরিচালিত হয় তাকে মিশ্র অর্থনীতি বলে।

মিশ্র অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য

৪. কল্যাণমূলক অর্থব্যবস্থা

কল্যাণমূলক অর্থনীতির মাধ্যমেও কিছু কিছু দেশ অর্থনীতির কেন্দ্রীয় সমস্যাগুলো সমাধান করে থাকে। কল্যাণমূলক অর্থনীতির মূল/প্রতিপাদ্য বিষয় হলো মানবকল্যাণ এবং রাষ্ট্র কর্তৃক উন্নতমানের মৌলিক চাহিদা সরবরাহ করা যাতে নাগরিকরা বৈধ আয়ের মাধ্যমে বাজার থেকে তার প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটাতে পারে। রাষ্ট্র ব্যবস্থা নাগরিকের কর্মসংস্থানের অবারিত সুযোগ করে দেয়। এই অর্থব্যবস্থার মূল আকর্ষণ হচ্ছে সম্পদ ও আয়ের বণ্টন অত্যন্ত ন্যায়ভিত্তিক, সম্পদের বণ্টন এমনভাবে করা হয় যাতে কেউ তার মানবিক জীবনবোধ থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে সবার উন্নতমানের শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং গৃহ নিশ্চিত করা হয়। এখানে আয়ের বৈষম্য তেমনভাবে পরিলক্ষিত হয় না। ধনীদের প্রগতিশীল কর ব্যবস্থা আরওপ করে তা রাষ্ট্রের অন্যান্য প্রয়োজনীয় খাতে বণ্টন করে থাকে।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

কল্যাণ অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য

কল্যাণমূলক অর্থব্যবস্থা এমন এক ধরনের অর্থব্যবস্থাকে বোঝায়, যেখানে সরকার তার নাগরিকদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে মূখ্য ভূমিকা পালন করে। এই অর্থব্যবস্থায় অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সম্পাদনে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি খাতের সহাবস্থান বিরাজ করে। এই অর্থব্যবস্থার মূলনীতি হলো সকলের জন্য সমান সুযোগ, সম্পদের সুষম বণ্টন। সমাজে যাঁরা একটি সুন্দর জীবনের নূন্যতম প্রয়োজনগুলো মিটাতে পারেনা তাঁদের প্রয়োজন মেটানোর দায়িত্ব সব জনগণের। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী, বেকারত্ব ভাতা, এবং সুবিধাবঞ্চিত ব্যক্তিদের জন্য ভাতা বা কাজের ব্যবস্থা করে দেওয়া ইত্যাদি হলো একটি কল্যাণমূলক অর্থব্যবস্থায় সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের উদাহরণ।

কল্যাণমূলক অর্থব্যবস্থায় পরিবেশের ক্ষতি হয় এমন উৎপাদনব্যবস্থা তারা সাধারণত পরিহার করে। স্ক্যান্ডিনেভিয়ান (সুইডেন,নরওয়ে, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, আইসল্যান্ড ইত্যাদি) দেশগুলো তাঁদের পরিবেশের জন্য উপযোগী জ্বালানী ব্যবস্থা নিশ্চিত করে। পরিবেশদূষণ হয় এমন কোনো জ্বালানী ব্যবস্থা তারা ব্যবহার করে না। নাগরিকের উন্নত জীবনযাত্রা নিশ্চিত করে। এ অর্থব্যবস্থায় আইনের শাসনের প্রতি মানুষের আস্থা থাকে। কারণ এখানে নাগরিকের বাক্‌স্বাধীনতা থাকে এবং সবাই আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল।

বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থা

আমাদের দেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মিশ্র অর্থব্যবস্থা। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বাজার অর্থনীতি এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার সমন্বয় রয়েছে। বাংলাদেশে কল্যাণ অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যও বিদ্যমান। এখানে সম্পদের মালিকানা ব্যক্তি এবং রাষ্ট্র যৌথভাবে উপভোগ করে। এখন বেসরকারি বিনিয়োগ মোট দেশজ পণ্য বা দ্রব্য (Gross Domestic Product, GDP) -এর প্রায় ৩৫%। আমাদের অর্থনীতির বিশাল অংশ বেসরকারি খাতের ওপর নির্ভরশীল। সরকারি বিনিয়োগ সাধারণত বিদ্যুৎ খাতে, অবকাঠামোগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে, সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠা, উৎপাদন এবং রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে ব্যয় করা হয়। এক কথায় ব্যক্তি উদ্যোগ এবং রাষ্ট্রীয় সহযোগিতায় বাংলাদেশের অর্থনীতি গড়ে উঠেছে

আমরা জানি, ১৯৭১ সালে দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী সম্মুখযুদ্ধ এবং ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশ বর্বর পশ্চিম পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে পরাস্থ করে মুক্তিযুদ্ধে বিজয় লাভ করে। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলার অর্থনীতিকে ন্যায়ভিত্তিক সমাজব্যবস্থার মাধ্যমে গঠন করতে চেয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন-‘আমি বাংলাদেশকে এশিয়ার সুইজারল্যান্ড বানাতে চাই’।

আমরা জানি, সুইজারল্যান্ড কল্যাণমূলক অর্থনীতির একটি দেশ। যেখানে রাষ্ট্র তার নাগরিকদের সর্বোচ্চ কল্যাণ নিশ্চিত করে। রাষ্ট্র নাগরিকদের মৌলিক চাহিদা পূরণ করে। ধনী ও গরীব মানুষের বৈষম্য নেই বললেই চলে। বঙ্গাবন্ধু এমন একটি দেশের মতো বাংলাদেশকে তৈরি করতে চেয়েছিলেন। তাঁর ভাষায় সোনার বাংলা গড়তে চেয়েছিলেন তিনি। যেখানে মানুষে মানুষে বৈষম্য কমে আসবে।

১০ জানুয়ারি বঙ্গাবন্ধু দেশে ফিরে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে যে বক্তব্যটি দিয়েছিলেন, তাতে তিনি বাঙালির মুক্তির ওপর জোর দিয়েছিলেন। আমরা জানি, মুক্তি শব্দটির বহুমাত্রিক অর্থ রয়েছে। রাজনৈতিক মুক্তি ছাড়াও সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ছিল তাঁর বক্তব্যে।

আমরা জানি বঙ্গাবন্ধু শূন্য কোষাগার দিয়ে দেশের অর্থনীতি শুরু করেছিলেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের রাস্তা, কালভার্ট, রেলপথ, বিমানবন্দর এবং সমুদ্রবন্দর ধ্বংসপ্রায়। এক কোটি শরণার্থীকে দেশে ফেরত এনে পুনর্বাসনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন তিনি। বঙ্গাবন্ধু মাত্র সাড়ে তিন বছর স্বাধীন সরকারের দায়িত্ব পালনের সুযোগ পেয়েছিলেন। এই সাড়ে তিন বছরেই বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ১৯৭২ সালের ৯৩ ডলার থেকে ১৯৭৫ সালে ২৭৩ ডলারে উন্নীত হয়। যা তখনকার সময়ে পাকিস্তান এবং ভারতের মাথাপিছু আয় থেকে বেশি ছিল।

২০২১-২২ অর্থবছরে সরকারি বিনিয়োগ জিডিপির ৭.৫৩% এবং বেসরকারি বিনিয়োগ জিডিপির ২৪.৫২% অর্থাৎ মোট বিনিয়োগ জিডিপির ৩২.০৫%। বর্তমান বাংলাদেশে মাথাপিছু জিডিপি ২৬৮৭ ডলার (২০২১-২২ অর্থ বছরে)।

বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

তাঁর রাষ্ট্র গঠনের অর্থনৈতিক দর্শন ছিল গণমানুষের জীবনমানের উন্নতি। জনমানুষের কল্যাণই ছিল তাঁর ধ্যান জ্ঞান। তিনি বৈষম্যহীন একটা সমাজব্যবস্থা গড়ার কথা বলেছিলেন যা বাংলাদেশের সংবিধানের মূলনীতিতে যুক্ত হয়েছিল। তিনি অঙ্গীকার করেছিলেন শান্তি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির সোনার বাংলা গড়ার।

এখানে সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে কীভাবে দেশের অর্থনীতির শক্তিশালী ভিত গড়ে তোলা যায় তার সেই প্রচেষ্টার প্রমান রয়েছে। পরিকল্পনার অংশ হিসাবে বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং প্রেক্ষাপট পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ ইত্যাদি প্রণয়ন করা হয়েছে।

বাংলাদেশে স্বয়ংক্রিয়ভাবে দাম নির্ধারিত হয়। অর্থাৎ চাহিদা ও যোগানের ভিত্তিতে দামব্যবস্থা গড়ে উঠেছে ব্যবসায়ী শ্রেণি অনেক সময় অধিক মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরনের কৃত্রিম সংকট তৈরি করে দাম বাড়িয়ে থাকে বা দাম নিয়ন্ত্রণ করে। ক্রয়ক্ষমতা যখন ক্রেতাসাধারণের নাগালের বাইরে চলে যায়, তখন সরকার বাজারের ওপর প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করে। অনেক সময় সরকার বিভিন্ন দ্রব্যের দাম ঠিক করে দেয়। কখনো সরকারি সংস্থার মাধ্যমে পণ্য বা দ্রব্য আমদানি ও বিপণনের মাধ্যমে মূল্য নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা দেখা যায় অর্থাৎ বাজারব্যবস্থার পাশাপাশি এখানে সরকারি নিয়ন্ত্রণও দেখা যায় সাধারণত ক্রেতাঁদের উপকারের/ কল্যাণের কথা মাথায় রেখে।

বাংলাদেশে কয়েক দশক ধরে, বিশেষ করে মুক্তবাজার অর্থনীতিতে প্রবেশ করার পরে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, মাথাপিছু আয় ও অন্যান্য সূচক বেশ বেড়েছে। কিন্তু এই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সকল মানুষের জীবনমান এখনো কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে উন্নীত করতে পারেনি। বর্তমান সরকার অসহায় ও দুস্থ মানুষের জীবনমান ও আয়ের সংস্থানের জন্য অনেক দরিদ্রবান্ধব কল্যাণমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে যেমন: বয়স্ক ভাতা, অসহায় ও দুস্থ ভাতা, বিধবা ভাতা ইত্যাদি গুচ্ছগ্রাম, গৃহায়ণ প্রকল্প, মুক্তিযোদ্ধা ভাতার মতো কার্যক্রমের মাধ্যমে জনকল্যাণমূলক সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ে তুলেছে। স্বল্প মজুরি বা আয়ের ফলে বাজার থেকে মানুষের অন্যান্য দ্রব্য ও সেবা ক্রয় করার সুযোগ কমে যায়। স্বল্প আয়ের মানুষ সন্তানদের প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করতে পারেনা এবং মানসম্মত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়ানোর সুযোগ পায় না। তাছাড়া মিশ্র অর্থনীতিতে বাজারের ভূমিকা ক্রমে বাড়ছে। এক ধরনের অসম প্রতিযোগিতার ফলে মানসম্মত শিক্ষার ব্যয় বাড়ছে। কর্মক্ষেত্রের যোগ্যতা অর্জনে ধনী-দরিদ্রের সন্তানদের মধ্যে বৈষম্য তৈরি হচ্ছে। তবে বর্তমান সরকার বৈষম্য দূর করার জন্য স্কুল পর্যায়ে বিনামূল্যে সব শিক্ষার্থীকে বই সরবরাহসহ নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আশা করা যায়, এসব প্রচেষ্টার ফল শীঘ্রই পাওয়া যাবে।

আমরা জানি, গুণগত শিক্ষা মানুষকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত করে। একইভাবে যাঁরা মানসম্মত শিক্ষা অর্জন করতে পারেনি তারা কর্মসংস্থানের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। ফলে তাঁদের মজুরি বা আয় কম হয়। সবার জন্য উন্নত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে পারলে এবং সাধারণ মানুষ/নাগরিক যদি উন্নত সেবা গ্রহণ করার সুযোগ পায়, তাহলে সামাজিক ন্যায্যতা নিশ্চিত করা যায়। প্রত্যাশা হচ্ছে সবার জন্য গুণগত বা একই মানের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করবে। রাষ্ট্রীয় উন্নয়নে সবার অংশগ্রহণ থাকবে। একটি দেশের সকল জায়গায়/অঞ্চলে সমানভাবে উন্নয়নের সুফল পৌঁছে যাবে। ধনী-দরিদ্রের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ থাকবে না। আমরা এমন একটি সমাজের কথা বিবেচনা করব যেখানে সমাজের সকল মানুষের মর্যাদা নিয়ে বাঁচার অধিকার থাকবে।

এখন আমরা দেখব অর্থনৈতিক বৈষম্যের ফলে কীভাবে দারিদ্র্য ও অসমতা সৃষ্টি হয়?

২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়নের জন্য দরকার একটি বৈষম্যহীন ক্ষুধামুক্ত অর্থনৈতিক সমাজ কাঠামো প্রতিষ্ঠা। যে সমাজব্যবস্থায় কোনো দারিদ্র্য থাকবে না। আর দারিদ্র্য না থাকলে ক্ষুধামুক্ত সমাজ গঠন সহজে করা যায়। যেখানে ভালো স্বাস্থ্যসেবার কথা বলা হয়েছে। আমাদের সমাজে গুণগত শিক্ষা এবং লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণের উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু মানুষ এখনো সর্বত্র আমাদের সমাজে নানাভাবে অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। যেমন: একই শিক্ষা ও কাজের দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান সহজে নারী কর্মীদের নিয়োগ দিতে চায় না, বা নিয়োগ দিলেও বেতন তার পুরুষ সহকর্মীর তুলনায় অনেক সময় কম হয়ে থাকে। এখন বিশ্বব্যাপী টেকসই উন্নয়নে যে কার্যক্রম চলছে, তাতে বাংলাদেশ অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে।

নিম্নের চিত্রের মাধ্যমে তোমরা এই বিষয়ে বিস্তারিত জানতে পারবে।

বড়ো ধরনের অর্থনৈতিক বৈষম্য নিয়ে একটি দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। কিছু কিছু উন্নয়ন হলেও টেকসই উন্নয়ন হবে না।

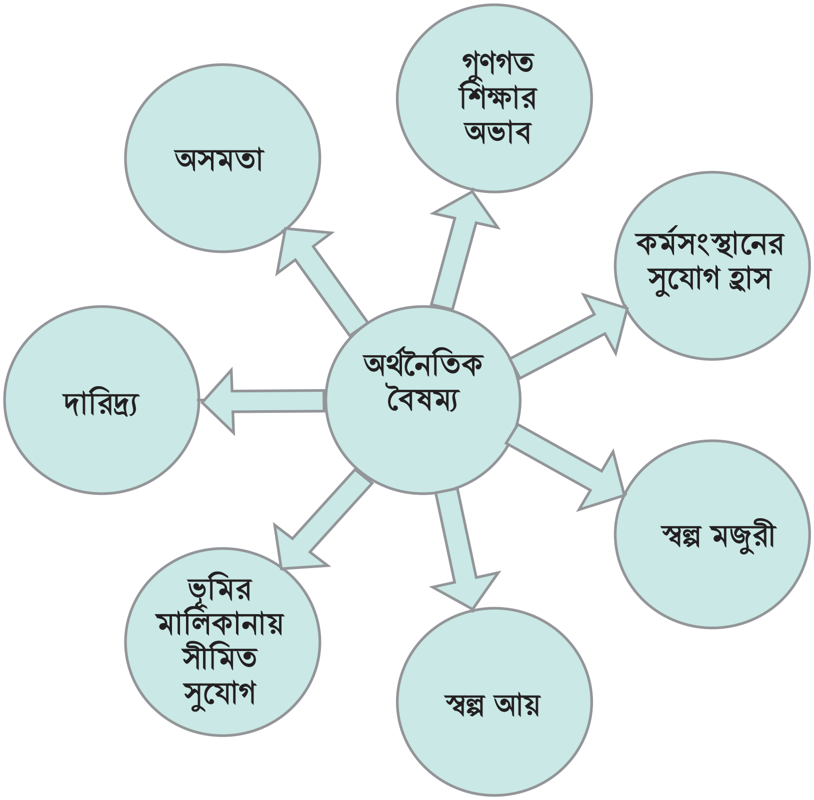

অর্থনৈতিক বৈষম্যের প্রভাবের চিত্র

উপরের চিত্রের মাধ্যমে আমরা কী দেখতে পাচ্ছি। মানসম্পন্ন বা গুণগত শিক্ষার সুযোগের অভাবে মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ হ্রাস পায়। এর ফলে তারা দক্ষ মানবসম্পদ হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না ভালো কর্মসংস্থানের সুযোগ থেকে ছিটকে পড়ে। অথবা তারা যেসমস্ত কাজের সুযোগ পায়, তার মজুরি কম হয়। এর ফলে আয়ও কম হয়। যার ফলে নিম্ন আয়ের মানুষ সম্পত্তিতে বা ভূমির মালিকানায় সীমিত সুযোগ পায় বা অনেকাংশে কোনো সুযোগই পায় না। অনেকে বিশেষ করে গ্রাম অঞ্চলে বেশির ভাগ মানুষ যাঁরা স্বল্প মজুরির আয়ে জীবন নির্বাহ করে তারা এক সময় ভূমিহীনে পরিণত হয়। উচ্চ আয়ের মানুষজনই পরবর্তী সময়ে ভূমির মালিকানা বা নতুন নতুন ভূমি ক্রয়ের সুযোগ পায়। ফলে গ্রামে যাঁরা কৃষিকাজের সঙ্গে জড়িত, তাঁদের হাত থেকে ভূমি ক্রমে উচ্চ আয়ের মানুষের হাতে হস্তান্তরিত হয়।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে

অর্থনৈতিক বৈষম্য ও সমতার নীতি

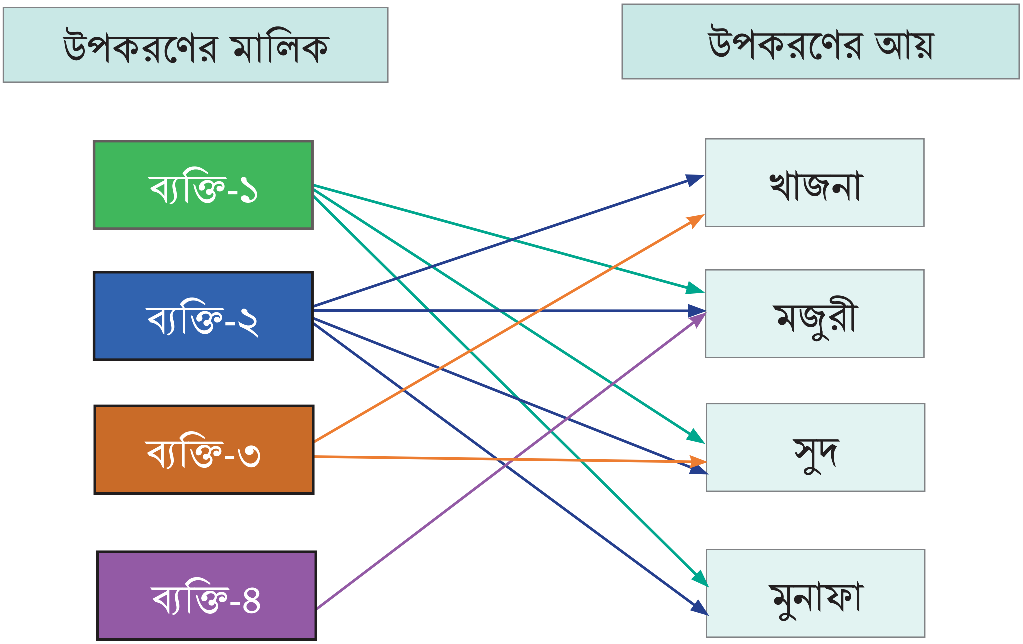

আমরা নিচের চিত্র থেকে খুঁজে বের করি কোন ব্যক্তির উৎপাদনের উপাদান বেশি এবং আয় বেশি। আমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছি যে ব্যক্তির উৎপাদনের উপাদানের পরিমাণ বেশি তার আয় বেশি। অর্থাৎ যার উপকরণের মালিকানা যত বেশি থাকবে, তার আয়ের পরিমাণ তত বাড়বে। আবার যার উৎপাদনের উপকরণের যোগান সীমিত পরিমাণে রয়েছে রয়েছে তার আয়ের পরিমাণও কম। বাজার অর্থনীতিতে ব্যক্তি বা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান/ফার্ম তার আয়ের ভিত্তিতে ভোগ পরিচালিত করবে। অর্থাৎ ভোগ বা ব্যয় নির্ভর করবে তার আয়ের ওপর। বাজার অর্থনীতিতে যার আয় যত বেশি তিনি তত বেশি দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করার ক্ষমতা অর্জন করেন এবং বাজার থেকে দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা ক্রয় করতে পারবেন।

আর যার উপকরণের মালিকানা কম অর্থাৎ কম পরিমাণে বা খুব সামান্য উপকরণের মালিকানা থাকে তাঁদের আয়ের পরিমাণ স্বল্প বা অনেকাংশে থাকে না। কারণ, মজুরি কম থাকায় তার আয়ের পরিমাণ কম। কোনো ব্যক্তির আয়ের স্বল্পতার কারণে সে অন্যান্য সম্পদ অর্জনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। স্বল্প আয়ের ফলে তার ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়। যে পেশার মানুষের মাসিক আয় বেশি তার পণ্য বা দ্রব্য বা সেবা পাওয়ার সুযোগ বেশি। এই আয় বৈষম্যের কারণে আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈষম্য দেখতে পাই। চলো আমরা এই বৈষম্যগুলো দেখে নিই।

বৈষম্যের বিভিন্ন ধরন

বৈষম্য দূর করার জন্য প্রতিটি মানুষকে পণ্য বা দ্রব্য বা সেবা গ্রহণের সমান সুযোগ প্রদান করতে হবে। জাতি, বর্ণ, ধর্ম, গোত্র, লিঙ্গা, পেশা বা অঞ্চলভেদে সবার জন্য গুণগত ও মানসম্মত সেবা গ্রহণের সুযোগ থাকতে হবে। এমন রাষ্ট্রীয় নীতি প্রণয়ন করতে হবে যেখানে সব মানুষের সমান সুযোগ থাকবে। এটাকে আমরা সামাজিক সমতার নীতি বলতে পারি।

দলগত কাজ ৪:

এখন আমরা দলগতভাবে দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধির ফলে সমাজে যে বৈষম্য হয় তা দূরীকরণ কীভাবে করা যায় তা নিয়ে একটু চিন্তা করি। এখন আমরা দলে বসে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সমতা নিশ্চিতকরণের জন্য একটি মডেল তৈরি করি। এটা আমরা চার ধরনের অর্থব্যবস্থার আলোকে তৈরি করব। দলে আলোচনা করে মডেলটি কোন উপায়ে উপস্থাপন করব তা ঠিক করি নিই। এটি হতে পারে পোস্টার পেপার/পাওয়ার পয়েন্ট/ পুরোনো ব্যবহৃত ককশিট বা কাগজ দিয়ে তৈরি একটি মডেল। এভাবে প্রতিদল একটি করে মডেল তৈরি করে জমা দিব। মডেলের মাধ্যমে আমরা নিচের কয়েকটি বিষয় তুলে ধরব।

ক. দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়?
খ. দ্রব্যমূল বৃদ্ধির ফলে কী কী বৈষম্য তৈরি হয়?
গ. দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে সৃষ্ট বৈষম্য কীভাবে দূর করা যায়?
ঘ. এ প্রক্রিয়ায় সামাজিক সমতার নীতি কীভাবে নিশ্চিত করা যাবে?

"যে জাতি স্বাধীনতাকে ভালোবাসে
সে জাতিকে বন্দুক-কামান দিয়ে দাবায়ে রাখা যায় না।"
-বঙ্গবন্ধু

২০২৪ শিক্ষাবর্ষ

দাখিল অষ্টম শ্রেণি

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান

শিক্ষাই দেশকে দারিদ্র্যমুক্ত করতে পারে

– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

পরিশ্রম উন্নতির চাবিকাঠি

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য **‘৩৩৩’** কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টার **১০৯** নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য